

ফেলুদার রহস্য আড়তে ষষ্ঠা



সোনার কেল্লা

৪৬

ফেলুদা হাতের বইটা সশঙ্কে বন্ধ করে টক টক দুটো তুঢ়ি মেরে বিরাট হাই
তুলে বলল, ‘জিয়োমেট্রি’

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘এতক্ষণ কি তুমি জিয়োমেট্রির বই পড়ছিলে ?’

বইটায় একটা খবরের কাগজের মলাট দেওয়া, তাই নামটা পড়তে পারিনি।
এটা জানি যে, ওটা সিধু জ্যাঠার কাছ থেকে ধার করে আনা। সিধু জ্যাঠার খুব
বই কেনার বাতিক, আর বইয়ের খুব যত্ন। সবাইকে বই ধার দেন না, তবে
ফেলুদাকে দেন। ফেলুদাও সিধু জ্যাঠার বই বাড়িতে এনেই আগে সেটায় একটা
মলাট দিয়ে নেয়।

একটা চারমিনার ধরিয়ে পর পর দুটো ধৌঁয়ার রিং ছেড়ে ফেলুদা বলল,
‘জিয়োমেট্রির বই বলে আলাদা কিছু নেই। যে-কোনো বই-ই জিয়োমেট্রির বই
হতে পারে, কারণ সমস্ত জীবনটাই জিয়োমেট্রি। লক্ষ করলি নিশ্চয়ই—ধৌঁয়ার
রিংটা যখন আমার মুখ থেকে বেরোল তখন ওটা ছিল পার্ফেক্ট সার্কল। এই
সার্কল জিনিসটা কীভাবে ছড়িয়ে আছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সেটা একবার ভেবে দ্যাখ।
তোর নিজের শরীরে দ্যাখ। তোর চোখের মণিটা একটা সার্কল। এই সার্কলের
সাহায্যে তুই দেখতে পাচ্ছিস আকাশের চাঁদ তারা সূর্য। এগুলোকে ফ্ল্যাটভাবে
কল্পনা করলে সার্কল, আসলে গোলক—এক-একটা সলিড বুদ্ধ, অর্থাৎ
জিয়োমেট্রি। সৌরজগতের গ্রহগুলো আবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে এলিপটিক
কার্ডে। এখানেও জিয়োমেট্রি। তুই যে একটু আগে জানালা দিয়ে থুক করে
রাস্তায় থুতু ফেললি—অবিশ্য ফেলা উচিত নয়—ওটা আনহাইজিনিক—নেক্সট
টাইম ফেললে গাঁট্টা খাবি—ওই থুতুটা গেল কিন্তু একটা প্যারাবোলিক
কার্ডে—জিয়োমেট্রি। মাকড়সার জাল জিনিসটা ভালো করে দেখেছিস কখনো ?
কী জটিল জিয়োমেট্রি রয়েছে তাতে জানিস ? একটা সরল চতুর্কোণ দিয়ে শুরু

হয় জাল বোনা । তারপর সেটাকে দুটো ডায়াগন্যাল টেনে চারটে ত্রিকোণে ভাগ করা হয় । তারপর সেই ডায়াগন্যাল দুটোর ইন্টারসেক্শন পয়েন্ট থেকে শুরু হয় স্পাইর্যাল জাল ; আর সেটাই ক্রমশ বাড়তে বাড়তে পুরো চতুর্কোণটাকে ছেয়ে ফেলে । ব্যাপারটা এমন তাজব যে ভাবলে কুলকিনিবা পাবি না ।...’

রবিবারের সকাল । আমরা দু'জনে আমাদের বাড়ির একতলার বৈঠকখানায় বসে আছি । বাবা তাঁর রবিবারের নিয়ম মতো ছেলেবেলার বন্ধু সুবিমল কাকার বাড়িতে আড়া মারতে গেছেন । ফেলুদা সোফায় বসে তার পা দুটো সামনের নিচু টেবিলটার উপর তুলে দিয়েছে । আমি বসেছি তত্ত্বপোশে, দেয়ালের সঙ্গে একটা গোলকধৰ্ম্মার ভিতর ছেট লোহার দানা । প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে সেই দানাগুলোকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গোলকধৰ্ম্মার মাঝখানে আনবার চেষ্টা করছি । বুবলাম যে, এ-ও একটা কঠিন জিয়োমেট্রির ব্যাপার ।

কাছেই নীহার-পিঙ্কুদের বাড়িতে পুজোর প্যান্ডেলে ‘কাটি পতঙ্গ’ ছবির ‘ইয়ে জো মহববৎ হ্যায়’ গানটা বাজছে । গোল থামোফোন রেকর্ডে মিহি স্পাইর্যাল প্যাঁচ । অর্থাৎ জিয়োমেট্রি ।

‘কেবল চোখে দেখ যায় এমন জিনিস না,’ ফেলুদা বলে চলল, ‘মানুষের মনের ব্যাপারটাও জিয়োমেট্রির সাহায্যে বোঝানো যায় । সাদাসিধে মানুষের মন স্ট্রিট লাইনে চলে ; প্যাঁচালো মন সাপের মতো ঢাঁকেবেঁকে চলে, আবার পাগলের মন যে কখন কোন দিকে চলবে তা কেউ বলতে পারে না—একেবারে জটিল জিয়োমেট্রি ।’

ফেলুদার দৌলতে অবিশ্যি আমার সোজা-বাঁকা পাগল-ছাগল অনেক রকম লোকের সঙ্গেই আলাপ হবার সুযোগ হয়েছে । ফেলুদা নিজে কীরকম জ্যামিতিক নকশার মধ্যে পড়ে সেটাই এখন ভাবছিলাম । ওকে জিগ্যেস করাতে বলল, ‘একটা মেনি-পয়েন্টেড স্টার বা জ্যোতিক বলতে পারিস ।’

‘আর আমি কি সেই জ্যোতিকের স্যাটিলাইট ?’

‘তুই একটা বিন্দু যেটাকে অভিধানে বলে পরিমাণহীন স্থাননির্দেশক চিহ্ন ।’
আমার নিজেকে স্যাটিলাইট বলে ভাবতে ভালোই লাগে । তবে সব সময় স্যাটিলাইট থাকা সম্ভব হয় না এই যা আপসোস ! গ্যাংটকে গঞ্জগোলের ব্যাপারে অবিশ্যি ওর সঙ্গেই ছিলাম, কারণ তখন আমার ছুটি ছিল । তার পরের দুটো তদন্তের ব্যাপারে—একটা ধলভূমগড়ে খুন, আরেকটা পাটনায় একটা জাল উইলের ব্যাপারে—এই দুটোতে আমি বাদ পড়ে গেছি । এখন পুজোর ছুটি । ক'দিন থেকেই ভাবছি এই সময় একটা কেস এলে মন্দ হয় না, কিন্তু সেটা যে সতিই এসে পড়বে তা ভাবতে পারিনি । ফেলুদা অবিশ্যি বলে, যে-কোনো

জিনিস মনে মনে খুব জোর দিয়ে চাইলে অনেক সময় আপনা থেকেই এসে পড়ে মোট কথা আজ যেটা ঘটল সেটা আমার এই চাওয়ার ফল বলে ভেবে নিতে আমার কোনো আপত্তি নেই ।

পিংগুদের বাড়ির লাউডস্পীকারে সবেমাত্র ‘জনি মেরা নাম’-এর একটা গান দিয়েছে, ফেলুদা অ্যাশ-ট্রেতে ছাই ফেলে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড কাগজটা হাতে নিয়েছে, আমি একবার রাস্তায় বেরোব কিনা ভাবছি, এমন সময় আমাদের বাইরের দরজার কড়াটা কে যেন সজোরে নেড়ে উঠল । বাবা বারোটার আগে ফিরবেন না, তাই বুবলাম এ অন্য লোক । দরজা খুলে দেখি ধৃতি আর নীল সার্ট পরা একজন নিরাহ গোছের ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন ।

‘এ বাড়িতে প্রদোষ মিত্রির বলে কেউ থাকেন ?’

লাউডস্পীকারের জন্য প্রশ্নটা করতে ভদ্রলোককে বেশ চেঁচাতে হল । নিজের নাম শুনে ফেলুদা সোফা ছেড়ে দরজার দিকে এগিয়ে এল ।

‘কোথেকে আসছেন ?’

‘আজ্জে, আমি আসছি সেই শ্যামবাজার থেকে ।’

‘ভেতরে আসুন ।’

ভদ্রলোক ঘরে চুকে এলেন ।

‘বসুন । আমিই প্রদোষ মিত্রি ।’

‘ওঁ ! আপনি এত ইয়ং সেটা আমি ঠিক...’

ভদ্রলোক গদ্গদ ভাব করে সোফার পাশের চেয়ারটায় বসে পড়লেন । তাঁর হাসি কিন্তু বসার পরেই মিলিয়ে গেল ।

‘কী ব্যাপার ?’ ফেলুদা জিজ্ঞেস করল ।

ভদ্রলোক গলা খাঁকিয়ে বললেন, ‘কেলাস চৌধুরী মশায়ের কাছ থেকে আপনার অনেক সুখ্যাতি শুনেছি । তিনি, মানে, আমার একজন খদের আর কী । আমার নাম সুধীর ধর । আমার একটা বইয়ের দোকান আছে কলেজ স্ট্রীটে—ধর অ্যান্ড কোম্পানি—দেখে থাকতে পারেন হয়ত ।’

ফেলুদা ছেট করে মাথা নেড়ে হাঁ বুঝিয়ে দিল । তারপর আমায় বলল, ‘তোপসে—জানলাটা বন্ধ করতে দে তো ।’

রাস্তার দিকের জানলাটা বন্ধ করতে গানের আওয়াজটা একটু কমল আর তার ফলে ভদ্রলোকও আরেকটু স্বাভাবিকভাবে বাকি কথাগুলো বলতে পারলেন ।

‘দিন সাতেক আগে খবরের কাগজে একটা খবর বেরিয়েছিল আমার ছেলের বিষয়ে—আপনি কি..., ?’

‘কী খবর বলুন তো ?’

‘ওই জাতিস্মর...মানে...’

‘ওই মুকুল বলে ছেলেটি ?’

‘আজ্জে হাঁ !’

‘খবরটা তাহলে সতি ?’

‘মানে, ও আপনার যে ধরনের কথাবার্তা বলে তাতে তো...’

জাতিশ্঵র ব্যাপারটা আমি জানতাম। এক-একজন থাকে, তাদের নাকি হঠাতে গোড়ায় গা করিনি। ছেলেবয়সে তো কত রকম পাগলামিই থাকে ! কানের কাছে ভ্যানর ভ্যানর করেছে, কান পাতিনি। আমার গিন্নীই প্রথম খেয়াল করে। তারপর

পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ে যায়। তাদের বলে জাতিশ্বর।

পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ে যায়। তাদের বলে জাতিশ্বর।

অবিশ্য পূর্বজন্ম বলে কিছু আছে কিনা সেটা ফেলুন্দাও নাকি জানে না।

ফেলুন্দা চারমিনারের প্যাকেটটা খুলে ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে দিল।

ভদ্রলোক একটু হেসে মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিলেন তিনি খান না। তারপর বললেন, ‘বোধহয় মনে থাকবে, আমার এই ছেলেটি—আট বছর মাত্র বয়স—একটা জায়গার বর্ণনা দেয়, সেখানে নাকি সে গেছে। অথচ তেমন জায়গায়—আমার ছেলে তো দূরের কথা—আমার বা আমার পূর্বপুরুষদের কাকুর কথনো যাবার সৌভাগ্য হয়নি। ছা-পোষা লোক, বুঝতেই তো পারছেন। দোকান দেখি, এদিকে বইয়ের বাজার দিনে দিনে—’

‘একটা দুর্ঘের কথা বলে না আপনার ছেলে ?’ ফেলুন্দা ভদ্রলোককে কতকটা

বাধা দিয়েই বলল।

‘আজ্জে হাঁ ! বলে—সোনার কেল্লা। তার মাথায় কামান বসানো আছে, যুদ্ধ হচ্ছে, লোক মরছে—সে সব নাকি সে দেখেছে। সে নিজে পাগড়ি পরে উটের পিঠে চড়ে বালির উপর বেড়াত। বালির কথা খুব বলে। হাতী ঘোড়া এসব অনেক কিছু বলে। আবার ময়ুরের কথা বলে। ওর হাতে একটা দাগ আছে কনুইয়ের কাছে। সেটা জন্মে অবধি আছে। আমরা তো জন্মদাগ বলেই জানতাম। ও বলে যে একবার নাকি একটা ময়ূর ওকে ঠোকর মেরেছিল, এটা নাকি সেই ঠোকরের দাগ !’

‘কোথায় থাকত সেটা পরিষ্কার ভাবে বলে ?’

‘না—তবে তার বাড়ি থেকে নাকি সোনার কেল্লা দেখা যেত। মাঝে মাঝে কাগজে হিজিবিজি কাটে পেনসিল দিয়ে। বলে—এই দ্যাখো আমার বাড়ি। দেখে তো বাড়ির মতোই মনে হয়।’

‘বই-টইয়ের মধ্যে এমন কোনো জায়গার ছবি সে দেখে থাকতে পারে না ? আপনাদের তো বইয়ের দোকান আছে...’

‘তা অবিশ্য পারে। কিন্তু ছবির বই তো অনেক ছেলেই দেখে—তাই বলে কি তারা অষ্টপ্রহর এইভাবে কথা বলে ? আপনি আমার ছেলেকে দেখেননি তাই। সত্যি বলতে কী—তার মনটাই যেন পড়ে আছে অন্য কোথাও। নিজের বাড়ি, নিজের ভাই-বোন বাপ-মা আঢ়ীয়ান্ধজন—এর কোনোটাই যেন তার আপন নয়।

আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে কথাই বলে না সে ছেলে !’

‘কবে থেকে এইসব বলতে শুরু করেছে ?’ ফেলুন্দা জিজ্ঞেস করল।

‘তা মাস দুয়েক। ওই ছবি আৰু দোকান থেকে সবে ফিরিচি, আৱ সে আমায় এসে ছবি দেখাচ্ছে। গোড়ায় গা করিনি। ছেলেবয়সে তো কত রকম পাগলামিই থাকে ! কানের কাছে ভ্যানর ভ্যানর করেছে, কান পাতিনি। আমার গিন্নীই প্রথম খেয়াল করে। তারপর ক'দিন ধৰে তাৰ কথা শুনে-টুনে, তাৱ হাবভাব দেখে, আমাৰ আৱেক বন্দেৱ



আছে—নাম শুনেছেন কি ?—ডাক্তার হেমাঙ্গ হাজৱা...’

‘হাঁ হাঁ ! প্যারাসাইকলজিস্ট। শুনেছি বইকি। তা তিনি তো আপনার ছেলেকে নিয়ে বাইরে কোথায় যাবেন বলে কাগজে বেরিয়েছে।’

‘যাবেন না, চলে গেছেন অলরেডি। তিনি দিন এলেন আমার বাড়িতে। বললেন, এ তো রাজপুতানার কথা বলছে বলে মনে হচ্ছে। আমি বললুম হতে পারে। শেষটায় বললেন কী, তোমার ছেলে জাতিশ্বর ; এই জাতিশ্বর নিয়ে আমি রিসার্চ করছি। আমি তোমার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে রাজপুতানায় যাবো। ঠিক জায়গায় গিয়ে ফেলতে পারলে তোমার ছেলের নিশ্চয়ই আৱো অনেক কথা মনে পড়বে। তাতে আমার খুব সুবিধে হবে। ওৱ খৰচাও আমি দেবো, খুব যত্নে রাখব, তোমার কিছু ভাবতে হবে না।’

‘তারপর?’ ফেলুদার গলার স্বর আৰ তাৰ এগিয়ে বসাৰ ভঙ্গিতে বুঝলাম সে
বেশ ইন্টারেস্ট পেয়েছে!

‘তাৰপৰ আৰ কী—মুকুলকে নিয়ে চলে গেলেন?’

‘ছেলে আপত্তি কৰেনি?’

ভদ্ৰলোক একটা শুকনো হাসি হেসে বললেন, ‘কোথায় আছেন আপনি? যেই
বললে সোনাৰ কেল্লা দেখাৰে অমনি এক কথায় রাজী হয়ে গেল। আপনি তো
দেখেননি আমাৰ ছেলেকে। ও, মানে, ঠিক আৰ পাঁচটা ছেলেৰ মতো নয়।
একেবোৱেই নয়। রাত তিনটৈৰ সময় উঠে বসে আছে। গুন-গুন কৰে গান
গাইছে। ফিলিমেৰ গানটান নয় মশাই—গেঁয়ো সুৱ—তবে বাংলাদেশেৰ
গাঁ নয় এটা জানি। আমি আবাৰ একটু হাৰমোনিয়াম-টাৰমোনিয়াম বাজাই,
বুৰোহেন...’

ভদ্ৰলোক এত কথা বললেন, কিন্তু ফেলুদার কাছে কেন এলেন, গোয়েন্দাৰ
কেন প্ৰয়োজন হতে পাৱে তাঁৰ, সেটা এখনো পৰ্যন্ত কিছুই বললেন না। হঠাৎ
ফেলুদাৰ একটা কথাতেই যেন ব্যাপারটা একটা অন্য চেহারা নিয়ে নিল।

‘আপনাৰ ছেলে তো কী সব গুপ্তধনেৰ কথা বলছে না?’

ভদ্ৰলোক হঠাৎ কেমন যেন মুশড়ে পড়ে একটা দীৰ্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,
‘সেইখানেই তো গুণগোল মশাই। আমায় বলেছে, কিন্তু কাগজেৰ রিপোর্টৱেৰ
সামনে কথাটা বলেই তো সৰ্বনাশ কৰেছে।’

‘কেন, সৰ্বনাশ বলছেন কেন?’ প্ৰশ্নটা কৰেই ফেলুদা আমাদেৱ চাকু
শৰীনথকে হাঁক দিয়ে চা আনতে বলল।

ভদ্ৰলোক বললেন, ‘কেন, সেটা বুঝতেই পাৱেন। গতকাল সকালে তুফান
এক্সপ্ৰেছে হৰাদৰাবু আমাৰ ছেলেকে নিয়ে রাজস্থান রওনা দিয়েছেন, আৱ—’

ফেলুদা বাধা দিয়ে বলল, ‘রাজস্থানেৰ কোন জায়গায় গেছেন সেটা জানেন?’

সুধীৱাবু বললেন, ‘যোধপুৱ বলেই তো বললেন। বললেন, যখন বালিৰ কথা
বলছে, তখন উত্তৰ-পশ্চিম দিকটা দিয়ে শুকু কৰিব। তা সে যাক গে—এখন কথা
হচ্ছে কী, কালই সন্ধ্যায় আমাদেৱ পাড়া থেকে একটি মুকুলেৰ বয়সী ছেলেকে কে
বা কাৱা যেন ধৰে নিয়ে যায়।’

‘আপনাৰ ধাৱণা তাকে আপনাৰ ছেলে বলে ভুল কৰে?’

‘সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। দুজনেৰ চেহারাতেও বেশ মিল আছে।
শিবৱতন মুখুজ্যে সলিস্টৱেৰ বাড়ি আছে আমাদেৱ পাড়ায়, এটি সে বাড়িৱই
ছেলে, নাম নীল, মুখুজ্যে মশায়েৰ নাতি। তাদেৱ বাড়িতে, বুঝতেই পাৱছেন,
কামাকাটি পড়ে গেস্ল। পুলিস-টুলিস অনেক হঙ্গামা। এখন অবিশ্য তাকে
ফিরে পেয়ে সব ঠাণ্ডা।’

‘এৱ মধ্যেই ফেৱত দিয়ে দিল?’

‘আজই ভোৱে। কিন্তু তাতে কী হল মশাই! আমাৰ তো এদিকে মাথা খাৱাপ
হয়ে গিয়েছে। যারা কিডন্যাপ কৰেছিল তাৰা তো বুৰোহে ভুল ছেলে এনেছে।
কিন্তু সে ছেলে যে এদিকে তাদেৱ বলে দিয়েছে যে মুকুল যোধপুৱ গেছে। এখন
ধৰন যদি সে গুণ্ডাৰা গুপ্তধনেৰ লোভে রাজস্থানে ধাওয়া কৰে তাহলে তো
বুৰোহেই পাৱছেন...’

ফেলুদা চুপ কৰে ভাবছে। তাৰ কপালে চাৰটে চেউ-খেলানো দাগ। আমাৰ
বুকেৰ ভিতৰ টিপ্পিচানি। সেটা আৰ কিছু নয়—এই সুযোগে যদি পুজোয়
রাজস্থানটা ঘুৱে আসা যায়, সেই আশায় আৰ কী। যোধপুৱ, চিতোৱ,
উদয়পুৱ—নামগুলো শুনেছি কেবল, আৰ ইতিহাসে পড়েছি। আৱ অবনী
ঠাকুৱেৰ রাজকাহিনীতে—যেটা আমাৰ নৱেশ কাকা আমাকে জন্মদিনে দেয়।

শ্ৰীনাথ চা এনে রাখল টেবিলেৰ উপৰ। ফেলুদা সুধীৱাবুৰ দিকে একটা
পেয়ালা এগিয়ে দিলেন। ভদ্ৰলোক এবাৰ একটা কিন্তু-কিন্তু ভাব কৰে বললেন,
‘আপনাৰ বিষয় কৈলাস বাবু যা বলেছিলেন, তাতে তো আপনাকে খুবই ইয়ে বলে
মনে হয়। তাই ভাৰছিলুম, যদি ধৰন, আপনি যদি রাজস্থানটা যেতে পাৱতেন।
অবিশ্য গিয়ে যদি দেখেন ওৱা নিৱাপদে আছে, তাহলে তো কথাই নেই। কিন্তু
যদি ধৰন গিয়ে কিছু গোলমাল দেখেন! মানে, আপনাৰ সাহসেৰ কথাও অনেক
শুনিচি। অবিশ্য আমি নেহাত ছা-পোষা লোক। আপনাৰ কাছে আসাটাই আমাৰ
পক্ষে একটা ধৃষ্টতা। কিন্তু যদি ধৰন আপনি যেতে রাজীই হন, তাহলে আপনাৰ,
মানে, যাতায়াতেৰ খৰচটা আমি আপনাকে নিশ্চয়ই দেবো।’

ফেলুদা কপালে ভুকুটি নিয়ে আৱো অস্তত মিনিট খানেক ওইভাৱে চুপ কৰে
বসে রইল। তাৰপৰ বলল, ‘আমি কী স্থিৰ কৰি সেটা আপনাকে কাল জানাৰ।
আপনাৰ ছেলেৰ একটা ছবি বাড়িতে আছে নিশ্চয়ই? কাগজে যেটা বেৱিয়েছিল
সেটা তেমন স্পষ্ট নয়।’

সুধীৱাবু চায়ে একটা বড় রকম চুমুক দিয়ে বললেন, ‘আমাৰ খুড়তুতো ভাই
ছবিটো তোলে—সে একটা তুলেছিল মুকুলেৰ ছবি। আমাৰ গিমীৰ কাছে
আছে।’

‘ঠিক আছে।’

ভদ্ৰলোক বাকি চা-টা শেষ কৰে হাত থেকে কাপ রেখে উঠে পড়লেন।

‘আমাৰ দোকানে অবিশ্য টেলিফোন আছে—৩৪-৫১১৬। দশটা থেকে
আমি দোকানে থাকি।’

‘আপনি এমনিতে থাকেন কোথায়?’

‘মেছোবাজাৰ। সাত নম্বৰ মেছোবাজাৰ স্ট্ৰীট। মেন রোডেৰ উপৱেই।’

ভদ্রলোক চলে যাবার পর দুরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ফেলুদাকে বললাম, ‘আচ্ছা, একটা কথার কিন্তু মানে বুবতে পারলাম না !’

‘প্যারাসাইকলজিস্ট তো ?’

আমি বললাম, ‘হ্যাঁ !’

ফেলুদা বলল, ‘মানুষের মনের কতগুলো বিশেষ ধরনের ধৈঁয়াটে দিক নিয়ে যাবা চৰ্চ করে তাদের বলে প্যারাসাইকলজিস্ট। যেমন টেলিপ্যাথি। একজন লোক আরেকজন লোকের মনের কথা জেনে ফেলল। কিংবা নিজের মনের জোরে আরেকজনের চিন্তার মোড় ঘুরিয়ে দিল। অনেক সময় এমন হয় যে, তুই ঘরে বসে আছিস, হঠাৎ একজন পুরানো বন্ধুর কথা মনে পড়ল—আর ঠিক সেই মুহূর্তেই সে বন্ধু তোকে টেলিফোন করল। প্যারাসাইকলজিস্টৰা বলে যে ব্যাপারটা আকস্মিক নয়। এর পেছনে আছে টেলিপ্যাথি। আরো আছে। যেমন এক্সট্রা সেন্সরি-পারসেপশন—যাকে সংক্ষেপে বলে ই এস্পি। ভবিষ্যতে কী ঘটতে যাচ্ছে সেটা আগে থেকে জেনে ফেলা। বা এই যে জাতিস্মর—পূর্বজ্ঞের কথা মনে পড়ে যাওয়া। এগুলো সবই হচ্ছে প্যারাসাইকলজিস্টদের গবেষণার বিষয়।’

‘এই হেমাঙ্গ হাজরা বুঝি খুব বড় প্যারাসাইকলজিস্ট ?’

‘যে ক'ঠি আছেন, তাদের মধ্যে তো বেশ নামকরা বলেই জানি। বিদেশে-চিদেশে গেছেন, লেকচার-টেকচার দিয়েছেন, বোধ হয় একটা সোসাইটি করেছেন।’

‘তোমার এসব জিনিসে বিশ্বাস হয় বুঝি ?’

‘আমি যেটা বিশ্বাস করি সেটা হল এই যে, প্রমাণ ছাড়া কোনো জিনিস বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করাটা বোকামো। মনটা খোলা না রাখলে যে মানুষকে বোকা বনতে হয়, তার প্রমাণ ইতিহাসে অজ্ঞ আছে। এককালে লোকে পৃথিবীটা ফ্ল্যাট বলে মনে করত জানিস ? আর ভাবত যে একটা জায়গায় গিয়ে পৃথিবীটা ঘুরিয়ে গেছে, যার পর আর যাওয়া যায় না। কিন্তু ভূপর্যটিক ম্যাগেলান যখন এক জায়গা থেকে রওনা হয়ে ভূপ্রদক্ষিণ করে আবার সেই জায়গাতেই ফিরে এলেন, তখন ফ্ল্যাটওয়ালাৰা সব মাথা চুলকোতে লাগলেন। আবার লোকে এটাও বিশ্বাস করেছে যে, পৃথিবীটাই স্থির, গ্রহ-নক্ষত্র-সূর্য তাকে প্রদক্ষিণ করছে। এক সময় একদল আবার ভাবত যে, আকাশটা বুঝি একটা বিৱাট উপুড়-কৰা বাটি, যার গায়ে তারাগুলো সব মণিমুক্তোর মতো বসানো আছে। কোপারনিকাস প্রমাণ করলেন যে সূর্যই স্থির, আর সূর্যকে ধিরেই পৃথিবী সমেত সৌরজগতের সব কিছু ঘূরছে। কিন্তু কোপারনিকাস ভেবেছিলেন যে, এই ঘোরাটা বুঝি বৃত্তাকারে। কেপলার এসে প্রমাণ করলেন ঘোরাটা আসলে এলিপ্টিক কক্ষে। তারপর আবার

গ্যালিলিও...যাক গে, তোকে এত জ্ঞান দিয়ে লাভ নেই। তোর নাবালক মস্তিষ্কে এসব ঢুকবে না।’

ফেলুদা এতবড় গোয়েন্দা হয়েও বুবতে পারল না যে আমাকে এখন খৌচা-টৌচা দিয়ে আমার ফুটিটা মাটি করা সহজ হবে না, কারণ আমার মন অলরেডি বলছে যে এবার ছুটিটা রাজস্থানেই কাটবে, আর নতুন দেশ দেখার সঙ্গে সঙ্গে চলবে নতুন রহস্যের জট ছাড়ানো। দেখা যাক আমার টেলিপ্যাথির দোড় কদ্দুর !

॥ ২ ॥

ফেলুদা যদিও একদিন সময় চেয়েছিল, সুধীরবাবু চলে যাওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যেই ও রাজস্থান যাওয়া ঠিক করে ফেলল। কথাটা আমাকে বলতে আমি বললাম, ‘যাচ্ছ তো ?’

ফেলুদা বলল, ‘এক মিনিটের মধ্যে রাজস্থানের পাঁচটা কেল্লাওয়ালা শহরের নাম করতে পারলে চাল আছে।’

‘যোধপুর, জয়পুর, চিত্তোর, বিকানির আর...আর...বুদির কেল্লা !’

রিস্টওয়াচের দিকে এক বলক তাকিয়ে নিয়ে তড়ক করে সোফা থেকে উঠে পড়ে সাড়ে তিন মিনিটের মধ্যে পায়জামা পাঞ্জাবি ছেড়ে প্যান্ট-স্টার্ট পরে নিয়ে ফেলুদা বলল, ‘আজ রোববার—দুটো পর্যন্ত ফেয়ারলি প্লেস খোলা—চট করে রিজার্ভেশনটা করে আসি।’

একটার মধ্যে ফেলুদা কাজ সেরে বাড়ি ফিরে এসে প্রথমেই ডিরেক্টরি খুলে নম্বর বার করে ডষ্ট হেমাঙ্গ হাজরার বাড়িতে একটা টেলিফোন করল। যে লোকটা নেই, তাকে ফোন করা হচ্ছে কেন জিজ্ঞেস করাতে বলল, ‘সুধীরবাবু লোকটা সত্যি কথা বলেছে কিনা সেটার প্রমাণের দরকার ছিল।’

‘পেলে প্রমাণ ?’

‘হ্যাঁ !’

দুপুরবেলাটা ফেলুদা বুকের তলায় বালিশ নিয়ে উপুড় হয়ে তার খাটে শুয়ে এক সঙ্গে পাঁচখানা বই ঘাঁটাঘাঁটি করল। দুটো বই পেলিক্যানের—সেগুলো প্যারাসাইকলজি সম্বন্ধে। এগুলো নাকি ফেলুদা তার কলেজের পুরানো বন্ধু অনুতোষ বটব্যালের কাছ থেকে ধার করে এনেছে। অন্য তিনটোর মধ্যে একটা হল টড সাহেবের লেখা রাজস্থানের বই, আরেকটা হল গাইড টু ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, বার্মা অ্যান্ড সিলেন, আর আরেকটা হল ভারতবর্ষের ইতিহাস, কার লেখা ভুলে গেছি।

বিকেলে চা খাবার পর ফেলুদা বলল, ‘তৈরি হয়ে নে। একবার সুধীরবাবুর বাড়ি যাওয়া দরকার।’

এখানে বলে রাখি যে, বাবাকে রাজস্থান যাচ্ছি বলাতে উনি খুব খুশি হলেন। উনি নিজে দাদুর সঙ্গে ছেলেবেলায় দু'বার রাজস্থান ঘুরে এসেছেন। বললেন, ‘চিঠোরটা মিস করিস না। চিঠোরের কেল্লা দেখলে গায়ে কাঁটা দেয়। রাজপুতরা যে কত বড় বীর যোদ্ধা ছিল সেটা তাদের চেহারা দেখলেই বোঝা যায়।’

সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা নাগাদ আমরা সাত নম্বর মেছোবাজার স্ট্রীটে গিয়ে হাজির হলাম। ফেলুদা যেতে রাজি হয়েছে শুনে সুধীরবাবুর মুখে আবার সেই গদগদ ভাব ফুটে উঠল।

‘কী বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাবো আপনাকে তা বুঝতে পারছি না।’

ফেলুদা বলল, ‘এখনো সেটার প্রয়োজন আসেনি সুধীরবাবু। এখন ধরে নিন আমরা এমনি বেড়াতে যাচ্ছি, আপনার অনুরোধে যাচ্ছি না।’

‘সময় খুব কম। আমরা কালই রওনা হচ্ছি। কিন্তু তার আগে দুটো কাজ আছে। এক হচ্ছে—আপনার ছেলের একটা ছবি চাই। আর দুই—যদি সম্ভব হয়, তাহলে সেই নীলু ছেলেটির সঙ্গে একবার দেখা করব—সেই যাকে কিডন্যাপ করেছিল।’

সুধীরবাবু বললেন, ‘এমনিতে সে ছেলে বিকেলে বাড়িতে থাকে না। তাছাড়া পুজোর বাজার, বুঝতেই তো পারছেন। তবে আজ বোধহয় তাকে আর বেরোতে দেবে না। দাঁড়ান, আগে ছবিটা এনে দিই আপনাকে।’

সুধীরবাবুর বাড়ির তিনটে বাড়ি পরে একই ফুটপাথে হল সলিস্টার শিবরতন মুখার্জির বাড়ি। ভদ্রলোক বাড়িতেই ছিলেন; সামনে বেঠকখানায় তত্ত্বপোশে একজন মুখে শ্বেতীর দাগওয়ালা লোকের সঙ্গে বসে চা খাচ্ছিলেন। সুধীরবাবুর কথা শুনে বললেন, ‘আপনার ছেলের দৌলতে আমার নাতিরও যে খ্যাতি বেড়ে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি।—বসুন আপনারা। মনোহর।’

চাকর এলে পর শিবরতনবাবু বললেন, ‘এন্দের তিনজনের জন্য চা কর। আর দেখ তো নীলু আছে কিনা—বল আমি ডাকছি।’

আমরা একটা বড় টেবিলের পাশে তিনটে চেয়ারে বসেছিলাম। আমাদের দু'পাশের দেয়ালের সামনে সিলিং পর্যন্ত উঁচু আলমারি মোটা মোটা বইয়ে ঠাসা। ফেলুদা বলে যে আইনের ব্যাপারে যত বই লাগে, অন্য কিছুতেই নাকি তত লাগে না।

আমি এই ফাঁকে একবার মুকুলের ফোটোটা ভালো করে দেখে নিলাম। বাড়ির ছাতে তোলা ছবি। ছেলেটি রোদে ভুক কুঁচকে গভীর মুখ করে সোজা ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

শিবরতনবাবু বললেন, ‘নীলুকে আমরাও অনেক কিছু জিজ্ঞেস-টিজ্জেস করেছি। গোড়ার দিকে তো কথাই বলছিল না; নার্ভস শকে গুম মেরে গিয়েছিল। বিকেলের দিক থেকে একটু নরম্যাল মনে হচ্ছে।’

‘পুলিসে খবর দেওয়া হয়েন?’ ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

‘ধরে নিয়ে যাবার পর দেওয়া হয়েছিল। তবে তারা কিছু করবার আগেই তো দেখছি ফেরত এসে গেল।’

এইবার নীলু ছেলেটি এসে চাকরের সঙ্গে ঘরে ঢুকল। সত্তিই, ছবিতে মুকুলের যে চেহারা দেখছি, তার সঙ্গে বেশ মিল আছে। দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছে



ছেলেটির এখনো ভয় কাটেনি। সে সন্দেহের ভাব করে আমাদের দিকে চেয়ে রয়েছে।

ফেলুদা হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল, ‘তোমার হাতে বুঝি ব্যাথা পেয়েছে নীলু?’

শিবরতন কী জানি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ফেলুদা তাঁকে ইশারা করে থামিয়ে দিল। নীলু নিজেই প্রশ্নটার জবাব দিল—

‘ওরা যখন আমার হাত ধরে টানল, তখন আমার হাতে ভীষণ জ্বালা করল।’

কবজির কিছু ওপরে কাটা দাগটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

ফেলুদা বলল, ‘ওরা বলছ—তার মানে একজনের বেশ লোক ছিল বুঝি?’

‘একজন লোক আমার চোখটা আর মুখটা চেপে ধরলে, আর কোলে তুলে

নিয়ে গাড়িতে উঠল। আর আরেকজন তো গাড়ি চালালো। আমার খুব ভয় করছিল।'

'আমারও ভয় করত', ফেলুদা বলল, 'তোমার চেয়েও বেশি। তুমি খুব সাহসী। তা তোমাকে যখন ধরল, তখন তুমি কী করছিলে ?'

'আমি ঠাকুর দেখতে যাচ্ছিলাম। মতিদের বাড়িতে পুজো হয়। মতি আমার ক্লাসে পড়ে।'

'রাস্তায় তখন বেশি লোকজন ছিল না বুঝি ?'

শিবরতনবাবু বললেন, 'এদিকটায় পরশু একটা গোলমাল হয়ে গেছে। বোমাটোমা পড়েছিল। তাই কাল সন্ধের দিকে লোক চলাচলটা একটু কমেছে।' ফেলুদা মাথা নেড়ে একটা ছুঁ শব্দ করে আবার নীলুর দিকে ফিরে বলল,

'তোমাকে ওরা কোথায় নিয়ে গেল ?'

'জানি না। আমার চোখ বেঁধে দিয়েছিল। অনেকক্ষণ গাড়ি চলল।'

'তারপর ?'

'তারপর একটা চেয়ারে বসাল। তারপর বসিয়ে একজন বলল, তুমি কোন ইঙ্কুলে পড় ? আমি ইঙ্কুলের নাম বললাম। তারপর বলল, 'তোমাকে যা জিজ্ঞেস করছি তার ঠিক ঠিক উত্তর দাও, তাহলে তোমার ইঙ্কুলের সামনে নামিয়ে দেবো, আর তাহলে তুমি বাড়ি যেতে পারবে তো ? আমি বললাম, হাঁ পারব। তারপর আমি বললাম, কী জিজ্ঞেস করবে তাড়াতাড়ি কর, দেরি হলে মা বকবে। তখন আমি বললাম, সোনার কেল্লা কোথায় ? তখন আমি বললাম, আমি জানি না, আর মুকুলও জানে না ; ও খালি সোনার কেল্লা জানে। তখন ওরা সব কী ইংরিজিতে বলল, মিসটেক। তারপর বলল, তোমার নাম কী ? আমি বললাম, মুকুল আমার বন্ধু কিন্তু সে রাজস্থানে চলে গেছে। তখন বলল, জায়গাটার নাম তুমি জান ? আমি বললাম, জয়পুর।'

'জয়পুর বললে ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'না না, যোধপুর। হাঁ, যোধপুর বললাম।'

নীলু একটু থামল। আমরাও সকলে চুপ। চাকর চা আর মিষ্টি এনে রেখে গেছে, কিন্তু কারুরই সে দিকে দৃষ্টি নেই। ফেলুদা বলল, 'আর কিছু মনে পড়ছে ?'

নীলু একটু ভেবে বলল, 'একজন লোক সিগারেট খাচ্ছিল। না না, চুরুট।'

'তুমি চুরুটের গন্ধ জান ?'

'আমার মেসোমশাই খায় যে !'

'সেই রাত্রে তুমি ঘুমোলে কোথায় ?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

নীলু বলল, 'জানি না তো !'

'জান না ? জান না মানে ?'

'আমাকে একবার বলল, দুধ খাও। তারপর একটা খুব ভারী গেলাসে দুধ দিল আর আমি খেলাম। আর তারপর তো আমি ঘুমিয়ে পড়লাম বসে বসেই।'

'তারপর ? ঘুম ভাঙল কখন ?'

নীলু একটু বেচারা-বেচারা ভাব করে শিবরতনবাবুর দিকে তাকাল। শিবরতনবাবু হেসে বললেন, 'ওর ঘুম ভাঙে বাড়িতে আসার পর। ওকে ওর স্কুলের সামনে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল। তখন ও ঘুমস্ত। বোধহয় ভোর রাত্রের দিকে। তারপর আমাদের বাড়িতে যে লোকটা খবরের কাগজ দেয়, সে ভোরে সাইকেল করে ওখান দিয়ে যাবার সময় দেখতে পায়। ও-ই এসে আমাদের বাড়িতে খবর দেয়। তারপর আমি আর আমার ছেলে গিয়ে ওকে নিয়ে আসি। ডাক্তার বললে যে, কোনো ঘুমের ওষুধ একটু হেভি ডোজে খাইয়ে দিয়েছিল আর কি।'

ফেলুদা গাস্তীর। চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিয়ে চাপা গলায় একবার শুধু বলল, 'স্কাউট্রেলস !' তারপর নীলুকে পিঠ চাপড়িয়ে দিয়ে বলল, 'থ্যাক ইউ নীলুবাবু। এবার তুমি যেতে পার !'

শিবরতনবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাস্তায় বেরোবার পর সুধীরবাবু বললেন, 'চিন্তার কারণ আছে বলে মনে করছেন কি ?'

ফেলুদা বলল, 'কয়েকজন অত্যন্ত লোভী এবং বেপরোয়া লোক যে আপনার ছেলের ব্যাপারে একটু বেশি মাত্রায় কৌতুহলী হয়ে পড়েছে সে তো দেখতেই পাচ্ছি। তবে তারা রাজস্থান পর্যন্ত যাবে কিনা সেটা বলা মুশকিল। ভালো কথা, আপনি বরং আমাকে একটা চিঠি দিয়ে দিন। ডক্টর হাজরা তো আর আমাকে চেনেন না। আপনি আমাকে ইন্ট্রোডিউস করে দিলে সুবিধে হবে।'

চিঠিটা দেবার পর সুধীরবাবু আরেকবার ফেলুদাকে রাজস্থানের ভাড়াটা অফার করলেন। ফেলুদা তাতে কানই দিল না। বাসস্টপের কাছাকাছি এসে ভদ্রলোক বললেন, 'গিয়ে অন্তত একটা খবর দেবেন স্যার। বড় চিন্তার থাকব। অবিশ্য ডাক্তারবাবু লিখবেন চিঠি, নিজেই কথা দিয়েছেন। কিন্তু যদি নাও লেখেন, আপনি অন্তত একখানা...'

বাড়িতে ফিরে এসে গোছগাছ করার আগে ফেলুদা তার বিখ্যাত নীল খাতা ভলিউম সিঙ্গ খুলে খাটে বসে বলল, 'কতগুলো তারিখের হিসেব বল তো দেখি—লিখে নি। ডক্টর হাজরা মুকুলকে নিয়ে রাজস্থান রওনা হয়েছেন কবে ?'

'গতকাল ৯ই অক্টোবর।'

'নীলুকে কিডন্যাপ করেছিল কবে ?'

'কালই। সন্ধেবেলা।'

‘ফেরত দিয়েছে আজ সকালে, অর্থাৎ ১০ই। আমরা রওনা হচ্ছি কাল ১১ই সকালে। আগা পৌছাব ১২ই। সেদিনই বিকেলে ট্রেনে চড়ে সেদিনই রাত্রে পৌছাব বান্দিকুই। বান্দিকুই থেকে রাত ১২টায় গাড়ি, মারওয়াড় পৌছাব সেদিনই—অর্থাৎ ১৩ই সন্ধ্যাবেলো, ১৩ই...১৩ই...’

এইভাবে ফেলুদা কিছুক্ষণ আপন মনে বিড়বিড় করে কী জানি ক্যালকুলেট করল। তারপর বলল, ‘জিয়োমেট্রি। এখানেও জিয়োমেট্রি। একটা বিন্দু—সেই বিন্দুর দিকে কনভার্জ করছে কতগুলো লাইন। জিয়োমেট্রি...’

॥ ৩ ॥

আমরা আধুনিক হল আগা ফোট স্টেশন থেকে বান্দিকুইয়ের ট্রেনে চেপেছি। আগ্রায় হাতে তিন ঘণ্টা সময় ছিল। সেই ফাঁকে দশ বছর বাদে আরেকবার তাজমহলটা দেখে নিলাম, আর ফেলুদাও আমাকে তাজের জিয়োমেট্রি সম্পর্কে একটা ছোটখাট লেকচার দিয়ে দিল।

গতকাল কলকাতা ছাড়ার আগে একটা জরুরী কাজ সেরে নিয়েছিলাম—সেটার কথা এখানে বলে রাখি। তুফান এক্সপ্রেস ছাড়বে সকাল সাড়ে নটায়, তাই আমরা ঘূম থেকে উঠেছিলাম খুব ভোরে। ছ'টা নাগাদ চা খাবার পর ফেলুদা বলল, ‘একবার তোর সিধু জ্যাঠার ওখানে তুঁ মারতে হচ্ছে। ভদ্রলোকের কাছ থেকে কিছু তথ্য জোগাড় করতে পারলে সুবিধে হবে।’

সিধু জ্যাঠা থাকেন সর্বীর শক্তির রোডে। আমাদের তারা রোড থেকে হেঁটে যেতে লাগে পাঁচ মিনিট। এখানে বলে রাখি, সিধু জ্যাঠা জীবনে নানারকম ব্যবসা করে অনেক টাকা রোজগারও করেছেন, আবার অনেক টাকা খুইয়েছেন। আজকাল আর কাজকর্ম করেন না। বইয়ের ভীষণ শখ, তাই গুচ্ছের বই কেনেন, কিছুটা সময় সেগুলো পড়েন, বাকি সময়টা একা একা বই দেখে দাবা খেলেন, আর খাওয়া নিয়ে এক্সপ্রেইমেন্ট করেন। এক্সপ্রেইমেন্টটা হচ্ছে এক খাবারের সঙ্গে আরেক খাবার মিশিয়ে খাওয়া। উনি বলেন দইয়ের সঙ্গে অমলেট মেখে খেতে নাকি অযুক্ত মতো লাগে। আসলে সম্পর্কে আমাদের কিছুই হল না উনি। আমাদের যে পৈতৃক গ্রাম (আমি যাইনি কক্ষনো) উনি সে গ্রামেরই লোক, আর আমাদের বাড়ির পাশেই ওর বাড়ি ছিল। উনি তাই আমার বাবার দাদা আর আমার জ্যাঠামশাই।

ওর বাড়িতে পৌছে দেখি সিধু জ্যাঠা দরজার ঠিক মুখটায় একটা মোড়ার উপর বসে নাপিতকে দিয়ে চুল ছাঁটাচ্ছেন, যদিও মাথার পিছন দিকে ছাড়া আর কোথাও চুল নেই তাঁর। আমাদের দেখে মোড়াটা পাশ করে বললেন, ‘বোসো।

সোনার কেঁচো

নারায়ণকে হাঁক দিয়ে বলো চা দেবে।’

একটা তক্কপোশ, দুটো চেয়ার, আর ইয়া বড় বড় তিনটে বইয়ের আলমারি ছাড়া ঘরে আর কিছু নেই। তক্কপোশটারও অর্ধেকটা বইয়ে বোঝাই। আমরা জানতাম ওই খালি জায়গাটাই সিধু জ্যাঠার জায়গা, তাই আমরা চেয়ার দুটোতে বসলাম। ফেলুদা তার ধার-করা মলাট দেওয়া বইটা সঙ্গে এনেছিল, সেটা একটা আলমারির একটা তাকের ফাঁকে শুঁজে দিল।

চুল কাটতে কাটতেই সিধু জ্যাঠা বললেন, ‘ফেলু যে গোয়েন্দাগিরি করছ, ক্রিমিন্যাল ইনভেস্টিগেশনের ইতিহাসটা একবার ভালো করে পড়ে নিয়েছ তো? যে কাজেই স্পেশালাইজ কর না কেন, তার ইতিহাসটা জানা থাকলে কাজে আনন্দ আর কল্পিফেল্স দুটোই পাবে বেশি।’

ফেলুদা নরম সুরে বলল, ‘আঞ্জে হাঁ, তা তো বটেই।’

‘এই যে আঙুলের ছাপ দেখে ক্রিমিন্যাল ধরার পদ্ধতি, এটার আবিষ্কর্তা কে জান?’

ফেলুদা আমার দিকে চোখ টিপে বলল, ‘ঠিক মনে পড়ছে না; পড়েছিলাম বোধহয়।’

আমি বুঝলাম ফেলুদার দিবিয় মনে আছে, কিন্তু সে সিধু জ্যাঠাকে খুশি করার জন্য ভুলে যাওয়ার ভাব করছে।

‘হুঁ! জিঞ্জেস করলে অনেকেই দেখবে ফস করে বলে বসবে আলফৌস বেতিয়োঁ। কিন্তু সেটা ভুল। কারেক্ট নামটা হচ্ছে হ্যান ভুকেটিচ। মনে রেখো। আর্জেন্টিনার লোক। বুড়ো আঙুলের ছাপের ওপর ইনিই প্রথম জোরটা দেন। আর সে ছাপকে চারটে ক্যাটেগরিতে ভাগ করেন উনিই। অবিশ্য তার কয়েক বছর পরে ইংল্যান্ডের হেনরি সাহেবে আরো মজবুত করেন এই সিস্টেমকে।’

ফেলুদা আর বেশি সময় নষ্ট না করে ঘাড় দেখে বলল, ‘আপনি ডক্টর হেমাঙ্গ হাজরার নাম শুনেছেন বোধহয়। যিনি প্যারাসাইকলজি নিয়ে—’

‘পাড়া-ছাই-চলো-যাই?’

এটা সিধু জ্যাঠার একটা বাতিক। একেকটা ইংরিজি কথাকে উনি এইভাবেই বেঁকিয়ে বাংলা করে বলেন। Exhibition হল ইস-কি ভীষণ, Impossible হল আম-পচে-বেল, Dictionary হল দ্যাখস-নাড়ি, Governor হল গোবরনাড়ু—এই রকম আর কী।

‘শুনেছি বইকি!’ বললেন সিধু জ্যাঠা। ‘এই তো সেদিনও কাগজে নাম দেখলাম ওর। কেন—তাকে নিয়ে আবার কী? কিছু গোলমাল করেছে নাকি? ও তো গোলমাল করার লোক নয়। বৰং উল্টো। অন্যদের বুজুকি ধরে দিয়েছে ও।’

‘তাই বুঝি?’ ফেলুদা বুঝেছে যে একটা ইন্টারেন্সিং খবরের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

‘সে জান না বুঝি ? বছর চারেক আগের ব্যাপার। কাগজে খেয়েরোছল তো। শিকাগোতে এক বাঙালী ভদ্রলোক—ভদ্র আর বলি কী করে, চৰম ছোটলোক—এক আধ্যাত্মিক চিকিৎসালয় খুলে বসেছিল। খাস শিকাগো শহরে। তরতর করে আমেরিকান খন্দের জুটে যায়, বুঝেছ। হজুগে জাত তো, আর পয়সা অঢ়েল। হিপনটিজম আঘাই করে দুরারোগ্য ব্যাধি সারিয়ে দেবো বলে ক্লেম করেছিল। এইচিনথ সেপ্টেরিতে ইউরোপে আনটন মেসমার যা করে। এর বেলা দু-একটা ছুটছাট লেগেও গিয়েছিল বোধহয়—যেমন হয় আর কী। সেই সময় হাজরা শিকাগোতে বক্তৃতা দিতে যায়। সে জানতে পেরে ব্যাপারটা চাকুয় করতে যায়; গিয়ে ভগুমি ধরে ফেলে। সে এক স্কান্ডাল। শেষ পর্যন্ত লোকটাকে দেশছাড়া করে ছেড়েছিল আমেরিকান সরকার। হাঁ হাঁ—নাম নিয়েছিল ভবানন্দ,...হাজরা খুব সলিড লোক। অস্তত লেখাটোখা পড়ে তো তাই মনে হয়। খান দুয়েক লেখা তো আমার কাছেই রয়েছে। বাঁ দিকের আলমারির তলার তাকে ডান কোণে দেখ তো। প্যারাসাইকলজিক্যাল সোসাইটির তিনখানা জার্নাল পাবে...’

ফেলুদা ম্যাগাজিন তিনটে ধার করে নেয়। এখন ট্রেনে বসে ও সেগুলোই উল্টেপাল্টে দেখছে। আমি জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছি। উত্তর প্রদেশ পেরিয়ে বাজস্তানে ঢকেছি কিছুক্ষণ আগেই।

‘এখানে রোদের তেজই আলাদা। সাধে কী আর লোকগুলো এত
পাওয়ারফুল !’

কথাটা এল আমাদের সামনের বেঁধি থেকে। ফোর-বার্থ কম্পার্টমেন্ট, আর যাত্রীও আছি সবসুন্দর চারজন। যিনি কথাটা বললেন তিনি দেখতে অত্যন্ত নিরীহ, রীতিমত রোগা, আর হাইটে নির্ঘাত আমার চেয়েও অন্তত দু' ইঞ্জি কম। আমার তো তাও বয়স মাত্র পনেরো, তাই বাড়ার বয়স যাইয়নি। ইনি কমপক্ষে পাঁয়ত্রিশ, কাজেই যেমন আছেন তেমনই থাকবেন। ইনি যে বাঙালী সেটা এতক্ষণ বুঝতে পারিনি, কারণ বুশ সার্ট আর প্যান্ট থেকে বোৰা খুব শক্ত। ভদ্রলোক ফেলুদার দিকে তাকিয়ে মুচকি ছেসে বললেন, ‘অনেকক্ষণ থেকে আপনাদের কথা শুনচি। দূর দেশে এসে জাতভাইয়ের সাক্ষাৎ পাওয়া কি কম সৌভাগ্যের কথা? আমি তো ধরেই নিয়েছিলুম এই একটা মাস মাত্তভাষাটাকে একরকম বাধ্য হয়েই বয়কট করতে হবে।’

ফেলুন্দা হয়ত খানিকটা ভদ্রতার খাতিরেই জিজ্ঞেস করল, ‘কদ্দূর যাবেন ?’
‘যোধুপুরটা তো পৌঁছই, তারপর দেখা যাবে। আপনারা ?’

‘আমরাও আপাতত যোধপুর।

‘বাঃ—চমৎকার হল। আপনিও কি লেখেন-ট্রেখেন নাকি ?

‘আজ্জে না ।’ ফেলুন হাসল । ‘আমি পড়ি । আপনি লেখেন ?

‘জটায় নামটা চেনা লাগচে কি ?

‘জটায় ? সেই যে সব রোমহর্ষক অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস লেখেন ? আমি তো
পড়েওছি তার দু-একটা বই — সাহারায় শিহরন, দুর্ধর্ষ দুশমন —আমাদের
ক্লের লাইব্রেরি থেকে নিয়ে ।

‘আপনিটু জটায়?’ ফেলদা জিজ্ঞেস করল

‘ଆଜେ ହାଁ’—ଭଦ୍ରଲୋକେର ଦାଁତ ବେରିଯେ ଗେଲ, ଘାଡ଼ ନୁମେ ପଡ଼ିଲ—‘ଏହି ଅଧିମେର ଛୁନ୍ଦାମାଇ ଜଟାୟ । ନମସ୍କାର ।’

‘নমস্কার’। আমার নাম প্রদোষ মিত্রি। ইনি শ্রীয়ান তপেশ্বরজ্ঞেন।

ফেলুন্দা হাসি চেপে রেখেছে কী করে ? আমার তো সেই যাকে বলে পেট
থেকে ভসভসিয়ে সোডার মতো হাসি গলা অবধি উঠে এসেছে। ইনিই জটায়ু !
আর আমি ভাবতাম, যেরকম গল্ল লেখেন, চেহারা নিশ্চয়ই হবে একেবারে জেম্স
বণ্ডের বাবা ।

‘আমার আসল নাম লালমোহন গাঙ্গুলী। অবিশ্য বলবেন না কাউকে। ছদ্মনামটা, মানে, ছদ্মবেশের মতোই—ধৰা পড়ে গেলে তার আর কোনো ইয়ে থাকে না।’

আমরা আগ্রা থেকে কিছু গুলাবী রেউড়ি নিয়ে এসেছিলাম, ফেলুদা ঠোঙ্গাটা ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, ‘আপনি তো বেশ কিছুদিন থেকেই ঘৰত্বেন বলে মনে হচ্ছে।’

ଭଦ୍ରଲୋକ 'ହଁ, ତା—' ବଲେ ଏକଟା ରେଉଡ଼ି ତୁଳେ ନିଯେଇ କେମନ ଯେଣ ଥତମତ ଖେଯେ ଗେଲେନ । ଫେଲୁଦାର ଦିକେ ଅବାକ ହେୟ ଚେଯେ ବଲଲେନ, 'ଆପଣି ଜାନଲେନ କୀ କବେ ?'

ফেলুন্দা হেসে বললেন, ‘আপনার ঘড়ির ব্যান্ডের তলা দিয়ে আপনার গায়ের
চামড়ার ব্রোদে-না-পোড়া আসল রংটা মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ছে।’

ভদ্রলোক চোখ গোল গোল করে বললেন, 'ওরেবাস্বৱে, আপনার তো
ভয়ক্ষণ অবজারভেশন মশাই। ঠিকই ধরেছেন দিল্লী, আগ্রা, ফতেপুর
সিঙ্গি—এইসব একটু ঘুরে দেখলুম আর কী। দিন দশেক হল বেরিয়েচি।
অ্যাদিন শ্রেফ বাড়িতে বসে বসে দেশ-বিদেশের গপ্পা লিখিচি। থাকি
ভদ্রেখরে। এবার তাই ভাবলুম—একটু ঘুরে দেখা যাক, লেখার সুবিধে হবে।
আর অ্যাডভেঞ্চারের গপ্পা এইসব দিকেই জমে ভালো, বলুন! দেখুন না কীরকম
সব রুক্ষ পাহাড়, বাইসেপ-টাইসেপের মতো ফুলে ফুলে বয়েছে!

বাংলাদেশের—এক হিমালয় ছাড়া—মাস্ল নেই মশাই। সমতলভূমিতে কি আড়তেও জমে ?

আমরা তিনজনে রেউড়ি খেতে লাগলাম। জটায়ু দেখি মাঝে মাঝে আড়চোখে ফেলুদার দিকে দেখছেন। শেষটায় বললেন, ‘আপনার হাইট কত মশাই ? কিছু মনে করবেন না !’

‘প্রায় ছয়’, ফেলুদা বলল।

‘ওঃ, দারুণ হাইট ! আমার হিরোকেও আমি ছয় করিচি। প্রথম রুদ্র—জানেন তো ? রাশিয়ান নাম—প্রথম, কিন্তু বাঙালীকেও কিরকম মানিয়ে গেছে বলুন ! আসলে নিজে যা হতে পারলুম না, বুঝেছেন, হিরোদের মধ্যে দিয়ে সেই সব আশ মিটিয়ে নিচি। কম চেষ্টা করিচি মশাই হবার জন্যে ? সেই কলেজে থাকতে চার্লস অ্যাটলাসের বিজ্ঞাপন দেখতুম বিলিতি ম্যাগাজিনে। বুক চিতিয়ে মাসল ফুলিয়ে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কী হাতের গুলি, কী বুকের ছাতি, কোমরখানা একেবারে সিংহের মতো। চর্বি নেই এক ফোঁটা সারা শরীরে। মাথা থেকে পা অবধি ঢেউ খেলে গেছে মাস্লের। বলছে—একমাসের মধ্যে আমার মতো চেহারা হয়ে যাবে, আমার সিস্টেম ফলো করে। ওদের দেশে হতে পারে মশাই। বাংলাদেশে ইমপিসিবল। বাপের পয়সা ছিল, কিছু নষ্ট করলুম, লেসন আনালুম, ফলো করলুম—কিস্যু হল না। যেই কে সেই ! মামা বললেন—পদ্ধার রড ধরে বুলবি রোজ, দেখবি একমাসের মধ্যে হাইট বেড়ে যাবে। কোথায় একমাস ! বুলতে বুলতে একদিন মশাই রড সুন্দু খসে মাটিতে পড়ে হাঁটুর হাড় ডিসলোকেট হয়ে গেল, অর্থাৎ আমি সেই পাঁচ সাড়ে তিন সেই পাঁচ সাড়ে তিনই রয়ে গেলাম। বুঝলুম, টাগ অফ ওয়ারের দড়ির বদলে আমাকে ধরে টানলেও লম্বা আমি হব না। শেষটায় ভাবলুম—দুণ্ডোরি, গায়ের মাস্লের কথা আর ভাববো না, তার চেয়ে ব্রেনের মাস্লের দিকে অ্যাটেনশন দেওয়া যাক। আর মেন্টোল হাইট। শুরু করলাম রোগাধ্য উপন্যাস লেখা। লালমোহন গাংগুলী নাম তো আর চলে না, তাই নিলুম ছদ্মনাম—জটায়। কী ফাইটা দিয়েছিল রাবণকে বলুন তো !’

ট্রেনটাকে ফাস্ট প্যাসেঞ্জার বললেও কাছাকাছির মধ্যে এত স্টেশন পড়ছে যে পনেরো-কুড়ি মিনিটের বেশি একটানা গাড়ি চলতেই পারছে না। ফেলুদা প্যারাসাইকলজিক্যাল পত্রিকা ছেড়ে এখন রাজস্থানের বিষয়ে একটা বই পড়তে শুরু করেছে। রাজস্থানের কেল্লার সব ছবি রয়েছে এ বইতে। সেগুলো সে খুব খুঁটিয়ে দেখছে আর মন দিয়ে তাদের বর্ণনা পড়ছে। আমাদের সামনে আপার বার্থে আরেকজন ভদ্রলোক রয়েছেন, তাঁর গেঁফ আর পোশাক দেখলেই বোঝা যায় তিনি বাঙালী নন। ভদ্রলোক একটার পর একটা কমলালেবু খেয়ে চলেছেন, আর

সোনার কেল্লা

তার খোসা আর ছিবড়ে ফেলছেন সামনে পাতা একটা উর্দ্দু খবরের কাগজের উপর।

ফেলুদা পকেট থেকে একটা নীল পেনসিল বার করে হাতের বইটাতে দাগ দিচ্ছিল, এমন সময় লালমোহনবাবু বললেন, ‘কিছু মনে করবেন না—আপনি কি মশাই গোয়েন্দা জাতীয় কিছু ?’

‘কেন বলুন তো ?’

‘না, মানে, যেভাবে ফস করে তখন আমার ব্যাপারটা বলে দিলেন...’
‘আমার ও ব্যাপারে ইন্টারেস্ট আছে।’

‘বাঃ ! তা আপনারাও তো যোধপুরেই যাচ্ছেন বলে বললেন।’
‘আপাতত।’

‘কোনো রহস্য আছে নাকি ? যদি থাকে তো আমি কিন্তু আপনাদের সঙ্গে ঝুলে পড়ব—ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড। এমন সুযোগ আর আসবে না।’

‘আপনার উটের পিঠে চড়তে আপত্তি নেই তো ?’

‘আরেকবাস, উট ! ভদ্রলোক চোখ জুলজুল করে উঠল। ‘শিপ অফ দি ডেজার্ট !’ এ তো আমার স্বপ্ন মশাই। আমার আরক্ষ আরব উপন্যাসে আমি বেদুইনের কথা লিখেছি যে ! তাছাড়া সাহারায় শিহরনেও আছে। অস্তুত জীব। নিজের ওয়াটার সাপ্লাই নিজের পাকস্থলীর মধ্যে নিয়ে বালির সমুদ্র দিয়ে সার বেঁধে চলেছে। কী রোমান্টিক—ওঃ !’

ফেলুদা বলল, ‘পাকস্থলীর ব্যাপারটা কি আপনার বইয়ে লিখেছেন নাকি ?

লালমোহনবাবু থতমত খেয়ে বললেন, ‘ওটা ঠিক নয় বুঝি ?’

ফেলুদা মাথা নেড়ে বলল, ‘জল আসে উটের কুঁজ থেকে। কুঁজটা আসলে চর্বি। ওই চর্বিকে অস্কিডাইজ করে উট জল করে নেয়। এক নাগাড়ে দশ পনেরো দিন ওই চর্বির জোরে জল না খেয়ে থাকতে পারে। অবিশ্য একবার জলের সঙ্কান পেলে দশ মিনিটে পঁচিশ গ্যালনও খেয়ে নেয় বলে শ্ৰেণী গেছে।’

লালমোহনবাবু বললেন, ‘ভাগিস বললেন। নেক্সট এডিশনে ওটা কারেন্ট করে দেবো।’

॥ ৪ ॥

এখানকার ট্রেন ঢিমে হলেও, বেশি যে লেট করছে না এটাই ভাগ্য। গাড়ি বদল করার ব্যাপার যেখানে থাকে, সেখানে লেট করলে অনেক সময় ভারী মুশকিল হয়।

ভরতপুর স্টেশনে এসে আমরা প্রথম ময়ুর দেখলাম। প্ল্যাটফর্মের উট্টোদিকে তিনটে ময়ুর দিব্য লাইনের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফেলুদা বলল, ‘কলকাতায়

যেমন কাক-চড়ুই দেখিস সর্বত্র, এখানে তেমনি দেখবি ময়ুর আর টিয়া।’
লোকজন যাদেখা যাচ্ছে, তাদের মধ্যে পাগড়ি আর গালপাটার সাইজ ক্রমেই
বেড়ে চলেছে। এরা সবাই রাজস্থানী। এদের পরনে খাটো ধূতি হাঁটু অবধি তোলা,
আর একপাশে বোতামওয়ালা জামা। এ ছাড়া পায়ে আছে ভারী নাগরা, আর
অনেকের হাতেই একটা করে লাঠি।

বান্দিকুই স্টেশনের রিফ্রেশমেন্ট রুমে বসে রুটি আর মাংসের ঝোল
থেতে-থেতে লালমোহনবাবু বললেন, ‘এই যে সব লোক দেখছেন, এদের মধ্যে
এক-আধটা ডাকাত থাকার সন্দেহ কিন্তু খুব বেশি। আরাবল্লী পাহাড় হল গিয়ে
ডাকাতদের আস্তানা, জানেন তো? আর এ সব ডাকাত কীরকম পাওয়ারফুল হয়
সেটা নিশ্চয়ই আপনাকে বলে দিতে হবে না। জানালার লোহার শিক দু-হাতে
দু-দিকে টেনে ফাঁক করে জেলখানা থেকে পালায় মশাই এরা।’

ফেলুদা বলল, ‘জানি। আর কারুর উপর ক্ষেপে গেলে এরা কীভাবে শান্তি
দেয় বলুন তো?’

‘মেরে ফেলে নিশ্চয়ই?’
‘উঁহ। ওইখানেই তো মজা। সে লোক যেখানেই থাকুক না কেন, তাকে খুঁজে
বের করে তলোয়ার দিয়ে নাকটা কেটে ছেড়ে দেয়।’

লালমোহনবাবুর হাতের মাংসের টুকরোটা আর মুখে পোরা হল না।

‘নাক কেটে?’
‘তাই তো শুনেছি।’
‘এ যে সেই পৌরাণিক যুগের সাজার মতো মনে হচ্ছে মশাই। কী
সাংঘাতিক!’

মাঝরাত্তিরে মারওয়াড়ের ট্রেনে ওঠার সময় অঙ্ককারে একটু হাঁচোড় প্যাঁচোড়
করতে হলেও, জায়গা পেতে অসুবিধা হল না। রাত্রে ঘুমও হল ভালো। সকালে
ঘুম থেকে উঠে চলস্ত ট্রেনের জানালা দিয়ে একটা পাহাড়ের মাথায় একটা পুরানো
কেল্লা দেখতে পেলাম। তার এক মিনিটের মধ্যেই গাড়ি কিষণগড় স্টেশনে এসে
থামল। ফেলুদা বলল, ‘জায়গার নামে গড় আছে দেখলেই বুঝবি কাছাকাছির
মধ্যে কোথাও এরকম একটা পাহাড়ের উপর একটা কেল্লা আছে।’

কিষণগড় স্টেশনে প্ল্যাটফর্মে নেমে চা খেলাম। এখানকার চায়ের ভাঁড়গুলো
দেখলাম বাংলাদেশের ভাঁড়ের চেয়ে অনেক বেশি বড় আর মজবুত। চায়ের স্বাদও
একটু অন্য রকম। ফেলুদা বলল যে, উটের দুধ দিয়ে তৈরি। সেটা শুনেই
বোধহয় লালমোহনবাবু পর পর দু'ভাঁড় চা খেলেন।

চা খেয়ে প্ল্যাটফর্মের কলে চট করে দাঁতটা মেজে চোখে মুখে জলের ঝাপটা
দিয়ে গাড়িতে ফিরে এসে দেখি, বিরাট পাগড়ি মাথায় একটা রাজস্থানী লোক নাক

অবধি চাদর ঢেকে বেঞ্চির উপর পা তুলে হাঁটুর উপর থূতনি ভর করে
লালমোহনবাবুর বেঞ্চির একটা পাশ দখল করে বসে আছে। চাদরের ফাঁক দিয়ে
ভেতরের জামার রংটা দেখলাম টকটকে লাল।

লালমোহনবাবু কামরায় ঢুকে তাকে দেখেই স্টান নিজের জায়গা ছেড়ে
আমাদের বেঞ্চির একটা কোণে বসে পড়লেন। ফেলুদা ‘তোরা আরাম করে
বোস’ বলে একেবারে সেই রাজস্থানীটার পাশেই বসে পড়ল।

আমি লোকটার পাগড়িটা লক্ষ করছিলাম। কত অজস্র প্যাঁচ আছে ওই
পাগড়িতে সেটা ভেবে কুলকিনারা পাছিলাম না। লালমোহনবাবু চাপা গলায়



ফেলুদাকে উদ্দেশ করে বলল, ‘পাওয়ারফুলি সাস্পিশাস্। এরকম চায়াভুয়োর
মতো পোশাক অথচ দিব্য প্রথম শ্রেণীতে উঠে বসে আছে। কত হীরেজহরত
আছে ওই পুটিলিটা মধ্যে কে জানে?’

পুটিলিটা পাশেই রাখা ছিল। ফেলুদা খালি একটু হাসল, মুখে কিছু বলল না।
গাড়ি ছেড়ে দিল। ফেলুদা তার ঝোলার ভিতর থেকে রাজস্থানের বইটা বার
করে নিল। আমি নিউম্যানের ব্র্যাডশ টাইম-টেবলটা খুলে সামনে কী কী স্টেশন
পড়বে দেখতে লাগলাম। অঙ্গুত নাম এখানকার সব স্টেশনের—গালোটা,
তিলাওনিয়া, মাক্রেরা, ভেসানা, সেন্দ্রা। কোথেকে এল এসব নাম কে জানে।
ফেলুদা বলে জায়গার নামের মধ্যে নাকি অনেক ইতিহাস লুকোনোথাকে। কিন্তু
সে সব ইতিহাস খুঁজে বার করবে কে?

গাড়ি ঘটার ঘটার করে চলেছে, আমি রাজকাহিনীর শিলাদিত্য বাপ্পাদিত্যের কথা

ভাবছি, এমন সময় বুবতে পারলাম আমার সার্টের পাশটায় একটা টান পড়ছে। পাশ ফিরে দেখি লালমোহনবাবুর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। চোখাচোখি হতেই তিনি ঢেকে গিলে শুকনো গলায় ফিস করে বললেন, ‘রাড়।’

‘রাড় ? লোকটা বলে কী ?

তারপর তার দৃষ্টি ঘুরে গেল সামনের রাজস্থানী লোকটার দিকে। লোকটা মাথা পিছন দিকে হেলিয়ে মুখ হাঁ করে ঘুমিয়ে আছে। এবার তার বেঞ্চির মাথা পিছন দিকে হেলিয়ে মুখ হাঁ করে ঘুমিয়ে আছে। এবার তার বেঞ্চির উপরে তোলা পা দুটোর দিকে চোখ গেল। দেখলাম, বুড়ো আঙুলের পাশটা ছাল উঠে রক্ত জমে রয়েছে। তারপর বুবলাম এতক্ষণ কাপড়ে যেগুলোকে মাটির দাগ বলে মনে হচ্ছিল, সেগুলো আসলে শুকনো লালচে রক্ত।

ফেলুদার দিকে চেয়ে দেখি, ও দিয়ি একমনে বই পড়ে চলেছে। লালমোহনবাবুর পক্ষে বোধ হয় ফেলুদার নিশ্চিন্ত ভাবটা সহ্য হল না। তিনি হঠাতেও সেই শুকনো গলাতেই বলে উঠলেন, মিস্টার মিটার, সাস্পিশাস্ রাড-মার্কস অন আওয়ার নিউ কো-প্র্যাসেঞ্জার !

ফেলুদা বই থেকে চোখ তুলে একবার ঘুমস্ত লোকটার দিকে দেখে নিয়ে বলল, ‘প্রব্যাখ্লি কজ্জ্ব বাই বাগ্স !’

রক্তের কারণ ছারপোকা হতে পারে জেনে জটায় কেমন জানি মৃত্যু পড়লেন। কিন্তু তা সন্ত্বেও তাঁর ভয় যে কাটল না সেটা তাঁর জড়োসংগৰে ভাব আর বার বার ভুক্ত কুঁচকে আড়চোখে ঘুমস্ত লোকটার দিকে চাওয়া থেকে বুবতে পারছিলাম।

দুপুর আড়াইটার সময় গাড়ি মারওয়াড় জংশনে পৌছাল। খাওয়াটা স্টেশনের রিফ্রেশমেন্ট রুমে সেরে ঘটাখানেক প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করে সাড়ে তিনটো যোধপুরের গাড়িতে ওঠার সময় আর সেই লাল জামা পরা লোকটাকে দেখতে পেলাম না।

আড়াই ঘণ্টার জারির মধ্যে ঘন ঘন উটের দল চোখে পড়ায় লালমোহনবাবু বার বার উত্তেজিত হয়ে পড়ছিলেন। যোধপুরে পৌছলাম ছাঁটা বেজে দশ মিনিটে। ট্রেনটি কুড়ি মিনিট লেট করেছে। কলকাতা হলে এতক্ষণে সূর্য ডুবে যেত, কিন্তু এদিকটা পশ্চিমে বলে এখনো দিয়ি রোদ রয়েছে।

আমাদের বুকিং ছিল সার্কিট হাউসে। লালমোহনবাবু বললেন তিনি নিউ বস্বে লজে থাকছেন। ‘কাল সকাল সকাল এসে পড়ব, একসঙ্গে ফোর্টে যাওয়া যাবে’ বলে ভদ্রলোক টাঙ্গার লাইনের দিকে এগিয়ে গেলেন।

আমরা একটা ট্যাক্সি নিয়ে স্টেশন থেকে বেরিয়ে পড়লাম। শুনলাম সার্কিট হাউসটা খুব কাছেই। যেতে যেতে বাড়ির ফাঁক দিয়ে ফাঁক দিয়ে লক্ষ করছিলাম একটা বিরাট পাথরের পাঁচিল—প্রায় একটা দোতলা বাড়ির সমান উঁচু ! ফেলুদা

বলল, এককালে পুরো যোধপুর শহরটাই নাকি ওই পাঁচিলটা দিয়ে ঘেরা ছিল। ওটার সাত জায়গায় নাকি সাতটা ফটক আছে। বাইরে থেকে সৈন্য আক্রমণ করতে আসছে জানলে ওই ফটকগুলো বন্ধ করে দেওয়া হত।

আরেকটা রাস্তার মোড় ঘুরতেই ফেলুদা বলল, ‘ওই দ্যাখ বী দিকে !’

চেয়ে দেখি শহরের বাড়ির মাথার উপর দিয়ে দূরে দেখা যাচ্ছে বিরাট থমথমে এক কেল্লা। বুবলাম ওটাই হল বিখ্যাত যোধপুর ফোর্ট। আমি জানতাম এখনকার রাজারা মোগলদের হয়ে লড়াই করেছে।

কখন কেল্লাটা কাছ থেকে দেখতে পাবো সেটা ভাবতে ভাবতেই সার্কিট হাউসে পৌঁছে গেলাম। গেটের ভিতর দিয়ে চুকে একটা বাগানের পাশ দিয়ে গিয়ে একটা পোর্টিকোর তলায় আমাদের ট্যাক্সি দাঁড়াল। মালপত্তর নামিয়ে ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে আমরা ভিতরে চুকলাম। একজন ভদ্রলোক এগিয়ে এসে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন আমরা কলকাতা থেকে আসছি কিনা আর ফেলুদার নাম মিস্টার মিটার কিনা। ফেলুদা ‘হাঁ’ বলাতে ভদ্রলোক বললেন—আপনাদের জন্য একটা ডাবল রুম বুক করা আছে। খাতায় নাম সই করার সময় আমাদের নামের কয়েক লাইন উপরেই পর পর দুটো নাম চোখে পড়ল—ডষ্ট্র এইচ এম হাজরা আর মাস্টার এম ধর।

সার্কিট হাউসের প্ল্যানটা খুব সহজ। চুকেই একটা বড় খোলা জায়গা, বাঁ দিকে রিসেপশন কাউন্টার আর ম্যানেজারের ঘর, সামনে দোতলার সিডি, ডাইনে আর বাঁয়ে দু-দিকে লম্বা বারান্দার পাশে পর পর লাইন করে ঘর। বারান্দায় বেতের চেয়ার পাতা রয়েছে। একজন বেয়ারা এসে আমাদের মাল তুলে নিল, আমরা তার পিছন পিছন ডান দিকের বারান্দা দিয়ে রওনা দিলাম তিন নম্বর ঘরের দিকে। একজন সরু গৌঁফওয়ালা মাঝবয়সী ভদ্রলোক একটা বেতের চেয়ারে বসে একজন মারওয়াড় টুপি পরা ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন ; আমরা তার পাশ দিয়ে যাবার সময় পরিষ্কার বাংলায় বললেন, ‘বাঙালী মনে হচ্ছে ?’ ফেলুদা হেসে ‘হাঁ’ বলল। আমরা তিন নম্বর ঘরে গিয়ে চুকলাম।

বেশ বড় ঘর। দুটো পাশাপাশি খাট, তাতে আবার মশারির ব্যবস্থা রয়েছে। একপাশে একটা দু'জন-বসার আর দুটো একজন বসার সোফা, আর একটা গোল টেবিলের উপর একটা অ্যাশ-ট্রে। এ ছাড়া ড্রেসিং টেবিল, আলমারি আর খাটের পাশে দুটো ছোট টেবিলে জলের ফ্লাক্স, গেলাস আর বেড-সাইড ল্যাম্প। ঘরের সঙ্গে লাগা বাথরুমের দরজাটা বাঁ দিকে।

ফেলুদা বেয়ারাকে চা আনতে বলে পাখাটা খুলে দিয়ে সোফায় বসে বলল, ‘খাতায় নাম দুটো দেখলি ?’

আমি বললাম, হাঁ। কিন্তু ওই চাড়া-দেওয়া গৌঁফওয়ালা লোকটা আশা করি

ডষ্ট্র হাজৰা নন।'

'কেন? হলে ক্ষতি কী?'

ক্ষতি যে কী সেটা অবিশ্য আমি চট কর ভেবে বলতে পারলাম না। ফেলুদা আমার ইতস্তত ভাব দেখে বলল, 'তোর আসলে লোকটাকে দেখে ভালো লাগেনি। তুই মনে মনে চাইছিস যে ডষ্ট্র হাজৰা লোকটা খুব শান্তশিষ্ট হাসিখুনি অম্যায়িক হন—এই তো?'

ফেলুদা ঠিকই ধৰেছে। এ লোকটাকে দেখলে বেশ সেয়ানা বলেই মনে হয়। তা ছাড়া বোধহয় বেশ লম্বা আৰ জাঁদৱেল। ডাঙ্কাৰ বলতে যা বোৰায় তা মোটেই নয়।

ফেলুদা একটা সিগারেট শেষ কৰতে না কৰতেই চা এসে গেল, আৰ বেয়াৰা ঘৰ থেকে বেৱোতে না বেৱোতেই দৰজায় টোকা পড়ল। ফেলুদা ভীষণ বিলিতি কায়দায় বলে উঠল, 'কাম ইন! পৰ্দা ফাঁক কৰে ভেতৱে চুকলেন মিলিটাৰি গোঁফ।

'ডিস্টাৰ্ব কৰছি না তো?'

'মোটেই না। বসুন। চা খাবেন?'

'নাঃ। এই অলঙ্কৃণ আগেই খেয়েছি। আৰ ফ্র্যাকলি স্পীকিং—চা-টা এখানে তেমন সুবিধেৰ নয়। শুধু এখানে বলছি কেন, ভাৱতবৰ্ষ হল খাস চায়েৰ দেশ, অথচ ক'টা হোটেলে ক'টা ডাকবাংলোয় ক'টা সার্কিট হাউসে ভালো চা খেয়েছেন আপনি বলুন তো? অথচ বাইৱে যান, বিদেশে যান—অ্যালবেনিয়াৰ মতো জায়গায় গিয়ে ভালো চা খেয়েছি জানেন? ফাৰ্স্ট ক্লাস দার্জিলিং টি। আৰ জায়গায় গিয়ে ভালো চা খেয়েছি জানেন? ফাৰ্স্ট ক্লাস দার্জিলিং টি। আৰ হল কাপড়েৰ থলিতে চায়েৰ পাতাৰ ব্যাপারটা—যাকে টি-ব্যাগস বলে। কাপে থাকবে গৱাম জল, আৰ একটা সুতো বাঁধা কাপড়েৰ থলিতে থাকবে চায়েৰ থাকবে গৱাম জল, আৰ নিতে হবে আপনাকে। তাৰপৰ পাতা। সেইটো জলে ডুবিয়ে লিকার তৈৰি কৰে নিতে হবে আপনাকে। তাৰপৰ তাতে আপনি দুধ দিন কী লেবু কচলে দিন সেটা আপনার রুচি। লেমন টি-টাই আমি বেশি প্ৰেফাৰ কৰি। তবে তাৰ জন্যে চাই ভালো লিকার। এখানকাৰ চা খুব অর্ডিনাৰি।'

'আপনার তো অনেক দেশ-টেশ ঘোৱা আছে বুঝি?' ফেলুদা জিজেস কৰল।

'ওইটেই তো কৰেছি সাৱা জীবন ধৰে, ভদ্রলোক বললেন। 'আমি হলাম যাকে বলে প্লোব-ট্রাটাৰ। তাৰ সঙ্গে আৰাৰ শিকাৰেৰ শখও আছে। সেটা অবিশ্য আফিকায় থাকতেই হয়েছিল। আমাৰ নাম মন্দাৰ বোস।'

প্লোব-ট্রাটাৰ উমেশ ভট্চাৰ্যৰ নাম শুনেছি, কিন্তু এৰ নাম তো শুনিনি। ভদ্রলোক যেন আমাৰ মনেৰ কথাটা আন্দজ কৰেই বললেন, 'অবিশ্য আমাৰ নাম

আপনাদেৱ শোনাৰ কথা নয়। যখন প্ৰথম বেৱিয়েছিলাম, তখন কাগজে নামটাম বেৱিয়েছিল। তাৰপৰ এই ছত্ৰিশ বছৰ পৱে মাস তিনেক হল সবে দেশে ফিরেছি।'

'সে অনুপাতে আপনাৰ বাংলাৰ উপৰ দখলটা তো ভালো আছে বলতে হবে।'

'দেখুন মশাই, সেটা এন্টায়াৱলি আপনাৰ ইচ্ছে অনিচ্ছেৰ ওপৰ নিৰ্ভৰ কৰে। আপনি যদি বিদেশে বাংলা ভুলবেন বলে ইচ্ছে কৰেন, তা হলে তিন মাসে ভুলে যেতে পাৰেন। আৰ তা যদি ইচ্ছে না কৰেন, তা হলে ত্ৰিশ বছৰেও ভোলবাৰ কোনো চাপ নেই। অবিশ্য আমি আৰাৰ বাঙালীৰ সঙ্গও পেয়েছি যথেষ্ট। কিনিয়াতে একবাৰ হাতিৰ দাঁতেৰ ব্যবসা শুৰু কৰেছিলাম, তখন আমাৰ সঙ্গে একটি বাঙালী ছিলেন। আমৰা এক সঙ্গে ছিলাম প্ৰায় সাত বছৰ।'

'সাৰ্কিট হাউসে আপনি ছাড়া আৰ কেউ বাঙালী আছেন কি?'

এটা অনেকবাৰ লক্ষ কৰেছি, বাজে কথায় সময় নষ্ট কৰাৰ লোক ফেলুদানয়! ভদ্রলোক বললেন, 'আছে বইকি। সেটাই তো আশচৰ্য লাগছে আমাৰ। আসলে কলকাতায় বাঙালীদেৱ আৰ সোয়ান্তি নেই সেটা বেশ বুৰাতে পাৰছি। তাই সুযোগ পেলেই এদিকে ওদিকে গিয়ে ঘুৱে আসছে। অবিশ্য দিস ম্যান হাজ কাম উইথ এ পাৰপাস। ভদ্রলোক সাইকলজিস্ট। তবে গোলমেলে ব্যাপার বলে মনে হয়। সঙ্গে একটি ছেলে আছে বছৰ আঠকেৰ, সে নাকি জাতিস্মৰ। পূৰ্বজ্যোতি রাজস্থানে কোনো কেল্লাৰ কাছে নাকি জয়েছিল। ভদ্রলোক ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে সেই কেল্লা খুঁজে বেড়াচ্ছেন। ডাঙ্কাৰটি বুজুৰক না ছেলেটি ধাপা দিচ্ছে বোৰা শক্ত। এমনিতেও ছেলেটিৰ হাবভাৰ সাস্পিশাস্ত। কাৰুৰ সঙ্গেভালো কৰে কথা বলে না। কিছু জিজেস কৰলে জবাৰ দেয় না। ভেৱি ফিশি। অনেক তো দেখলুম ভগুমি এই ত্ৰিশ বছৰে, আৰাৰ এখানে এসেও যে সেই একই জিনিস দেখতে হবে তা ভাবিনি।'

'আপনি কি এখানেও ট্ৰাইং কৰতে এসেছেন নাকি?'

ভদ্রলোক হেসে সোফা ছেড়ে উঠে পড়ে বললেন, 'টু টেল ইউ দ্য টুথ—নিজেৰ দেশটা ভালো কৰে দেখাই হয়নি এখনো। বাই দ্য ওয়ে—আপনাৰ পৱিচয়টা তো পাওয়া গেল না।'

ফেলুদা নিজেৰ আৰ আমাৰ পৱিচয় দিয়ে বলল, 'আমি আৰাৰ আমাৰ দেশেৰ বাইৱে কোথাওই যাইনি।'

'আই সী। ওয়েল—সাড়ে আটটা নাগাদ যদি ডাইনিং রুমে আসেন তো আৰাৰ দেখা হবে। আমাৰ আৰাৰ আলি টু বেড, আলি টু রাইজ...'

ভদ্রলোকেৰ সঙ্গে আমৰাও দু'জনে বাইৱেৰ বারান্দায় এলাম। এসে দেখলাম, গোট দিয়ে একটা ট্যাঙ্কি চুকছে। সেটা এসে সাৰ্কিট হাউসেৰ সামনে থামল, আৰ

সেটা থেকে নামল একটি বছৰ চলিশের মাঝারি হাইটের ভদ্রলোক আৱ একটা
ৱোগা ফুসা বাচ্চা ছেলে। বোঝাই গেল যে এৱাই হচ্ছে ডষ্টৰ হেমাঙ্গ হাজৱা
এবং জাতিস্মৰ শ্রীমান মুকুল ধৰ।

॥ ৫ ॥

মিস্টাৱ বোস ডষ্টৰ হাজৱাকে শুড ইভনিং বলে নিজেৰ ঘৰেৱ দিকে চলে
গেলেন। ডষ্টৰ হাজৱা ছেলেটিৰ হাত ধৰে বারান্দা দিয়ে আমাদেৱ দিকেই এগিয়ে
এসে, ৰোধহয় হঠাৎ দু'জন অচেনা বাঙালীকে দেখে কেমন যেন একটু থতমত
থেয়ে গেলেন। ফেলুদা হেসে নমফৰাক কৰে বলল, ‘আপনিই ৰোধ হয় ডষ্টৰ
হাজৱা?’

‘হাঁ—কিন্তু আপনাকে তো—?’

ফেলুদা পকেট থেকে তাৱ একটা কাৰ্ড বার কৰে ডষ্টৰ হাজৱাকে দিয়ে বলল,
‘আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল। সত্যি বলতে কী, আমৱা আপনার খৌঁজেই
এসেছি। সুধীৱাৰাবুৰ অনুৱোধে। সুধীৱাৰাবু একটা চিঠিও দিয়েছেন আপনার
নামে।’

‘ও। আই সী। মুকুল, তুমি ঘৰে যাও, আমি এন্দেৱ সঙ্গে একটু কথা বলে
আসছি, কেমন?’

‘আমি বাগানে যাব।’

ছেলেটিৰ গলা বাঁশিৰ মতো মিষ্টি, যদিও কথাটা বলল, একেবাবে নেড়াভাৱে,
এক সুৱে। প্ৰায় যেন একটা যন্ত্ৰেৰ মানুষেৰ ভেতৰ থেকে কথা বেৱোচ্ছে। ডষ্টৰ
হাজৱা বললেন, ‘ঠিক আছে, বাগানে যাও, তবে লক্ষ্মী হয়ে থেকো, গোটেৰ বাইৱে
যেও না, কেমন?’

ছেলেটি আৱ কিছু না বলে বারান্দা থেকে এক লাফে নুড়িফেলা জায়গাটায়
নামল। তাৱপৰ একটা ফুলেৰ লাইন টপকে বাগানেৰ ঘাসেৰ উপৰ পৌঁছে চুপ
কৰে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। ডষ্টৰ হাজৱা আমাদেৱ দিকে ফিৰে কেমন
যেন একটু অপস্তুত হাসি হেসে বললেন, ‘কোথায় বসবেন?’

‘আসুন আমাদেৱ ঘৰে।’

ডষ্টৰ হাজৱাৰ কানেৱ চুলে পাক ধৰেছে। চোখ দুটোয় বেশ একটা তীক্ষ্ণ
বুদ্ধিৰ ছাপ আছে। কাছ থেকে দেখে মনে হল বয়স প্ৰায় পঞ্চাশেৰ কাছাকছি।
আমৱা তিনজনে সোফায় বসলাম। ফেলুদা ডষ্টৰ হাজৱাকে সুধীৱাৰাবুৰ চিঠিটা
দিয়ে তাঁকে একটা চাৱমিনার অফাৱ কৰল। ভদ্রলোক একটু হেসে ‘ও রসে
বাধিত’ বলে চিঠিটা পড়তে লাগলেন।

পড়া হলে পৰ ডষ্টৰ হাজৱা চিঠিটা ভাঁজ কৰে খামে পুৱে রাখলেন।

ফেলুদা এবাৱ নীলুকে কিডন্যাপ কৰাৱ ঘটনা বলে বলল, ‘সুধীৱাৰাবু ভয়
পাছিলেন যে ওই লোকগুলো হয়ত মুকুলকে ধাওয়া কৰে একেবাবে যোধপুৰ
পৰ্যন্ত চলে এসেছে। সেই কাৰণেই উনি বিশেষ চিহ্নিত হয়ে আমাৱ কাছে
এসেছিলেন। আমি খানিকটা তাঁৰ অনুৱোধে পড়ে— এসেছি। অবিশ্য দুৰ্ঘটনা যদি
কোনো না ঘটে তাহলেও আমাদেৱ আসাটা যে একেবাবে ব্যৰ্থ হবে তা নয়, কাৰণ
ৱাজস্থান দেখাৰ শখটা অনেক দিনেৰ।’

ডষ্টৰ হাজৱা একটুক্ষণ ভেবে বললেন, ‘দুশ্চিন্তাৰ কাৰণ যাকে বলে সে রকম
অবিশ্য এখনো পৰ্যন্ত কিছু ঘটেনি। তবে ব্যাপারটা কী জানেন, খবৰেৰ কাগজেৰ
রিপোৰ্টৰদেৱ অতগুলো কথা না বললেও চলত। আমি সুধীৱাৰাবুকে বলেছিলাম
যে ইন্ডেস্ট্ৰিশনটা সেৱে নিই, তাৱপৰ আপনি যত ইচ্ছা রিপোৰ্টৰ ডাকতে চান
ডাকতে পাৱেন। বিশেষ কৰে যেখানে গুপ্তধনেৰ কথাটা বলছে। আমি না হয়
জানি যে কোনো কথাটাৱই হয়ত ভিত্তি নেই, কিন্তু কিছু লোক থাকে যাবা
সহজেই প্ৰলুক হয়ে পড়ে।’

‘জাতিস্মৰ ব্যাপারটা সম্বন্ধে আপনি কী মনে কৰেন?’

‘মনে যা কৰি সেটাকে তো এখনো পৰ্যন্ত অনুকৰাবে চিল মারা ছাড়া আৱ কিছুই
বলা চলে না। অৰ্থাত চিল না মেৰেই বা কী কৰি বলুন। জাতিস্মৰ যে আগেও
এক-আধটা বেৱোয়নি তা তো নয়। আৱ তাৱেৱ অনেক কথাই তো হৰহ মিলে
গেছে। সেই জন্যেই যখন এই মুকুল ছেলেটিৰ খবৰ পাই, তখনই ঠিক কৰি যে
একে নিয়ে একটা থৰো ইন্ডেস্ট্ৰিশন কৰব। যদি দেখি যে এৱে কথাৰ সঙ্গে সব
ডিটেল মিলে যাচ্ছে, তখন সেটাকে একটা প্ৰামাণ্য ঘটনা হিসেবে ধৰে তাৱ উপৰ
গবেষণা চালাব।’

‘কিছুদূৰ এগিয়েছেন কি?’ ফেলুদা জিজ্ঞেস কৰল।

‘এইটে অন্তত বুৰোছি যে, ৱাজস্থান সম্বন্ধে কোনো ভুল কৰিনি। এখনকাৰ
মাটিতে পা দেওয়াৰ পৰ থেকে মুকুলেৰ হাবভাৱ বদলে গেছে। বুঝতেই তো
পাৱছেন, বাপ-মা-ভাই-বোনকে এই প্ৰথম ছেড়ে একজন অচেনা লোকেৰ সঙ্গে
চলে এল, অৰ্থাত এই ক'দিনে একটিবাৰ তাৱেৱ নাম পৰ্যন্ত কৰল না।’

‘আপনার সঙ্গে সম্পর্ক কেমন?’

‘কোনো গোলমাল নেই। কাৰণ, বুঝতেই তো পাৱছেন, আমি ওকে ওৱ
স্বপ্নৱাজে নিয়ে চলেছি। ওৱ সমস্ত মনটাই তো পড়ে আছে ওৱ সোনাৱ কেল্লাৰ
দেশে, আৱ এখানে এসে কেল্লা দেখলৈই ও লাফিয়ে উঠছে।’

‘কিন্তু সোনাৱ কেল্লা দেখেছে কি?’

ডষ্টৰ হাজৱা মাথা নাড়লেন।

'না। তা দেখেনি। আসবার পথে কিষণগড় দেখিয়ে এনেছি। গতকাল সন্ধ্যায় এখনকার ফোটা দেখেছে বাইরে থেকে। আজ বারমের নিয়ে গিয়েছিলাম। প্রতিবারই বলে—এটা নয়—আরেকটা দেখবে চলো। এ ব্যাপারে ধৈর্য লাগে মশাই। অথচ চিতোর উদয়পুরের দিকটা গিয়ে কোনো লাভ নেই, কারণ ওদিকে বালি নেই। বালির কথা ও বার বার বলে, আর বালি বলতে এদিকটাতেই আছে, আর আগেও তাই ছিল। কাল তাই ভাবছি বিকানিরটা দেখিয়ে আনব।'

'আমরা আপনার সঙ্গে গেলে আপনি নেই তো ?'
'মোটেই না। আর শুধু তাই না। আপনি সঙ্গে থাকলে কিছুটা নিশ্চিত হতে পারব, কারণ...একটা ঘটনা...'

ভদ্রলোক চূপ করলেন। ফেলুদা সিগারেটের প্যাকেটটা পকেট থেকে বার করেছিল, কিন্তু সেটা আর খুলল না।

'কাল সন্ধ্যায় একটা টেলিফোন এসেছিল,' ডষ্টের হাজরা বললেন।
'কোথায় ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'এই সার্কিট হাউসে। আমি তখন কেঁজা দেখতে গেছি। কেউ একজন ফোন করে জানতে চেয়েছিল, কলকাতা থেকে একজন ভদ্রলোক একটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে কিনা। ম্যানেজার ন্যাচারেলি হাঁ বলে দিয়েছে।'

ফেলুদা বলল, 'কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে কলকাতার কাগজের খবরটা এখানে কেউ কেউ হ্যাত জানে, এবং সেই জন্যেই সেটাকে ভেরিফাই করার জন্যে এখানে ফোন করেছে। যোধপুরে তো বাঙালীর অভাব নেই। এসব ব্যাপারে কৌতুহল জিনিসটা স্বাভাবিক নয় কি ?'

'বুবলাম। কিন্তু সে লোক আমি এসেছি জেনেও আর খৌজ করল না কেন ? বা এখানে এল না কেন ?'

'হি... ফেলুদা গভীরভাবে মাথা নাড়ল। 'আমার মনে হয় আমি আপনার সঙ্গে থাকাটাই ভালো। আর মুকুলকেও একা ছাড়বেন না বেশি।'

'পাগল !'
ডষ্টের হাজরা উঠে পড়লেন।

'কালকের জন্যে একটা ট্যাক্সির বন্দোবস্ত করা আছে। আপনারা তো মাত্র দু'জন, তাই একটা ট্যাক্সিতেই হয়ে যাবে।'

ভদ্রলোক যখন দরজার দিকে এগোচ্ছেন তখন ফেলুদা হঠাৎ একটা প্রশ্ন করে বসল—

'ভালো কথা—শিকাগোতে আপনাকে জড়িয়ে একবার কোনো ঘটনা ঘটেছিল কি ? এই বছর চারেক আগে ?'

ডষ্টের হাজরা ভুঁক কুঁচকোলেন।

'ঘটনা ? শিকাগোতে আমি গেছি বটে...'

'একটা আধ্যাত্মিক চিকিৎসালয় সংক্রান্ত ব্যাপার... ?'

ডষ্টের হাজরা হো হো করে হেসে উঠলেন—'ওহো—সেই স্বামী ভবানদের ব্যাপার ? যাকে আমেরিকানরা বলত ব্যাব্যানাস্তা ! ঘটেছিল বটে, কিন্তু কাগজে যেটা বেরিয়েছিল সেটা অতিরিক্ত। লোকটা ভগু ঠিকই, কিন্তু সে রকম ভগু অনেক হাতুড়ে, অনেক টোকাওয়ালাদের মধ্যে পাওয়া যায়। তার চেয়ে বেশি কিছু না। ওর বুজুরুকি আসলে ধরে ফেলে ওর পেশেন্টেরাই। খবরটা রটে যায়। প্রেস থেকে আমার কাছে আসে ওপিনিয়নের জন্য। আমি বরং ওর সম্বন্ধে খানিকটা মোলায়েম করেই বলেছিলাম। কাগজে তিলটাকে তাল করে ছাপায়। তারপর আমার ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয়ও হয়েছিল। আমি নিজেই ওর সঙ্গে দেখা করে ব্যাপারটা ক্লিয়ার করে নিই—আব্দ উই পার্টেড অ্যাজ ফ্রেন্স।'

'ধন্যবাদ। কাগজের রিপোর্ট দেখে আমার ধারণা অন্যরকম হয়েছিল।'

ডষ্টের হাজরার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও ঘর থেকে বেরোলোম। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। পশ্চিমের আকাশটা এখনো লাল, তবে রাস্তার বাতি জ্বলে গেছে। কিন্তু মুকুল কোথায় ? বাগানে ছিল সে, কিন্তু এখন দেখছি নেই। ডষ্টের হাজরা চট করে একবার নিজের ঘরে খুজে ব্যস্তভাবে বেরিয়ে এলেন।

'ছেলেটা গেল কোথায়' বলে ভদ্রলোক বারান্দা থেকে বাইরে নামলেন। আমরা তার পিছন পিছন গেলাম বাগানে। বাগানে যে নেই সে ছেলে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

'মুকুল !' ডষ্টের হাজরা ডাক দিলেন। 'মুকুল !'

'ও আপনার ডাক শুনেছে,' ফেলুদা বলল। 'ও আসছে।'

আবছা অঙ্ককারে দেখলাম মুকুল রাস্তা থেকে গেট দিয়ে ঢুকল। আর সেই সঙ্গে দেখলাম উল্টো দিকের ফুটপাথ দিয়ে একটা লোক দুট হেঁটে পুবদিকে নতুন প্যালেসের দিকটায় চলে গেল। লোকটার মুখ দেখতে পারলাম না বটে, কিন্তু তার গায়ের জামার টকটকে লাল রংটা এই অঙ্ককারেও স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। ফেলুদা দেখেছে কি লোকটাকে ?

মুকুল এগিয়ে এল আমাদের দিকে। ডষ্টের হাজরা হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেলেন। তারপর খুব নরম গলায় বললেন—

'ওরকমভাবে বাইরে বেরোতে হয় না মুকুল !'

'কেন ?' মুকুল ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল।

'অচেন জায়গা—কতরকম দুষ্ট লোক আছে এখানে।'

'আমি তো চিনি।'

'কাকে চেনো ?'

মুকুল হাত বাড়িয়ে রাস্তার দিকে দেখাল—

‘ওই! যে, যে লোকটা এসেছিল।’

হেমান্দবাবু মুকুলের কাঁধে হাত দিয়ে ফেলুদার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘দ্যাটস দা-ট্রাবল। কাকে যে সত্তি করে চেনে আর কাকে যে পূর্বজন্মে চিনত তা বলা মুশ্কিল।’

লক্ষ করলাম মুকুলের হাতে কী জানি একটা কাগজের টুকরো চক চক করছে। ফেলুদাও দেখেছিল সেটা। বলল, ‘তোমার হাতের কাগজটা একবার দেখব?’

মুকুল কাগজটা দিল। একটা দু’ ইঞ্চি লম্বা আধ ইঞ্চি চওড়া সোনালি রাখ্তা।

‘এটা কোথায় পেলে মুকুল?’ ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

‘এইখানে, বলে মুকুল ঘাসের দিকে আঙুল দেখাল।

‘এটা আমি রাখতে পারি?’ ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

‘না। ওটা আমি পেয়েছি।’ সেই একই সুর। একই ঠাণ্ডা গলার স্বর। অগত্যা ফেলুদা কাগজটা ফেরত দিয়ে দিল।

ডষ্টর হাজরা বললেন, ‘চলো মুকুল, ঘরে যাই। হাত-মুখ ধুয়ে তারপর খেতে যাবো আমরা। চলি মিস্টার মিস্তির। কাল ঠিক সাড়ে সাতটায় আর্লি ব্রেকফাস্ট করে বেরোচ্ছি আমরা।’

খেতে যাবার আগেই ফেলুদা সুধীরবাবুকে পৌঁছ-খবর আর মুকুলের খবর দিয়ে একটা পোস্টকার্ড লিখে দিয়েছিল। স্নানটান সেরে যখন ডাইনিং রুমে পৌঁছেছি ততক্ষণে ডষ্টর হাজরা আর মুকুল ঘরে চলে গেছেন। মন্দারবাবুকে দেখলাম উল্টো দিকের কোনায় সেই অবাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে বসে পৃষ্ঠি থাচ্ছেন। আমাদের সুপ আসতে আসতে তাঁরা উঠে পড়লেন। দরজার দিকে যাবার পথে মন্দার বোস হত তুলে গুড়নাইট জানিয়ে গেলেন।

দু’দিন ট্রেনে পথ চলে বেশ ক্লান্ত লাগছিল। ইচ্ছে ছিল, খেয়ে এসেই ঘুমিয়ে পড়ব, কিন্তু ফেলুদার জন্য একটুকু জেগে থাকতে হল। ফেলুদা তার নীল খাতা নিয়ে সিগারেট ধরিয়ে সোফায় বসেছে, আর আমি খাটে গিয়ে শুয়েছি। সঙ্গে অ্যান্টি-মশা মলম ছিল বলে আর মশারি টাঙাতে দিইনি।

ফেলুদা ডট পেনের পেছনটা টিপে নিবটা বার করে নিয়ে বলল, ‘কার কার সঙ্গে আলাপ হল বল।’

বললাম, ‘কবে থেকে শুরু করব?’

‘সুধীর ধরের আসা থেকে।’

‘তাহলে প্রথমে সুধীরবাবু। তারপর নিবরতন। তারপর নীলু। তরপর

শিবরতনবাবুর চাকর—

‘নাম কী?’

‘মনে নেই।’

‘মনোহর। তারপর?’

‘তারপর জটায়ু।’

‘আসল নাম কী?’

‘লালমোহন।’

‘পদবী?’

‘পদবী... পদবী... গান্দুলী।’

‘গুড়।’

ফেলুদা লিখে চলেছে। আমিও বলে চললাম।

‘তারপর সেই লাল জামা পরা লোকটা।’

‘আলাপ হয়েছিল তার সঙ্গে?’

‘না—তা হয়নি—’

‘ঠিক আছে। নেক্সট?’

‘মন্দার বোস। আর তার সঙ্গে যে লোকটা ছিল।’

‘আর মুকুল ধর, ডষ্টর—’

‘ফেলুদা।’

আমার চিৎকারে ফেলুদার কথা থেমে গেল। আমার চোখ পড়েছে ফেলুদার বিছানার উপর। কী যেন একটা বিশ্বী জিনিস বালিশের তলা থেকে বেরোতে চেষ্টা করছে। আমি সেদিকে আঙুল দেখালাম।

ফেলুদা ডাঢ়াক করে লাফিয়ে উঠে এসে বালিশটাকে সরিয়ে ফেলতেই একটা কাঁকড়া বিছে বেরিয়ে পড়ল। ফেলুদা বিছানার চাদরটা ধরে একটা ঝটকা টান দিয়ে বিছেটাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে চাটি দিয়ে তিনটে প্রচণ্ড চাপড় মেরে সেটাকে সাবাড় করল। তারপর একটা খবরের কাগজের টুকরো ছিড়ে নিয়ে হেঁতলানো বিছেটাকে তার মধ্যে তুলে বাথরুমে গিয়ে পিছনের দরজাটা খুলে কাগজটাকে পুটলি পাকিয়ে বাইরে ফেলে দিল। তারপর ফিরে এসে বলল, ‘জমাদারের আসার দরজাটা খোলা ছিল, তাই এ ব্যাটা চুকতে পেরেছে। নে, তুই এবার ঘুমিয়ে পড়। কাল ভোরে ওঠা আছে।’

আমার কিন্তু মোটেই অতটা নিশ্চিন্ত লাগছিল না। আমার মনে হচ্ছিল—নাঃ, থাক। যদি আমার টেলিপ্যাথির জোর থাকে, তাহলে হয়ত বিপদের কথা বেশি ভাবলেই বিপদ এসে পড়বে। তার চেয়ে ঘুমোনোর চেষ্টা দেখি।

পরদিন সকালে উঠে দাঁতটাত মেজে যেই ঘর থেকে বেরিয়েছি অমনি একটা চেনা গলায় শুনলাম, ‘গুড মর্নিং’ জটায়ু হাজির। ফেলুদা আগেই বারান্দায় চোখ বেরিয়ে বেতের চেয়ারে বসে চায়ের অপেক্ষা করছিল। লালমোহনবাবু চোখ পেরিয়ে বেতের চেয়ারে বসে চায়ের অপেক্ষা করছিল। লালমোহনবাবু চোখ গোল গোল করে বললেন, ‘ওঃ—কী খ্রিলিং জায়গা মশাই! ফুল অফ পাওয়ারফুল সাস্পিশাস্ ক্যারেক্টারস্!’

‘আপনি অক্ষত আছেন তো?’ ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

‘কী বলচেন মশাই! এখানে এসে দারুণ ফিট লাগছে। আজ আমাদের লজের ম্যানেজারকে পাঞ্জায় চালেঞ্জ করেছিলুম। ভদ্রলোক রাজী হলেন না।’ তারপর এগিয়ে এসে ফিসফিস করে বললেন, ‘আমার কাছে একটি অস্ত্র আছে সুটকেসে—’

‘গুলতি?’ ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

‘নো সার! একটি নেপালী ভোজালি। খাস কাটমুগুর জিনিস। কেউ অ্যাটাক করলে জয় মা বলে চালিয়ে দেবো পেটের মধ্যে, তারপর যা থাকে কপালে। অনেকদিনের শথ একটা ওয়েপনের কালেকশন করব, বুঝেছেন।’

আমার আবার হাসি পেলো, কিন্তু ক্রমেই সংযম অভ্যেস হয়ে আসছে, তাই সামলে গেলাম। লালমোহনবাবু ফেলুদার পাশের চেয়ারে বসে বললেন, ‘আজকের প্ল্যান কী আমাদের? ফোর্ট দেখতে যাচ্ছেন না?’

ফেলুদা বলল, ‘যাচ্ছ বটে, তবে এখানে নয়, বিকানির।’

‘হঠাৎ আগেভাগে বিকানির? কী ব্যাপার?’

‘সঙ্গী পাওয়া গেছে। গাড়ি যাচ্ছে একটা।’

বারান্দার পশ্চিম দিক থেকে আরেকটা গুড মর্নিং শোনা গেল। প্লোব-ট্র্যাটার আসছেন। ‘যুম হল ভালো?’

লালমোহনবাবু দেখলাম মন্দার বোসের মিলিটারি গৌঁফ আর জাঁদরেল চেহারার দিকে বেশ প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখছেন। ফেলুদা দু'জনের আলাপ করিয়ে দিলেন।

‘আরেবাস! প্লোব-ট্র্যাটার?’ লালমোহনবাবুর চোখ ছানাবড়। ‘আপনাকে তো তাহলে কালচিভেট করতে হচ্ছে মশাই। অনেক লোমহর্ষক অভিজ্ঞতা আছে নিশ্চয়ই আপনার।’

‘কোন রকমটা চাই আপনার?’ মন্দার বোস হেসে বললেন, ‘এক ক্যানিবলের হাঁড়িতে সেন্দ হওয়াটাই বাদ ছিল, বাকি প্রায় সব রকমই হয়েছে।’

মুকুল যে কখন বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে তা টেরই পাইনি। এখন দেখলাম সে চুপচাপ একথারে দাঁড়িয়ে বাগানের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

এবার ডষ্টের হাজিরাও তৈরি হয়ে বেরিয়ে এলেন। তাঁর এক কাঁধে একটা ফ্লাস্ক, আরেকটায় একটা বাইনোকুলার, আর গলায় ঝুলছে একটা ক্যামেরা। বললেন, ‘প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টার পথ। আপনাদের ফ্লাস্ক থাকলে সঙ্গে নিয়ে নেবেন। পথে কী পাওয়া যাবে ঠিক নেই। আমি হোটেলে বলে দিয়েছি—চারটে প্যাক্ট লাঙ্গ দিয়ে দেবে।’

মন্দার বোস বললেন, ‘কোথায় চললেন আপনারা সব?’

বিকানিরের কথা শুনে ভদ্রলোক মেতে উঠলেন—

‘যাওয়াই যদি হয় তাহলে সব এক সঙ্গে গেলেই হয়।’

‘দি আইডিয়া!’ বললেন জটায়ু।

ডষ্টের হাজিরা একটু কাচুমাচু ভাব করে বললেন, ‘সবসুন্দ তাহলে ক'জন যাচ্ছ আমরা?’

মন্দার বোস বললেন, ‘এক গাড়িতে সবাই যাবার প্রয়োজন ওঠে না। আই উইল অ্যারেঞ্জ ফর অ্যানাদার ট্যাক্সি। আমার সঙ্গে মিস্টার মাহেশ্বরীও যাবেন বোধহয়।’

‘আপনি যাবেন কি?’ লালমোহনবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন ডষ্টের হাজিরা।

‘গেলে শেয়ারে যাবো। কারুর ক্ষক্ষে চাপতে রাজী নই। আপনারা চারজন একটাতে যান। আমি মিস্টার প্লোব-ট্র্যাটারের সঙ্গে আছি।’

বুঝলাম, ভদ্রলোক মন্দারবাবুর কাছ থেকে গল্প শুনে ওর প্লটের স্টক বাঢ়াতে চাচ্ছেন। অলরেডি উনি কম করে পঁচিশখানা অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস লিখেছেন। ভালোই হল; এক গাড়িতে পাঁচজন হলে একটু বেশি ঠাসাঠাসি হত। মন্দারবাবু ম্যানেজারকে বলে আরেকটা ট্যাক্সির বন্দোবস্ত করে ফেললেন। লালমোহনবাবু নিউ বষে লজে তৈরি হতে চলে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, ‘আমাকে কাইন্ডলি পিক আপ করে নেবেন। আমি হাফ অ্যান আওয়ারের মধ্যে রেডি হয়ে থাকছি।’

আগেই বলে রাখি—বিকানিরের কেল্লাও মুকুল একবার দেখেই বাতিল করে দিয়েছিল। কিন্তু সেটাই আজকের দিনের আসল ঘটনা নয়। আসল ঘটনা ঘটল দেবীকুণ্ডে, আর সেটা থেকেই বুঝতে পারলাম যে, আমরা সত্ত্বাই দুর্ধর্ষ দুশ্মনের পাল্লায় পড়েছি।

বিকানির যাবার পথে বিশেষ কিছু ঘটেনি, কেবল মাইল ঘাটেক যাবার পর একটা বেদের দলকে দেখতে পেলাম রাস্তার ধারে সংসার পেতে বসেছে। মুকুল গাড়ি থামাতে বলে তাদের মধ্যে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে এসে বলল যে, তাদের চেনে।

এৰপৱে ফেলুদাৰ সঙ্গে ডষ্টৰ হাজৱাৰ কিছু কথাবাৰ্তা হয়েছিল মুকুলকে নিয়ে, সেটা এখানে বলে রাখি। এইসব কথা মুকুল ড্ৰাইভারেৰ পাশে বসে শুনতে পেয়েছিল কিনা জানি না; কিন্তু পেলেও তাৰ হাবভাৱে সেটা কিছুই বোৰা যায়নি।

ফেলুদা বলল, ‘আছা ডষ্টৰ হাজৱা, মুকুল তাৰ পূৰ্বজন্মেৰ কী কী ঘটনা বা জিনিসেৰ কথা বলে সেটা একবাৰ বলবেন?’

হাজৱা বললেন, ‘যে জিনিসটাৰ কথা বাবাৰই বলে সেটা হচ্ছে সোনাৰ কেল্লা। সেই কেল্লাৰ কাছেই নাকি ওৱা বাড়ি ছিল। সেই বাড়িৰ মেঝেৰ তলায় নাকি ধনৱত্ত পৌঁতা ছিল। যেৱকমভাৱে বলে তাতে মনে হয় যে এই ধনৱত্ত লুকিয়ে রাখাৰ ব্যাপারটা ওৱা সামনেই ঘটেছিল। এ ছাড়া যুদ্ধেৰ কথা বলে। বলে, অনেক হাতি, অনেক ঘোড়া, সেপাই, কামান, ভীষণ শব্দ, ভীষণ চীৎকাৰ। আৱ বলে উটোৰ কথা। উটোৰ পিঠে সে চড়েছে। আৱ ময়ুৰ। ময়ুৰে নাকি ওৱা হাতে ঠোকৰ মেঝেছিল। রক্ত বাবা কৰে দিয়েছিল। আৱ বলে বালিৰ কথা। বালি দেখলেই কীৱকম চঞ্চল হয়ে উঠেছে সেটা লক্ষ কৰেননি?’

বিকানিৰ পৌছলাম পৌনে বাবোটায়। শহৱেৰ পৌছবাৰ কিছু আগে থেকেই রাস্তা ক্ৰমে ঢঢ়াই উঠেছে; এই ঢঢ়াইয়েৰ উপৱেই পাঁচিল দিয়ে যেৱা শহৱ। আৱ শহৱেৰ মধ্যে সবচেয়ে চোখে পড়াৰ মতো জিনিস হচ্ছে লালচে রঙেৰ পাথৱেৰ তৈৱি প্ৰকাণ্ড দুৰ্গ।

আমাদেৱ গাড়ি একেবাৱে সোজা দুৰ্গেৰ দিকে নিয়ে যাওয়া হল। লক্ষ কৰলাম, যতই কাছে যাচ্ছি ততই যেন দুগটাকে আৱো বড় বলে মনে হচ্ছে। বাবা ঠিকই বলেছিলেন। রাজপুতৰা যে দাকুণ শক্তিশালী জাত ছিল সেটা তাদেৱ দুৰ্গেৰ চেহাৰা দেখলেই বোৰা যায়।

দুৰ্গেৰ গেটেৰ সামনে গিয়ে ট্যাঙ্কি থামাৰ সঙ্গে সঙ্গেই মুকুল বলে উঠল, ‘এখানে কেন থামলে?’

ডষ্টৰ হাজৱা বললেন ‘কেল্লাটা কি চিনতে পাৰছ মুকুল?’

মুকুল গন্তীৰ গলায় বলল, ‘না। এটা বিচ্ছিৰি কেল্লা। এটা সোনাৰ কেল্লা না।’

আমৱা সবাই গাড়ি থেকে নেমে বাইৱে দাঁড়িয়েছিলাম। মুকুলেৰ কথাটা শেষ হবাৰ সঙ্গে সঙ্গেই কোথেকে জানি একটা কৰ্কশ আওয়াজ শোনা গেল আৱ তৎক্ষণাৎ মুকুল দৌড়ে এসে ডষ্টৰ হাজৱাকে দু হাতে জড়িয়ে ধৰল। আওয়াজটা এল কেল্লাৰ উল্টোদিকেৰ পাৰ্কটা থেকে।

ফেলুদা বলল, ‘ময়ুৰেৰ ডাক। এৱকম আগেও হয়েছে কি?’

ডষ্টৰ হাজৱা মুকুলেৰ মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, ‘কাল

যোধপুৱেই হয়েছিল। হি কাট স্ট্যান্ড পীকক্স।’

মুকুল দেখলাম ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। সে আবাৰ সেই গন্তীৰ অথচ মিটি গলায় বলল, ‘এখানে থাকব না।’

ডষ্টৰ হাজৱা ফেলুদাকে উদ্দেশ কৰে বললেন, ‘আমি বৱং গাড়িটা নিয়ে এখানকাৰ সাৰ্কিট হাউসে গিয়ে অপেক্ষা কৰছি। আপনাৰা অ্যান্দুৰ এসেছেন, একটু ঘুৱেটুৱে দেখে নিন। আমি গিয়ে গাড়িটা ফেরত পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনাদেৱ দেখা হলে সাৰ্কিট হাউসে চলে আসবেন। তবে দুটোৰ বেশি দেৱি কৰবেন না কিন্তু, তাহলে ওদিকে ফিৱতে রাত হয়ে যাবে।’

ডষ্টৰ হাজৱাৰ উদ্দেশ্য সফল হয়নি ঠিকই কিন্তু আমাৰ তাতে বিশেষ দৃঢ়খ নেই। এই প্ৰথম একটা রাজপুত কেল্লাৰ ভিতৰটা দেখতে পাৰ ভেবেই আমাৰ গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল।

কেল্লাৰ গেটেৰ দিকে যখন এগোছিছ তখন ফেলুদা আচমকা থমকে দাঁড়িয়ে আমাৰ কাঁধে একটা চাপ দিয়ে বলল, ‘দেখলি?’

বললাম, ‘কী জিনিস?’

‘সেই লোকটা।’

বুৰুলাম ফেলুদা সেই লাল জামা পৱা লোকটাৰ কথা বলছে। কিন্তু ও যেদিকে তাকিয়ে রয়েছে সেদিকে কোনো লাল জামা দেখতে পেলাম না। অবিশ্বি লোকজন অনেক রয়েছে, কাৰণ কেল্লাৰ গেটেৰ বাইৱেটা একটা ছোটখাটো বাজাৰ। বললাম, ‘কোথায় লোকটা?’

‘ইডিয়ট। তুই বুঝি লাল জামা খুঁজছিস?’

‘তবে কোনো লোকেৰ কথা বলছ তুমি?’

‘তোৱ মতো বোকসন্দৰ দুনিয়ায় নেই। তুই শুধু জামাই দেখেছিস, আৱ কিছুই দেখিসনি। ইট ওয়াজ দ্য সেম ম্যান, চাদৰ দিয়ে নাক অবধি ঢাকা। কেবল আজ পৱেছিল নীল জামা। আমৱা যখন বেদেদেৱ দেখতে নেমেছিলাম, সেই সময় একটা ট্যাঙ্কি যেতে দেখি বিকানিৰেৰ দিকে। তাতে দেখেছিলাম এই নীল জামা।’

‘কিন্তু এখানে কী কৰছে লোকটা?’

‘সেটা জানলে তো অৰ্ধেক বাজি মাত হয়ে যেত।’

লোকটা উধাও। মনে একটা উত্তেজনাৰ ভাৱ নিয়ে কেল্লাৰ বিশাল ফটক দিয়ে ভিতৰে ঢুকলাম। ঢুকেই একটা বিৱাট চাতাল, সেটাৰ ডানদিকে বুকেৰ হাতি ফুলিয়ে কেল্লাটা দাঁড়িয়ে আছে। দেয়ালেৰ খোপৱে খোপৱে পায়ৱাৰ বাসা। বিকানিৰ নাকি হাজাৰ বছৰ আগে একটা সমৃদ্ধ শহৱ ছিল, যেটা বহুকাল হল বালিৰ তলায় তলিয়ে গেছে। ফেলুদা বলল যে, কেল্লাটা চাৰশো বছৰ আগে রাজা রায় সিং প্ৰথম তৈৱি কৰতে শুৰু কৰেন। ইনি নাকি আকবৱেৱ একজন

বিখ্যাত সেনাপতি ছিলেন।

আমার মনের ভিতৰটা কিছুক্ষণ থেকে খচখচ করছে একটা কথা ভেবে। লালমোহনবাবু এখনো এলেন না কেন? তাদের কি তাহলে রওনা হতে দেরি হয়েছে? নাকি রাস্তায় গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে? যাক গে। ওদের কথা ভেবে আশ্চর্য ঐতিহাসিক জিনিস দেখাব আনন্দ নষ্ট করব না।

যে জিনিসটা সবচেয়ে অন্তুত লাগল সেটা হল কেল্লার অস্ত্রাগার। এখানে যে শুধু অন্তর্হই রয়েছে তা নয়, আশ্চর্য সুন্দর একটা রূপের সিংহাসনও রয়েছে, যার নাম আলম আস্বালি। এটা নাকি মোগল বাদশাহদের উপহার। এ ছাড়া রয়েছে যুদ্ধের বর্ম শিরস্ত্রাণ ঢাল তলোয়ার বল্লম ছোরা আৰ আৱো কত কী! এক একটা যুদ্ধের এত বিৱাট আৰ এত তাগড়াই যে দেখলে বিশ্বাসই হয় না সেগুলো তলোয়ার এত বিৱাট আৰ এত তাগড়াই যে দেখলে বিশ্বাসই হয় না সেগুলো মানুষে হাতে নিয়ে চালাতে পাৰে। এগুলো দেখে জটায়ুৰ কথা যেই মনে পড়েছে, অমনি দেখি আমার টেলিপ্যাথির জোৱে ভদ্রলোক হাজিৰ। বিৱাট কেল্লার বিৱাট ঘৰেৰ বিৱাট দৰজার সামনে তাকে আৱো খুন্দে আৰ আৱো হাস্যকৰ মনে হচ্ছে।

লালমোহনবাবু আমাদের দেখতে পেয়ে এক গাল হেসে চারদিকে চেয়ে শুধু বললেন, ‘রাজপুতৰা কি জায়েন্ট ছিল নাকি মশাই। এ জিনিস তো মানুষের হাতে ব্যবহার কৰাৰ জিনিস নয়।’

যা ভেবেছিলাম তাই। সন্তু কিলোমিটাৰেৰ মাথায় ওদেৰ ট্যাঙ্কিৰ একটা টায়াৰ পাংচার হয়। ফেলুদা বলল, ‘আপনাৰ সঙ্গে আৱ দু'জন কোথায়?’

‘ওৱা বাজারে কী সব কিনতে লেগোছে। আমি আৰ থাকতে না পেৱে চুকে পড়লুম।’

আমরা ফুল মহল, গজ মন্দিৰ, শীশ মহল আৰ গঙ্গা নিবাস দেখে যখন চিনি বুজে পোঁছেছি, তখন মন্দিৰ বোস আৰ মিস্টাৰ মাহেশ্বৰীৰ সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তাঁদেৰ হাতে খবৰেৰ কাগজেৰ মোড়ক দেখে বুঝলাম তাঁৰা কেনাকাটা কৰেছেন। মন্দিৰ বোস বললেন, ‘ইউৱোপে মধ্যযুগেৰ দুগুটিৰ্গণ্ডুলোতে যে অন্ত দেখেছি, আৱ এখনোও যা দেখলাম, তাতে একটা জিনিসই প্ৰমাণ কৰে: মানুষ জাতটা দিনে দিনে দুৰ্বল হয়ে আসছে, আৱ আমার বিশ্বাস সেই সঙ্গে তাৱা আয়তনেও ছোট হয়ে আসছে।’

‘এই আমার মতো বলছেন?’ লালমোহনবাবু হেসে বললেন।

‘হাঁ। ঠিক আপনারই মতো’, মন্দিৰ বোস বললেন, ‘আমার বিশ্বাস আপনাৰ ডাইমেনশনেৰ লোক মোড়শ শতাব্দীৰ রাজস্থানে একটিও ছিল না। ওহো—বাই দ্য ওয়ে—’ মন্দিৰবাবু ফেলুদাৰ দিকে ফিরলেন, ‘আপনাৰ জন্য এইটে এসে পড়েছিল সার্কিট হাউসে রিসেপশন ডেক্সে।’

ভদ্রলোক পকেট থেকে একটা খাম বার কৰে ফেলুদাকে দিলেন। তাতে

সোনার কেল্লা

টিকিট নেই। বোঝাই যায় কোনো স্থানীয় লোক সেটা দিয়ে গেছে।

ফেলুদা চিঠি খুলতে খুলতে বলল, ‘আপনাকে কে দিল?’

‘আমৰা যখন বেৱোছি, তখন বাগৱি বলে যে ছোকৰটা রিসেপশনে বসে, সেই দিল। বললে কে কখন রেখে গেছে জানে না।’

ফেলুদা ‘এক্সকিউজ মি’ বলে চিঠিটা পড়ে আবাৰ খামে পুৱে পকেটে রেখে দিল। তাতে কী লেখা আছে কিছুই বুঝতে পাৱলাম না, জিঞ্জেসও কৰতে পাৱলাম না।

আৱো আধৰটা ঘোৱাৰ পৰ ফেলুদা ঘড়ি দেখে বলল, ‘এবাৰ সার্কিট হাউসে যেতে হয়।’ কেল্লাটা ছেড়ে যেতে ইচ্ছে কৰছিল না, কিন্তু উপায় নেই।

কেল্লার বাইৱে দুটো ট্যাঙ্কিই দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঠিক হল যে এবাৰ আমৰা একই সঙ্গে ফিরব। যখন ট্যাঙ্কিতে উঠছি, তখন ড্রাইভাৰ বলল উষ্টুৰ হাজৰারা নাকি সার্কিট হাউসে যাননি। ইয়ো যো লেড়কা থা—ও নাকি বলেছে সার্কিট হাউসে যাবে না।

‘তবে কোথায় গেছে ওৱা?’ ফেলুদা জিঞ্জেস কৰল।

তাতে ড্রাইভাৰ বলল, ‘ওৱা গেছে দেৰীকুণ্ডে। সেটা আবাৰ কী জায়গা? ফেলুদা বলল, ওখানে নাকি রাজপুত যোদ্ধাদেৰ স্মৃতিস্তম্ভ আছে।

পাঁচ মাইল পথ, যেতে লাগল দশ মিনিট। জায়গাটা সত্যই সুন্দৰ, আৱ তেমনি সুন্দৰ স্মৃতিস্তম্ভগুলো। পাথৱেৰ বেদীৰ উপৰ পাথৱেৰ থাম, তাৰ উপৰ পাথৱেৰ ছাউনি, আৱ মাথা থেকে পা অবধি সুন্দৰ কাৰুকাৰ্য। এই রকম স্মৃতিস্তম্ভ চারদিকে ছড়ানো রয়েছে কমপক্ষে পঞ্চাশটা। সমস্ত জায়গাটা গাছপালায় ভৰ্তি, সেই সব গাছে টিয়াৰ দল জটলা কৰছে, এ-গাছ থেকে ও-গাছ ফুৰুত ফুৰুত কৰে উড়ে বেড়াছে আৱ টাঁ টাঁ কৰে ডাকছে। এত টিয়া একসঙ্গে আমি কখনো দেখিনি।

কিন্তু উষ্টুৰ হাজৰা কোথায়? আৱ কোথায়ই বা মুকুল?

লালমোহনবাবুৰ দিকে চেয়ে দেখি উনি উসখুস কৰছেন। বললেন, ‘ভেৱি সাস্পিশাস আ্যান্ড মিস্টিৱিয়াস।’

‘উষ্টুৰ হাজৰা!’ মন্দিৰ বোস হঠাৎ এক হাঁক দিয়ে উঠলেন। তাঁৰ ভাৱী গলার চীৎকাৰে এক বাঁক টিয়া উড়ে পালাল, কিন্তু ডাকেৰ কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

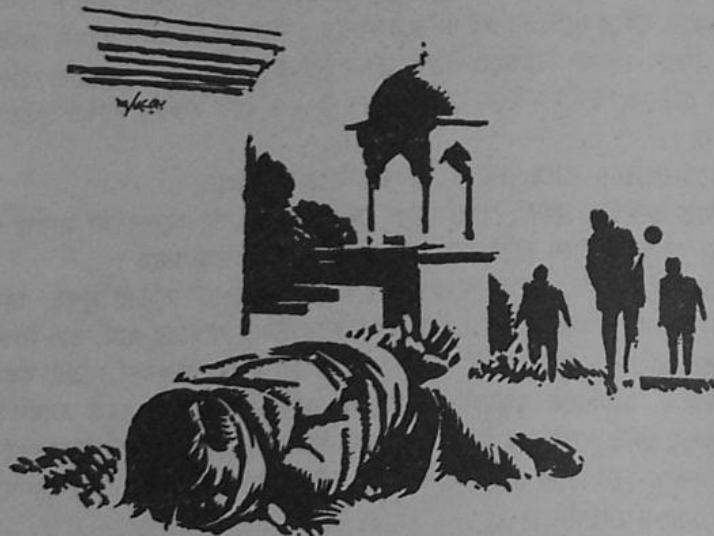
আমৰা ক'জনে খুঁজতে আৱস্থ কৰে দিলাম। স্মৃতিস্তম্ভে স্মৃতিস্তম্ভে জায়গাটা প্ৰায় একটা গোলকধৰ্মীৰ মতো হয়ে রয়েছে। তাৰই মধ্যে ঘূৰতে ঘূৰতে ফেলুদাকে দেখলাম ঘাস থেকে দেশলাইয়েৰ বাঞ্ছ কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে পুৱল।

শেষকালে কিন্তু লালমোহনবাবুই আবিক্ষাৰ কৰলেন উষ্টুৰ হাজৰাকে। তাঁৰ

সোনার কেল্লা

চীৎকার শুনে আমরা দৌড়ে গিয়ে দেখি, একটা আমগাছের ছায়ায় শেওলাধরা বেদীর সামনে মুখ আর হাত পিছন দিকে বাঁধা অবস্থায় মাটিতে কুকড়ে পড়ে আছেন ডষ্টের হাজরা। তাঁর মুখ দিয়ে একটা অন্তুত অসহায় গৌঁ গৌঁ শব্দ বেরোচ্ছে।

ফেলুদা হমড়ি খেয়ে ভদ্রলোকের উপর পড়ে তাঁর হাতের বাঁধন আর মুখের গ্যাগ খুলে দিল। দেখেই মনে হল যেটা দিয়ে বাঁধা হয়েছে সেটা একটা পাগড়ি থেকে ছেঁড়া কাপড়।



মন্দার বোস বললেন, 'ব্যাপার কী মশাই, এমন দশা হল কী করে ?'

সৌভাগ্যক্রমে ডষ্টের হাজরা জখম হননি। তিনি মাটিতে ঘাসের উপরে বসে কিছুক্ষণ হাঁপালেন। তারপর বললেন, 'মুকুল বলল, সাকিঁট হাউসে যাবে না। অগত্যা গাড়ি করে ঘুরতে লাগলাম। এখানে এসে তার জায়গাটা ভালো লেগে গেল। বলল—এগুলো ছত্রী। এগুলো আমি জানি। আমি নেবে দেখব।—নামলাম। ও এদিক ওদিক ঘুরছিল, আমি একটু গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়েছিলাম। এমন সময় পেছন থেকে আক্রমণ। হাত দিয়ে মুখটা চেপে মাটিতে উপুড় করে ফেলে হাঁচুটা দিয়ে মাথাটা চেপে রেখে হাত দুটো পিছনে বেঁধে ফেলল। তারপর মুখে ব্যান্ডেজ।'

সোনার কেল্লা

'মুকুল কোথায় ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল। তার গলার ওপরে উৎকষ্ট। 'জানি না। একটা গাড়ির আওয়াজ পেয়েছিলাম বটে আমাকে বাঁধবার কিছুক্ষণ পরেই।'

'লোকটার চেহারাটা দেখেননি ?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।
ডষ্টের হাজরা মাথা নাড়লেন। 'তবে স্ট্রাগ্ল-এর সময় তার পোশাকের একটা আন্দাজ পেয়েছিলাম। স্থানীয় লোকের পোশাক। প্যান্ট-সার্ট নয়।'

'দেয়ার হি ইজ !' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন মন্দার বোস।

অবাক হয়ে দেখলাম, একটা ছত্রীর পাশ থেকে মুকুল আপনমনে একটা ঘাস চিবোতে চিবোতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। ডষ্টের হাজরা একটা হাঁপ ছাড়ার শব্দ করে 'থ্যাক গড' বলে মুকুলের দিকে এগিয়ে গেল।

'কোথায় গিয়েছিলে মুকুল ?'

কোনো উত্তর নেই।

'কোথায় ছিলে তুমি এতক্ষণ ?'

'ওইটার পিছনে !' মুকুল আঙুল দিয়ে একটা ছত্রীর দিকে দেখাল।

'ওরকম বাড়ি আমি দেখেছি।'

ফেলুদা বলল, 'যে লোকটা এসেছিল তাকে তুমি দেখেছিলে ?'

'কোন লোকটা ?'

ডষ্টের হাজরা বললেন, 'ওর দেখার কথা নয়। এখানে এসেই ও দৌড়ে এক্সপ্রেস করতে চলে গেছে। বিকানির এসে এরকম যে একটা কিছু ঘটতে পারে সেটাও ভাবিনি, তাই আমিও ওর জন্য চিন্তা করিনি।'

তা সঙ্গেও ফেলুদা আবার প্রশ্ন করল, 'তুমি দেখনি লোকটাকে—যে ডষ্টের হাজরার হাত-মুখ বাঁধল ?'

'আমি সোনার কেল্লা দেখব।'

বুঝলাম মুকুলকে কোনো প্রশ্ন করা বৃথা।

ফেলুদা হঠাৎ বলল, 'আর টাইম ওয়েস্ট করে লাভ নেই। একদিক দিয়ে ভালোইয়ে মুকুল আপনার সঙ্গে বা আপনার কাছাকাছি ছিল না। থাকলে হয়ত তাকে নিয়েই উধাও হত লোকটা। যদি সে লোক যোধপুর ফিরে গিয়ে থাকে তাহলে যথেষ্ট স্পীডে গাড়ি চালালে হয়ত এখনো তাকে ধরা যাবে।'

'দু' মিনিটের মধ্যে আমরা গাড়িতে উঠে রওনা হয়ে গেলাম। লালমোহনবাবু এবার আমাদের সঙ্গে এলেন। বললেন, 'ও লোকগুলো বড় ড্রিঙ্ক করে। আমার আবার মদের গন্ধ সহ্য হয় না।'

পাঞ্জাবী ড্রাইভার হরমিত সিং ষাট মাইল পর্যন্ত স্পীড তুলল গাড়িতে। এক জায়গায় রাস্তার মাঝাখানে একটা ঘৃঘৃ বসেছিল, সেটা উড়ে পালাতে গিয়ে

সেরা সত্যজিৎ

আমাদের গাড়ির উইন্ডোফ্রনে ধাক্কা খেয়ে মরে গেল। আমি আর মুকুল সামনে বসেছিলাম। একবার পিছন ফিরে দেখলাম, লালমোহনবাবু ফেলুদা আর ডষ্টের হাজরার মাঝখানে কুকড়ে ঢোক বন্ধ করে বসে আছেন। তাঁর মুখ ফ্যাকাশে হলেও টেঁটের কোণে একটা হাসি দেখে বুঝলাম, তিনি আডভেঞ্চারের গন্ধ পেয়েছেন; হয়ত তাঁর সামনের গল্লের প্রটও মাথায় এসে গেছে।

শ'খানেক মাইল আসার পর বুবতে পারলাম যে, শয়তানের গাড়ি ধরতে পারার কোনো সন্তান নেই। সে গাড়িটাও যে নতুন নয়, আর তাতেও যে স্পীড ওঠে না, একথা ভাবলে চলবে কেন!

যোধপুর যখন পৌঁছলাম, তখন শহরের বাতি জলে উঠেছে। ফেলুদা বলল, 'লালমোহনবাবু, আপনাকে নিউ বোম্বে লজে নামিয়ে দেব তো ?'

ভদ্রলোক মিহি গলায় বললেন, 'তা তো বটেই—আমার জিনিসপত্র তো সব সেখানেই রয়েছে; কিন্তু ভাবছিলুম খাওয়াদাওয়া করে যদি আপনাদের ওখানে...মানে...'

'বেশ তো', ফেলুদা আশ্বাসের সুরে বলল, 'জিঞ্জেস করে দেখব, সার্কিট হাউসে ঘর খালি আছে কিনা। আপনি বরং নটা নাগাদ একটা টেলিফোন করে জেনে নেবেন।'

আমি ভাবছি আজকের ঘটনার কথা। শক্ত লোকের পাল্লায় পড়েছি আমরা, সে কথা বেশ বুবতে পারছি। এ লোকই কি সেই লাল জামা পরা লোক? যে আজ বিকানির গিয়েছিল নীল জামা পরে? জানি না। এখন পর্যন্ত কিছুই বুবতে পারছি না। আমার মনে হয় ফেলুদাও পারছে না। যদি পারত তাহলে ওর মুখের ভাবই অন্য রকম হয়ে যেতো। অ্যাদিন ওর সঙ্গে থেকে আর ওর তদন্তের কায়দাটা দেখে আমি এটা খুব ভালো করেই জেনেছি।

সার্কিট হাউসে পৌঁছে যে যার ঘরের দিকে গেলাম। তিনি নম্বরে ঢেকার আগে ফেলুদা ডষ্টের হাজরাকে বলল, 'কিছু মনে করবেন না, আমি এই কাপড়টা আমার কাছে রাখছি।' ডষ্টের হাজরাকে যে কাপড়টা দিয়ে বাঁধা হয়েছিল সেটা ফেলুদা সঙ্গে নিয়ে নিয়েছিল।

হাজরা বললেন, 'স্বচ্ছন্দে!' তারপর ফেলুদার দিকে এগিয়ে এসে গলা নামিয়ে বললেন, 'বুবতেই তো পারছেন প্রদোষবাবু, ব্যাপার গুরুতর। যেটা আশঙ্কা করা গিয়েছিল, সেটাই হতে চলেছে। আমি কিন্তু এতটা গোলমাল হবে সেটা অনুমান করিনি।'

ফেলুদা বলল, 'আপনি ভাবছেন কেন? আমি তো রয়েছি। আপনি নির্ভয়ে নিজের কাজ চালিয়ে যান। আমার বিশ্বাস, আপনি যদি আজ দেবীকুণ্ডে না গিয়ে সার্কিট হাউসে যেতেন তাহলে আপনাকে এতটা নাজেহাল হতে হত না।

সোনার কেলা

অবিশ্য মুকুলকে যে কিডন্যাপ করতে পারেনি লোকটা এটাই ভাগ্য। এবার থেকে আমাদের কাছাকাছি থাকবেন, তাহলে দুর্যোগের ভয়টা অনেক কমবে।'

ডষ্টের হাজরার মুখ থেকে দুশ্চিন্তার ভাবটা গেল না। বললেন, 'আমি কিন্তু আমার নিজের জন্য ভাবছি না। বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার ব্যাপারে অনেক রিস্ক নিতে হয়। ভাবছি আপনাদের দুজনের জন্য। আপনারা তো একেবারে বাইরের লোক।'

ফেলুদা একটু হেসে বলল, 'ধরে নিন আমিও একজন বৈজ্ঞানিক, আমিও গবেষণা করছি, আর সেই কারণে আমিও রিস্ক নিছি।'

মুকুল এতক্ষণ বারান্দার এ-মাথা থেকে ও-মাথা পায়চারি করছিল, ডষ্টের হাজরা এবার তাকে ডেকে নিয়ে আমাদের গুড নাইট জানিয়ে অন্যমনস্কভাবে তাঁর ঘরে চলে গেলেন। আমরাও আমাদের ঘরে চুকলাম। বেয়ারাকে ডেকে ঠাণ্ডা কোকাকোলা আনতে বলে ফেলুদা সোফায় বসে পকেট থেকে সিগারেট আর লাইটার বার করে চিন্তিতভাবে সেগুলোকে টেবিলের উপর রাখল। তারপর অন্য পকেট থেকে বের করল একটা দেশলাই—যেটা দেবীকুণ্ডে কুড়িয়ে পেয়েছিল। টেক্কা-মার্কা দেশলাই। বাস্তু খালি। সেটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'এই যে রেলে আসতে এতগুলো স্টেশনে এতগুলো পান-সিগারেটওয়ালাকে দেখলি, তাদের কারুর কাছে টেক্কা দেশলাই ছিল কিনা লক্ষ করেছিলি?'

আমি সত্তি কথাটা বললাম। 'না ফেলুদা, লক্ষ করিনি।'

ফেলুদা বলল, 'পশ্চিম অঞ্চলের কোনো দোকানে টেক্কা দেশলাই থাকার কথা নয়। রাজস্থানে টেক্কা বিক্রি হয় না। এ দেশলাই রাজস্থানের বাইরে থেকে আনা।'

'তার মানে এটা সেই লাল জামা পরা লোকটার নয়?'

'তোর প্রশ্নটা খুবই কাঁচা হল। প্রথমত রাজস্থানী পোশাক পরলেই একটা লোক রাজস্থানী হয় না। ওটা যে-কেউ পরতে পারে। আর দ্বিতীয়ত, ওই লোক ছাড়াও আরো অনেকেই আজ দেবীকুণ্ডে গিয়ে কুকীতিটা করার সুযোগ পেয়েছে।'

'তা তো বটেই! কিন্তু তাদের তো কাউকেই আমরা চিনি না, কাজেই ও নিয়ে ভেবে কী লাভ?'

'এটাও খুব কাঁচা কথা হল। মাথা খাটাতে শিখলি না এখনো তুই। লালমোহন, মন্দার বোস এবং মাহেশ্বরী—এরা কত দেরীতে কেল্লায় পৌঁছেছে সেটা ভেবে দ্যাখ। আর তারপর ভেবে দ্যাখ—'

'বুঝেছি, বুঝেছি!'

সত্তিই তো! এটা তো আমার মাথাতেই আসেনি ওদের আসতে প্রায়

ପିୟତାଲିଶ ମିନିଟ ଦେଇ ହେଲିଲ । ଲାଲମୋହନବାବୁ ବଲଲେନ, ଗାଡ଼ିର ଟାଯାର ପାଂଚାର ହେଲିଲ । ସଦି ନା ହେଯେ ଥାକେ ? ସଦି ତିନି ମିଥ୍ୟେ କଥା ବଲେ ଥାକେନ ? କିନ୍ବା ସେଟା ସଦି ସତି ହେଯେ ଥାକେ, ଆର ଲାଲମୋହନବାବୁ ସଦି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଯେ ଥାକେନ, ମନ୍ଦାର ବୋସ ଆର ମାହେଶ୍ଵରୀ ତୋ ବାଜାର ନା କରେ ଦେବୀକୁଣ୍ଡେ ଗିଯେ ଥାକତେ ପାରେନ ।

ଫେଲୁଦା ଏବାର ଏକଟା ଦୀଘନିଶ୍ଵାସ ଫେଲେ ପକେଟ ଥେକେ ଆରେକଟା ଜିନିସ ବାର କରଲ । ସେଟା ଦେଖେଇ ହଠାତ୍ ବୁକ୍ଟା ଧରାନ କରେ ଉଠିଲ । ଏଟାର କଥା ଏତକଣ ମନେଇ ଛିଲ ନା । ଏଟା ସେଇ ମନ୍ଦାର ବୋସରେ ଦେଓୟା ଚିଠିଟା ।

‘ଓଟା କାର ଚିଠି ଫେଲୁଦା ?’ କାଁପା ଗଲାଯ ଜିଜ୍ଞେସ କରଲାମ ଆମି ।

‘ଜାନି ନା’, ବଲେ ଫେଲୁଦା ଚିଠିଟା ଆମାର ଦିକେ ଏଗିଯେ ଦିଲ । ହାତେ ନିଯେ ଦେଖି ସେଟା ଇଂରିଜିତେ ଲେଖା ଚିଠି । ମାତ୍ର ଏକଟା ଲାଇନ—ବଡ଼ ହାତେର ଅକ୍ଷରେ ଡଟ ପେନ ଦିଯେ ଲେଖି—

‘ଇଫ ଇଟ୍ ଭାଲୁ ଇଯୋର ଲାଇଫ—ଗୋ ବ୍ୟାକ ଟୁ କ୍ୟାଲକଟା ଇମିଡ଼ିଯେଟଲି ।’

ଅର୍ଥାତ୍ ତୋମାର ଜୀବନେର ପ୍ରତି ସଦି ତୋମାର ମାୟା ଥାକେ, ତାହାଲେ ଏକ୍ଷୁନି କଳକାତାଯ ଫିରେ ଯାଓ ।

ଆମାର ହାତେ ଚିଠିଟା କାଁପିତେ ଲାଗଲ । ଆମି ଚଟ କରେ ସେଟା ଟେବିଲେର ଉପର ରେଖେ ହାତ ଦୁଟୋକେ କୋଲେର ଉପର ଜଡ଼ୋ କରେ ନିଜେକେ ସେତି କରାର ଚେଷ୍ଟା କରଲାମ ।

‘କୀ କରବେ ଫେଲୁଦା ?’

ସିଲିଂ-ଏର ଘୁରସ୍ତ ପାଖଟାର ଦିକ୍ ଥେକେ ଦୃଢ଼ି ନା ସରିଯେ ଫେଲୁଦା ଥାଯ ଆପନ ମନେଇ ବଲଲ, ‘ମାକ୍ଡୋସାର ଜାଲ...ଜିଯୋମେଟ୍ରି....’ ଏଥନ ଅନ୍ଧକାର...ଦେଖା ଯାଛେ ନା...ରୋଦ ଉଠିଲେ ଜାଲେ ଆଲୋ ପଡ଼ିବେ—ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରବେ...ତଥନ ଧରା ପଡ଼ିବେ ଜାଲେର ନକଶା !...ଏଥନ ଶୁଦ୍ଧ ଆଲୋର ଅପେକ୍ଷା...’

॥ ୭ ॥

କାଲ ମାଘରାତିରେ ସୁମ ଭେଙେ ଗିଯେଛିଲ ଏକବାର, ତଥନ ସମୟ କଟା ଜାନି ନା, ଦେଖଲାମ ଫେଲୁଦା ବେଡ-ସାଇଡ ଲ୍ୟାମ୍ପଟା ଜ୍ବାଲିଯେ ତାର ନୀଳ ଖାତାଯ କୀ ଜାନି ଲିଖିଛେ । ଓ କତ ରାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଜ କରେଛିଲ ଜାନି ନା । କିନ୍ତୁ ସକାଳ ସାଡେ ଛଟାଯ ଉଠେ ଦେଖଲାମ, ଓ ତାର ଆଗେଇ ଉଠେ ଦାଢ଼ିଟାଡ଼ି କାମିଯେ ରେଡ଼ି । ଓ ବଲେ, ମାନୁଷେର ବ୍ରେନ ଯଥନ ଖୁବ ବେଶି କାଜ କରେ, ତଥନ ସୁମ ଆପନା ଥେକେଇ କମେ ଯାଯ ; କିନ୍ତୁ ତାତେ ନାକି ଶରୀର ଖାରାପ ହେଯ ନା । ଅନ୍ତରେ ଓର ତୋ ତାଇ ଧାରଣା, ଆର ଓର ଶରୀର ଗତ ଦଶ ବହରେ ଏକଦିନେର ଜଣ୍ଯେ ଖାରାପ ହେଯିଛେ ବଲେ ତୋ ମନେ ପଡ଼େ ନା । ଆମି ଜାନତାମ ଯେ ଯୋଧପୂରେ ଏମେ ଓ ଯୋଗବ୍ୟାୟାମ ବନ୍ଧ କରେନି । ଆଜକେବେ ଜାନି ଆମାର ସୁମ ଭାଙ୍ଗାର ଆଗେଇ ଓର ସେ-କାଜଟା ସାରା ହେଯେ ଗେଛେ ।

88

ଡାଇନିଂ ରମେ ବ୍ରେକଫାସ୍ଟ ଥେତେ ଗିଯେ ସକଳେର ସଙ୍ଗେ ଦେଖା ହଲ । ଲାଲମୋହନବାବୁ କାଲ ରାତ୍ରେ ସାର୍କିଟ ହାଉସେ ଚଲେ ଏସେଛିଲେନ । ତିନି ବାରାନ୍ଦାର ପର୍ଶିମ ଅଂଶଟାତେ ମନ୍ଦାର ବୋସେର ଦୁଟୋ ଘର ପରେଇ ରହେଛେ । ଭଦ୍ରଲୋକ ଡିମେର ଅମଲେଟ ଥେତେ ଥେତେ ବଲଲେନ, ତାଁର ନାକି ଚମକ୍ତାର ଏକଟା ପ୍ଲଟ ମାଥାଯ ଏସେହେ । ଡଟ୍ଟର ହାଜରା ଏକଦମ ମୁସତ୍ତେ ପଡ଼େଛେନ ; ବଲଲେନ ଯେ ରାତ୍ରେ ନାକି ତାଁର ଭାଲୋ ସୁମ ହେଯନି । ଏକମାତ୍ର ମୁକୁଳଇ ଦେଖଲାମ ନିର୍ବିକାର ।

ମନ୍ଦାର ବୋସ ଆଜ ପ୍ରଥମ ସରାସରି ଡଟ୍ଟର ହାଜରାର ସଙ୍ଗେ କଥା ବଲଲେ—

‘କିଛୁ ମନେ କରବେନ ନା ମଶାଇ, ଆପନି ଯେ ଉପ୍ରତ୍ତ ଜିନିସ ନିଯେ ରିସାଚ କରଛେ, ତାତେ ଏ ଧରନେର ଗଣ୍ଡଗୋଲ ହବେଇ । ଯେ ଦେଶେ କୁସଂକ୍ଷାରେର ଏତ ଛଢାଛନ୍ତି, ସେ ଦେଶେ ଏସବ ଜିନିସ ବେଶି ନା ଘାଁଟାନୋଇ ଭାଲୋ । ଶେଷକାଳେ ଦେଖବେନ, ଘରେ ଘରେ ସବ କଟି ଛୋକରାର ନିଜେଦେର ଜାତିମ୍ବର ବଲେ କ୍ଲେମ କରଛେ । ତଲିଯେ ଦେଖଲେ ଦେଖବେନ, ବ୍ୟାପାରଟା ଆର କିଛୁଇ ନା, ତାଦେର ବାପେରା ଏକଟୁ ପାବଲିସିଟି ଚାଇଛେ, ବ୍ୟସ । ତଥନ ଆପନି ଠ୍ୟାଲା ସାମଲାବେନ କୀ କରେ ? କଟା ଛେଲେକେ ସଙ୍ଗେ ନିଯେ ବିଦେଶେ ବିଭୁଇୟ ଚରେ ବେଢାବେନ ?’

ଡଟ୍ଟର ହାଜରା କୋନୋ ମନ୍ତ୍ରବ୍ୟ କରଲେନ ନା । ଲାଲମୋହନବାବୁ ଏର-ଓର ମୁଖେର ଦିକ୍ ଚାଇଲେନ, କାରଣ ଜାତିମ୍ବର ବ୍ୟାପାରଟା ଉନି ଏଥିଲେ କିଛୁ ଜାନେନ ନା ।

ଫେଲୁଦା ଆଗେଇ ବଲେଛିଲ ଯେ ବ୍ରେକଫାସ୍ଟ ସେରେ ଏକଟୁ ବାଜାରେର ଦିକ୍ କାବେ । ଆମି ଜାନତାମ ସେଟା ନିଶ୍ଚୟଇ ଶୁଦ୍ଧ ଶହର ଦେଖାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେ ନଯ । ପୌନେ ଆଟାର ସମୟ ଆମରା ବେରିଯେ ପଡ଼ଲାମ । ଦୁ’ଜନ ନଯ, ତିନଜନ । ଲାଲମୋହନବାବୁ ଓ ଆମାଦେର ସଙ୍ଗ ନିଲେନ । ଆମ ଏର ମଧ୍ୟେ ଦୁ-ଏକବାର ଭଦ୍ରଲୋକକେ ଦୁଶମନ ହିସେବେ କଲନା କରାର ଚେଷ୍ଟା କରେଛିଲାମ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବାରଇ ଏତ ହାସି ପେଲ ଯେ ବାଧ୍ୟ ହେଯେ ସେଟା ମନ ଥେକେ ଦୂର କରତେ ହଲ ।

ସାର୍କିଟ ହାଉସେର ଦିକ୍ଟା ନିରିବିଲି ଆର ଖୋଲାମେଲା ହଲେଓ ଶହରଟା ଗିଜଗିଜ । ପ୍ରାୟ ସବ ଜାଯଗା ଥେକେଇ ପୂରାନୋ ପାଂଚିଲଟା ଦେଖା ଯାଯ । ସେଇ ପାଂଚିଲେର ଗାୟେ ଦୋକାନେର ସାରି, ଟାଙ୍ଗର ଲାଇନ, ଲୋକେର ଥାକବାର ବାଡ଼ି ଆର ଆରୋ କଟ କୀ । ପାଂଚଶୋ ବହର ଆଗେକାର ଶହରେ ଚିହ୍ନ ଆଜକେର ଶହରେ ସଙ୍ଗେ ମିଶେ ଏକାକାର ହେଯେ ଗେଛେ ।

ଆମରା ଏ-ଦୋକାନ ସେ-ଦୋକାନ ଦେଖତେ ଦେଖତେ ହେତେ ଚଲେଛି । ଫେଲୁଦା କିଛୁ ଏକଟା ଖୁଜିଛେ ସେଟା ବୁଝାତେ ପାରଲାମ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଯେ କୀ ସେଟା ବୁଝାଲାମ ନା । ଲାଲମୋହନବାବୁ ହଠାତ୍ ଜିଜ୍ଞେସ କରଲେନ, ‘ହାଜରା କିସେର ଭାଙ୍ଗାର ବଲୁନ ତୋ ? ଆଜ ଆବାର ଟେବିଲେ ମିସଟା ଟ୍ରୁଟାର କୀ ସବ ବଲାଇଲେନ...’

ଫେଲୁଦା ବଲଲ, ‘ହାଜରା ଏକଜନ ପ୍ଯାରାସାଇକଲଜିସ୍ଟ ।’

‘ପ୍ଯାରାସାଇକଲଜିସ୍ଟ ?’ ଲାଲମୋହନବାବୁ ଭୁରୁ କୁଁଚକେ ଗେଲ । ‘ସାଇକଲଜିର

আগে যে আবার প্যারা বসে সেটা তো জানতুম না মশাই। টাইফয়েডের আগে বসে সেটা জানি। তার মানে কি হাফ-সাইকলজি—প্যারা-টাইফয়েড যেমনি হাফ-টাইফয়েড?

ফেলুদা বলল, ‘হাফ নয়, প্যারা মানে হচ্ছে অ্যাবনরম্যাল। মনস্তৰ ব্যাপারটা এমনই ধোঁয়াটে; তার মধ্যেও আবার যে দিকটা বেশি ধোঁয়াটে, সেটা প্যারাসাইকলজির আভারে পড়ে।’

‘আর জাতিস্মরের কথা কী যেন বলছিলেন?’

‘মুকুল ইজ এ জাতিস্মর। অন্তত তাই বলা হয় তাকে।’

লালমোহনবাবুর মুখ হাঁ হয়ে গেল।

‘আপনি প্লেটের অনেক খোরাক পাবেন’, ফেলুদা বলল, ‘ছেলেটি পূর্বজন্মে দেখা একটা সোনার কেঁজার কথা বলে। আর সে নাকি একটা বাড়িতে থাকত যার মাটিতে গুপ্তধন পৌঁতা ছিল।’

‘আমরা কি সেই সবের খৌঁজে যাচ্ছি নাকি মশাই?’ লালমোহনবাবুর গলা ঘড়ঘড়ে হয়ে গেছে।

‘আপনি যাচ্ছেন কিনা জানি না, তবে আমরা যাচ্ছি।’

লালমোহনবাবু রাস্তার মাঝখানে দু-হাত দিয়ে খপ করে ফেলুদার হাত ধরে ফেলল।

‘মশাই—চান্স অফ এ লাইফটাইম। আমায় ফেলে ফস্ক করে কোথাও চলে যাবেন না—এইটৈই আমার রিকোয়েস্ট।’

‘এরপর কোথায় যাবো এখনো কিছুই ঠিক হয়নি।’

লালমোহনবাবু কী জানি ভেবে বললেন, ‘মিস্টার ট্রটার কি আপনাদের সঙ্গে যাবেন নাকি?’

‘কেন? আপনার আপত্তি আছে?’

‘লোকটা পাওয়ারফুল সাস্পিশাস্ম।’

রাস্তার একধারে একটা জুতোওয়ালা বসেছে, তার চারিদিকে ঘিরে নাগরার ছড়াচড়ি। এখনকার লোকেরা এই ধরনের নাগরাই পরে। ফেলুদা জুতোগুলোর সামনে দাঁড়াল।

‘পাওয়ারফুল তো জানি। সাস্পিশাস্ম কেন?’ ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

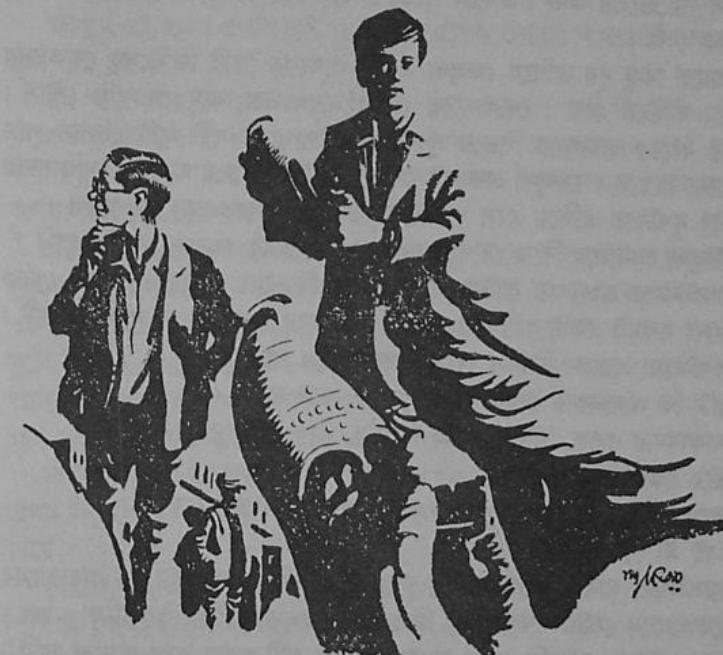
‘কাল গাড়িতে যেতে যেতে খুব বাক্তাঙ্গা মারছিল। বলে—ট্যাঙ্গানিকায় নাকি নেকড়ে মেরেছে নিজে বন্দুক দিয়ে। অথচ আমি জানি যে সারা আফ্রিকার কোনো তল্লাটে নেকড়ে জানোয়ারটাই নেই। মাটিন জনসনের বই পড়েছি আমি—আমার কাছে ধাক্কা।’

‘আপনি কী বললেন?’

সোনার কেঁজা

‘কী আর বলব? ফস্ক করে মুখের ওপর তো লায়ার বলা যায় না! দু’ জনের মাঝখানে স্যান্ডউইচ হয়ে বসে আছি। আর লোকটাৰ ছাতি দেখেছেন তো? কমপক্ষে ফটিফাইভ ইপ্পেজ। আর রাস্তার দুধারে দেখচি ইয়া ইয়া মনসার বোপড়া—কন্ট্রাডিকট কৱলুম, আৰ অমনি কোলপাঁজা করে তুলে নিয়ে যদি ওই একটা বোপড়াৰ পেছনে ফেলে দিয়ে চলে যায়—ইন নো টাইম মশাই শকুনিৰ কোয়াড্রন এসে ল্যান্ড করে ফিস্টি লাগিয়ে দেবে।’

‘আপনার লাশে ক’টা শকুনের পেট ভৰবে বলুন তো?’



‘হেং হেং হেং...’

ফেলুদা ইতিমধ্যে পায়ের স্যান্ডেল খুলে নাগরা পরে পায়চারি শুরু করে দিয়েছে। লালমোহনবাবু বললেন, ‘ভেবি পাওয়ারফুল শুজ—কিনছেন নাকি?’

‘একটা পরে দেখুন না,’ ফেলুদা বলল।

ভদ্রলোকের পায়ের মাপের মতো ছোট জুতো অবিশ্বা দোকানে ছিল না, তাও তার মধ্যে যে জোড়াটা সবচেয়ে ছোট সেটা পরে তিনি প্রায় আঁতকে উঠলেন।

‘এ যে গণ্ডারের চামড়া মশাই ! এ তো গণ্ডার ছাড়া আর কারুর পায়ে সৃষ্টি করবে না !’

‘তাহলে ধরে নিন রাজস্থানের শতকরা নববই ভাগ লোক আসলে গণ্ডার ।’
দু’জনেই নাগরা খুলে যে যার জুতো পরে নিল । দোকানদারও হাসছিল । সে বুবেছে শহরের বাবুরা ছেটলোকদের জুতো পায়ে দিয়ে একটু রসিকতা করছে ।

আমরা এগিয়ে চললাম । একটা পানের দোকান থেকে বেদম জোরে রেডিওতে ফিল্মের গানের আওয়াজ বেরোচ্ছে । মনে পড়ে গেল কলকাতার পুজো প্যান্ডেলের কথা । এখানে পুজো নেই, আছে দসেরা । কিন্তু তার এখনো অনেক দৈরী ।

আরো কিছু দূর এগিয়ে ফেলুন্দা একটা পাথরের তৈরি জিনিসের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে গেল । দোকানটার চেহারা বেশ ভদ্র, নাম সোলাকি স্টোর্স । বাইরে কাঁচের জানালার পিছনে সুন্দর সুন্দর পাথরের ঘটি বাটি গেলাস পাত্র সাজানো রয়েছে । ফেলুন্দা একদৃষ্টে সেগুলোর দিকে চেয়ে আছে । দোকানদার দরজার মুখটাতে এগিয়ে এসে আমাদের ভিতরে আসতে অনুরোধ করল ।

ফেলুন্দা জানালার দিকে দেখিয়ে বলল, ‘ওই বাটিটা একবার দেখতে পারি ?’

দোকানদার জানালার বাটিটা না বার করে ভিতরের একটা আলমারি থেকে ঠিক সেই রকমই একটা বাটি বার করে দিল । সুন্দর হলদে রঙের পাথরের বাটি । আগে কখনো এরকম জিনিস দেখেছি বলে মনে পড়ে না ।

‘এটা কি এখানকার তৈরি ?’ ফেলুন্দা জিজ্ঞেস করল ।

দোকানদার বলল, ‘রাজস্থানেরই জিনিস, তবে যোধপুরের নয় ।’

‘তবে কোথাকার ?’

‘জয়সলমীর । এই হলদে পাথর শুধু ওখানেই পাওয়া যায় ।’

‘আই সী...’

জয়সলমীর নামটা আমি আবছা আবছা শুনেছি । জয়গাটা যে রাজস্থানের ঠিক কোনখানে সেটা আমার জানা ছিল না । ফেলুন্দা বাটিটা কিনে নিল । সাড়ে নটা নাগাদ টাঙ্গার ঝাঁকুনি খেয়ে সকালের ডিম-রুটি হজম করে আমরা সাকিঁট হাউসে ফিরলাম ।

মন্দার বোস বারান্দায় বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন । আমাদের হাতে প্যাকেট দেখে বললেন, ‘কী কিনলেন ?’

ফেলুন্দা বলল, ‘একটা বাটি । রাজস্থানের একটা মেমেন্টো রাখতে হবে তো ।’

‘আপনার বন্ধু তো বেরিলেন দেখলাম ।’

‘কে, ডেক্টর হাজরা ?’

‘নটা নাগাদ বেরিয়ে যেতে দেখলাম একটা ট্যাক্সি করে ।’

‘আর মুকুল ?’

‘সঙ্গেই গেছে । বোধ হয় পুলিশে রিপোর্ট করতে গেছেন । কালকের ঘটনার পর হি মাস্ট বি কোয়াইট শেকন ।’

লালমোহনবাবু ‘প্লটটা একটু চেঞ্জ করতে হবে’ বলে তাঁর ঘরে চলে গেলেন ।
ঘরে গিয়ে ফেলুন্দাকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘ইঠাং বাটিটা কিনলে কেন ফেলুন্দা ?’
ফেলুন্দা সোফায় বসে বাটিটা মোড়ক থেকে খুলে টেবিলের উপর রেখে বলল,

‘এটার একটা বিশেষত্ব আছে ।’

‘কী বিশেষত্ব ?’

‘জীবনে এই প্রথম একটা বাটি দেখলাম যেটাকে সোনার পাথরবাটি বললে খুব ভুল বলা হয় না ।’

এর পরে আর কোনো কথা না বলে সে ব্র্যাড্শ্র পাতা উল্টোতে আরম্ভ করল । আমি আর কী করি । জানি এখন ঘটাখানেক ফেলুন্দার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোবে না, বা তাকে কিছু জিজ্ঞেস করলে তার উভর পাওয়া যাবে না, তাই অগত্যা বাইরে বেরোলাম ।

লম্বা বারান্দাটা এখন খালি । মন্দারবাবু উঠে গেছেন । দূরে একজন মেমসাহেবে বসেছিলেন, তিনিও উঠে গেছেন । একটা ঢোকাকের আওয়াজ ভেসে আসছে । এবার তার সঙ্গে একটা গান শুরু হল । গেটের দিকে চেয়ে দেখলাম, দুটো ভিথরি গোছের লোক—একটা পুরুষ আর একটা মেয়ে—গেট দিয়ে চুকে আমাদের বারান্দার দিকে এগিয়ে আসছে । ছেলেটা ঢোক বাজাছে আর মেয়েটা গান গাইছে । আমি বারান্দা দিয়ে এগিয়ে গেলাম ।

মাঝখানের খোলা জায়গাটায় গিয়ে ইচ্ছে হল একবার দোতলায় যাই । সিডিটা প্রথম দিন থেকেই দেখছি, আর জানি যে উপরে ছাত আছে । উঠে গেলাম সিডি দিয়ে ।

দোতলার মাঝখানে পাশাপাশি খানচারেক ঘর । সেগুলোর দু-দিকে পুবে আর পশ্চিমে খোলা ছাত । ঘরগুলোতে লোকজন নেই বলেই মনে হল । কিংবা হয়ত যারা আছে তারা বেরিয়েছে ।

পশ্চিম দিকের ছাতটায় গিয়ে দেখি যোধপুরের কেল্লাটা দারুণ দেখাচ্ছে সেখান থেকে ।

নিচে ভিথরির গান হয়ে চলেছে । সুরটা চেনা চেনা লাগছে । কোথায় শুনেছি এ সুর ? ইঠাং বুতে পারলাম, মুকুল যে সুরে গুণগুণ করে, তার সঙ্গে এর খুব মিল আছে । বার বার একই সুর ঘুরে ঘুরে আসছে, কিন্তু শুনতে একবেয়ে লাগছে না । আমি ছাতের নিচু পাঁচিলটার দিকে এগিয়ে গেলাম । এদিকটা হচ্ছে সাকিঁট হাউসের পিছন দিক ।

সেরা সত্তজিৎ

ওমা, পিছনেও যে বাগান আছে তা তো জানতাম না ! আমাদের ঘরের পিছন দিকে জানালা দিয়ে একটা বাটু গাছ দেখা যায় বটে, কিন্তু এতখানি জায়গা জুড়ে এত রকম গাছ আছে এদিকটায় সেটা বুঝতে পারিনি ।

ঝলমলে নীল ওটা কী নড়ছে গাছপালার পিছনে ? ওহো—একটা ময়ূর । গাছের পিছনে লুকোনো ছিল শরীরের খানিকটা, তাই বুঝতে পারিনি । এবারে পুরো শরীরটা দেখা যাচ্ছে । মাটি থেকে খুটে খুটে কী যেন যাচ্ছে । পোকাটোকা বোধ হয় ; ময়ূর তো পোকা খায় বলেই জানি । হঠাৎ মনে পড়ল কোথায় যেন পড়েছিলাম যে, ময়ূরের বাসা খুজে পাওয়া খুব মুশকিল । তারা বেছে বেছে নাকি অদ্ভুত সব গোপন জায়গা বার করে বাসা তৈরি করে ।

আন্তে আন্তে পা ফেলে ময়ূরটা এগোচ্ছে, লম্বা গলাটাকে বেঁকিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে দেখছে, শরীরটা ঘুরলে সমস্ত লেজটা সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে যাচ্ছে ।

হঠাৎ ময়ূরটা দাঁড়াল । গলাটা ডান দিকে ঘোরালো । কী দেখছে ময়ূরটা ? নাকি কোনো শব্দ শুনেছে ?

ময়ূরটা সরে গেল । কী জানি দেখে ময়ূরটা সরে যাচ্ছে ।

একজন লোক । আমি যেখানে দাঁড়িয়েছি তার ঠিক নিচে । গাছের ফাঁক দিয়ে ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে । লোকটার মাথায় পাগড়ি । খুব বেশি বড় না—মাঝারি । গায়ে সাদা চাদর জড়ানো । একেবারে ওপর থেকে দেখছি বলে লোকটার মুখ দেখা যাচ্ছে না । খালি পাগড়ি আর কাঁধ । হাত দুটো চাদরের তলায় ।

লোকটা পা টিপে টিপে এগোচ্ছে । পশ্চিম দিক থেকে পুব দিকে । আমি রয়েছি পশ্চিমের ছাতে । পুব দিকে একতলায় আমাদের ঘর ।

হঠাৎ ইচ্ছে করল লোকটা কোথায় যায় দেখি ।

মাবের ঘরগুলো দৌড়ে পেরিয়ে গিয়ে উন্টে দিকের ছাতের পিছনের পাঁচিলের কাছে গিয়ে সামনে ঝুকে পড়লাম ।

লোকটা এখন আবার আমার ঠিক নিচে । ছাতের দিকে চাইলে আমাকে দেখতে পাবে, কিন্তু দেখল না ।

এগিয়ে আসছে সামনের দিকে লোকটা । আমাদের ঘরের জানালার দিকে এগিয়ে আসছে । হাতটা চাদরের ভিতর থেকে বার করল । কবজির কাছটায় চকচকে ওটা কী ?

লোকটা থেমেছে । আমার গলা শুকিয়ে গেছে । লোকটা আরেক পা এগোল—

‘ক্যাঁ ও যাঁ !’

সেকটা চমকে পিছিয়ে গেল । ময়ূরটা কর্কশ স্বরে ডেকে উঠেছে । আর সেই সঙ্গে সঙ্গেই আমিও ঢেঁচিয়ে উঠলাম—

সোনার কেঁচো

‘ফেলুদা !’

পাগড়ি পরা লোকটা উর্ধ্বশাসে দৌড়ে যেদিক দিয়ে এসেছিল সেদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল, আর আমিও দুড়দাঢ় করে সিড়ি দিয়ে নেমে বারান্দা দিয়ে এক নিখাসে দৌড়ে গিয়ে আমাদের ঘরে দরজার মুখে ফেলুদার সঙ্গে দড়াম করে কলিশন থেয়ে ভ্যাবাচাকা চুপ !

আমাকে ঘরে টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলুদা বলল, ‘কী ব্যাপার বল তো ?’

‘ছাত থেকে দেখলাম, একটা লোক... পাগড়ি পরে... তোমার জানালার দিকে আসছে...’

‘দেখতে কীরকম ? লম্বা ?’

‘জানি না... উপর থেকে দেখছিলাম তো !... হাতে একটা...’

‘হাতে কী ?’

‘ঘড়ি...’

আমি ভেবেছিলাম ফেলুদা ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দেবে কিংবা আমাকে বোকা আর ভীতু বলে ঠাট্টা করবে । কিন্তু তার কোনোটাই না করে ও গঙ্গারভাবে জানালাটার দিকে গিয়ে বাইরে মুখ বাড়িয়ে এদিক ওদিক দেখে নিল ।

দরজায় একটা টোকা পড়ল ।

‘কাম ইন !’

বেয়ারা কফি নিয়ে চুকল ।

‘সেলাম সাব !’

টেবিলের উপর কফির ট্রেটা রেখে পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা চিঠি বার করে ফেলুদাকে দিল ।

‘মৈনেজার সাবনে দিয়া ।’

বেয়ারা চলে গেল । ফেলুদা চিঠিটা পড়ে একটা হতাশার ভাব করে ধপ করে সোফার উপর বসে পড়ল ।

‘কার চিঠি ফেলুদা ?’

‘পড়ে দ্যাখ !’

ডক্টর হাজরার চিঠি । ডক্টর হাজরার নাম লেখা প্যাডের কাগজে ইংরিজিতে লেখা ছেট্ট চার লাইনের চিঠি—‘আমার বিশ্বাস আমাদের পক্ষে আর যোধপুরে থাকা নিরাপদ নয় । আমি অন্য আরেকটা জায়গায় চললাম, সেখানে কিছুটা সাফল্যের আশা আছে মনে হয় । আপনি আর আপনাদের ভাইটি কেন আর মিথ্যা বিপদের মধ্যে জড়াবেন ; তাই আপনাদের কাছে বিদায় না নিয়েই চললাম । আপনাদের মঙ্গল কামনা করি ।—ইতি এই এম হাজরা !’

ফেলুদা দাঁতে দাঁত চেপে বলল, ‘অত্যন্ত হেস্টি কাজ করেছেন ভদ্রলোক !’

সেরা সত্যজিৎ

তারপর কফি না খেয়েই সোজা চলে গেল রিসেপশন কাউন্টারে। আজ একটি নতুন ভদ্রলোক বসে আছেন সেখানে। ফেলুদা জিজ্ঞেস করল, ‘ডক্টর হাজরা কি ফিরবেন বলে গেছেন?’

‘না তো। উনি ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে গেছেন। ফেরার কথা তো কিছু বলেননি।’

‘কোথায় গেছেন সেটা আপনি জানেন?’

‘স্টেশনে গেছেন এটাই শুধু জানি।’

ফেলুদা একটুক্ষণ ভেবে বলল, ‘জয়সলমীর তো এখান থেকে ট্রেনে যাওয়া যায়, তাই না?’

‘আজ্জে হাঁ। বছর দুয়েক হল ডিরেক্ট লাইন হয়েছে।’

‘কখন ট্রেন?’

‘রাত দশটা।’

‘সকালের দিকে কোনো ট্রেন নেই?’

‘যেটা আছে সেটা অর্ধেক পথ যায়, পোকরান পর্যন্ত। সেটা এই আধ ঘণ্টা হল ছেড়ে গেছে। পোকরান থেকে যদি গাড়ির ব্যবস্থা থাকে তা হলে অবিশ্য এ ট্রেনটাতেও জয়সলমীর যাওয়া যায়।’

‘কতটা রাস্তা পোকরান থেকে?’

‘সত্ত্বর মাইল।’

‘সকালে যোধপুর থেকে অন্য কী ট্রেন আছে?’

ভদ্রলোক একটা বইয়ের পাতা উত্তেপাটে দেখে বললেন, ‘আটটায় একটা প্যাসেঞ্জার আছে, সেটা বারমের যায়। নটায় আছে রেওয়ারি প্যাসেঞ্জার। দ্যাটস্ অল।’

ফেলুদা কাউন্টারের উপর ডান হাতের আঙুলের ডগা দিয়ে কয়েকবার অসহিষ্ণুভাবে টোকা দিয়ে বলল, ‘জয়সলমীর তো এখান থেকে প্রায় দু’শো মাইল, তাই না?’

‘আজ্জে হাঁ।’

‘আপনি অনুগ্রহ করে একটা ট্যাক্সির বন্দোবস্ত করে দেবেন? আমরা সাড়ে এগারোটা নাগাদ বেরোতে চাই।’

ভদ্রলোক সশ্রাতি জানিয়ে টেলিফোন তুললেন।

‘কোথায় চললেন আপনারা?’

মন্দার বোস। স্নানটান করে ফিটফাট হয়ে হাতে সুটকেস নিয়ে বেরিয়েছেন ঘর থেকে।

ফেলুদা বলল, ‘একটু থর মরুভূমিটা দেখার ইচ্ছে আছে।’

‘ও, তার মানে নর্থ-ওয়েস্ট। আমি যাচ্ছি একটু ইস্টে।’

সোনার কেল্লা

‘আপনিও চললেন?’

‘মাই ট্যাক্সি শুড় বি হিয়ার এনি মিনিট নাউ। বেশি দিন এক জায়গায় মন টেকে না মশাই। আর আপনারাও যদি চলে যান তা হলে তো সার্কিট হাউস খালি হয়ে যাচ্ছে এমনিতেও।’

কাউন্টারের ভদ্রলোক কথা শেষ করে টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে বললেন, ‘ইট্স আরেঞ্জড।’

ফেলুদা একবার আমাকে বলল, ‘দ্যাখ তো লালমোহনবাবুর দেখা পাস কিনা। বল যে, আমরা এগারোটায় জয়সলমীর যাচ্ছি। যদি উনি আসতে চান আমাদের সঙ্গে, তাহলে যেন ইমিডিয়েটলি তৈরি হয়ে নেন।’

আমি ছুটলাম দশ নম্বর ঘরের দিকে। কী উদ্দেশ্যে যে জয়সলমীর যাচ্ছি জানি না। ফেলুদা অন্য সব জায়গা ফেলে এ জায়গাটা বাছল কেন? বোধ হয় মরুভূমির কাছে বলে। ডক্টর হাজরাও কি জয়সলমীর গেছেন? এই কি আমাদের বিপদের শেষ? না এই সবে শুরু?

॥ ৮ ॥

যোধপুর থেকে পোকরান প্রায় একশো কুড়ি মাইল রাস্তা। সেখান থেকে জয়সলমীর আবার সত্ত্বর মাইল। সবসুন্দর এই দুশো মাইল যেতে আন্দাজ সাড়ে ছয় সাত ঘণ্টা লাগা উচিত। অস্তত আমাদের ড্রাইভার গুরুবচন সিং তাই বলল। বেশ গোলগাল হাসিখুশি শিখ ড্রাইভারটিকে লক্ষ করছিলাম মাঝে মাঝে স্টিয়ারিং থেকে হাত দুটা সরিয়ে নিয়ে মাথার পিছনে দিয়ে শরীরটা পিছন দিকে হেলিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। গাড়ি অবিশ্য তখনো চলছে, আর স্টিয়ারিং ঘোরানোর কাজটা সেরে নিচ্ছে ভুঁড়িটাকে এগিয়ে দিয়ে। কাজটা অবিশ্য শুনতে যত কঠিন মনে হয় ততটা নয়, কারণ প্রথমতগাড়ি চলাচল এ রাস্তায় প্রায় নেই বললেই চলে, আর দ্বিতীয়ত পাঁচ ছ’ মাইল ধরে একটানা সোজা রাস্তা এর মধ্যে অনেকবারই লক্ষ করলাম। পথে কোনো গোলমাল না হলে মনে হয় সক্ষ্য ছ’টা নাগাদ জয়সলমীর পৌঁছে যাব।

যোধপুর ছাড়িয়ে মাইল দশেক পর থেকেই এমন সব দৃশ্য আরম্ভ হয়েছে যেমন আমি এর আগে কখনো দেখিনি। যোধপুরের আশেপাশে অনেক পাহাড় আছে, যে সব পাহাড়ের লালচে রঙের পাথর দিয়েই যোধপুরের কেল্লা তৈরি। কিন্তু কিছুক্ষণ থেকেই মনে হচ্ছে যেন পাহাড় ফুরিয়ে গেছে। তার বদলে আরম্ভ হয়েছে দিগন্ত অবধি গড়িয়ে যাওয়া ঢেউ খেলানো জমি। এই জমির কিছুটা ঘাস, কিছুটা লালচে মাটি, কিছুটা বালি আর কিছুটা কাঁকর। সাধারণ গাছপালা ও ক্রমশ

কমে গিয়ে তার বদলে চোখে পড়ছে বাব্লা গাছ, আর নাম-না-জানা সব কাঁটা গাছ আর কাঁটা ঝোপ।

আর দেখছি বুনো উট। গুৰু ছাগলের মতো উট চৱে বেড়াচ্ছে যেখানে সেখানে। তার কোনোটার রং দুধ দেওয়া চায়ের মতো, আর কোনোটা আবার ব্ল্যাক কফির কাছাকাছি। একটা উটকে দেখলাম ওই শুকনো কাঁটা গাছই চিবিয়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। কিন্তু এ সব অঞ্চলে এটাই ওদের খাদ্য বলে ওরা নাকি সেটাগ্রাহ্যই করে না।

জয়সলমীরের কথাও ফেলুদা বলছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে তৈরি এই শহর নাকি ভাট্টি রাজপুতদের রাজধানী ছিল। ওখান থেকে মাত্র চৌষটি মাইল দূরে পাকিস্তানের বর্ডার। দশ বছর আগেও নাকি জয়সলমীরে যা ওয়া খুব মুশকিল ছিল। ট্রেন তো ছিলই না, রাস্তা ও যা ছিল তা অনেক সময়ই বালিতে ঢাকা পড়ে ছিল। কিন্তু এত শুকনো যে ওখানে বছরে একদিন বৃষ্টি হারিয়ে যেত। ভারগাটা নাকি এত শুকনো যে ওখানে বছরে একদিন বৃষ্টি হলেও লোকেরা সেটাকে সৌভাগ্য বলে মনে করে। যুদ্ধের কথা জিজ্ঞেস করতে করেছিল।

নব্বই কিলোমিটার বা ছাপ্পাম মাইলের কাছাকাছি এসে হঠাৎ আমাদের ট্যাক্সির একটি টায়ার পাংচার হয়ে গাড়িটা একটা বিশ্রী শব্দ করে রাস্তার একপাশে কেদরে থেমে গেল। গুরুবচন সিং-এর উপর মনে মনে বেশ রাগ হল। ও বলেছিল তায়ার চেক করে নিয়েছে, হাওয়া দেখে নিয়েছে ইত্যাদি। সত্যি বলতে কী, গাড়িটা বেশ নতুনই।

সর্দারজীর সঙ্গে সঙ্গে আমরাও বাইরে বেরোলাম। টায়ার চেঞ্জ করার হ্যাঙ্গাম আছে, অস্তত পনেরো মিনিটের ধাক্কা।

চ্যাপটা টায়ারের দিকে চোখ যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমরা পাংচারের কারণটা বুঝতে পারলাম।

রাস্তার অনেকখানি জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে অজস্র পেরেক। সেগুলো দেখেই বোৱা যায় যে সদ্য কেনা হয়েছে।

আমরা এ-ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। সিং সাহেব দাঁতের ফাঁক দিয়ে একটা কথা বলল, যেটা অবিশ্বিয় বইয়ে লেখা যায় না। ফেলুদা কিছুই বলল না, শুধু কোমরে হাত দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ভুক্ত কুঁচকে ভাবতে লাগল। লালমোহনবাবু একটা পুরোন জাপান এয়ার লাইনসের ব্যাগ থেকে একটা ডায়ারি ধরনের সবুজ খাতা বার করে তাতে খস করে পেনসিল দিয়ে কী জানি লিখলেন।

নতুন টায়ার পরিয়ে, ফেলুদার কথামতো রাস্তা থেকে পেরেক সরিয়ে, যখন আবার রওনা হচ্ছি তখন ঘড়িতে পৌনে দুটো। ফেলুদা ড্রাইভারকে বলল—‘একটু রাস্তার দিকে নজর রেখে চালাবেন সর্দারজী—আমাদের পেছনে যে দুশ্মন লেগেছে সে তো বুঝতেই পারছেন।’

এদিকে বেশি আস্তে গেলে পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে, কাজেই গুরুবচন সিং ঘাট থেকে নামিয়ে চলিশে রাখলেন স্পীডোমিটার। সত্যি বলতে কী, রাস্তার উপর চোখ রাখতে গেলে ঘণ্টায় দশ-পনেরো মাইলের বেশি স্পীড তোলা চলে না।

প্রায় একশো ষাট কিলোমিটার অর্থাৎ একশো মাইলের কাছাকাছি এসে সর্বনাশটা আর এড়ানো গেল না।

এবার কিন্তু পেরেক না, এবার পিতলের বোর্ড পিন। আন্দাজে মনে হয় প্রায় হাজার দশেক পিন বিশ-পাঁচিশ হাত জায়গা জুড়ে ছড়ানো রয়েছে। বুঝতেই পারলাম যে, টায়ার ফাঁসানেওয়ালারা কোনো রিস্ক নিতে চাননি।

আর এটাও জানি, গুরুবচন সিং-এর ক্যারিয়ারে আর স্পেয়ার নেই।

চারজনই আবার গাড়ি থেকে নামলাম। সিং সাহেবের ভাব দেখে মনে হল, মাথায় পাগড়ি না থাকলে তিনি নিশ্চয়ই মাথা চুলকোতেন।

ফেলুদা জিজ্ঞেস করল, ‘পোকরান টাউন হ্যায় ইয়া গাঁও হ্যায়?’

‘টাউন হ্যায় বাবু।’

‘কিৰণি দূৰ হঁহাসে?’

‘পাঁচিশ মিল হোগা।’

‘সর্বনাশ!... তব আভি হোগা কেয়া?’

গুরুবচন সিং বুঝিয়ে দিল যে, এ লাইনে যে ট্যাক্সি যাক না কেন, সেটা তার চেনা হবেই। এখানে অপেক্ষা করে যদি সে রকম ট্যাক্সি একটা ধরা যায়, তা হলে তাদের কাছ থেকে স্পেয়ার চেয়ে নিয়ে তারপর পোকরানে গিয়ে পাংচার সারিয়ে নেওয়া যাবে। কিন্তু কথা হচ্ছে, সে রকম ট্যাক্সি যাবে কি না, আর গেলেও, সেটা কখন যাবে! কতক্ষণ আমাদের এই ধূ-ধূ প্রান্তরের মধ্যে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে!

পাঁচটা উট আর তার সঙ্গে তিনটি লোকের একটা দল আমাদের পাশ দিয়ে যোধপুরের দিকে চলে গেল। লোকগুলোর প্রত্যেকটার রং একেবারে মিশকালো। তার মধ্যে আবার একজনের ধৰ্মবে সাদা দাঢ়ি আর গালপাটা। তারা আমাদের দিকে দেখতে দেখতে চলেছে দেখেই বোধহয় লালমোহনবাবু একটু ফেলুদার দিক যেঁয়ে দাঁড়ালেন।

‘সবসে নজর্দিক কোন রেল স্টেশন হ্যায়?’ ফেলুদা বোর্ড পিন তুলতে তুলতে জিজ্ঞেস করল। আমরাও অন্য গাড়ির কথা ভেবে এই সংক্ষার্থিয় হাত

লাগিয়েছিলাম।

‘সাত আট মিল হোগা রামদেওরা।’

‘রামদেওরা...’

রাস্তা থেকে বোর্ড পিন সরানো হলে পর, ফেলুদা তার ঘোলা থেকে ঝাড়শ টাইম টেবিল বার করল। একটা বিশেষ পাতা ভাঁজ করা ছিল, সেখানটা খুলে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, ‘লাভ নেই। তিনটে পয়তাঙ্গিশে যোধপুর থেকে সকালের ট্রেনটা রামদেওরা পৌঁছনোর কথা। অর্থাৎ সে গাড়ি নিশ্চয়ই এতক্ষণে আমাদের ছাড়িয়ে চলে গেছে।’

আমি বললাম, ‘কিন্তু রাত্রের দিকে আরেকটা ট্রেন যায় না জয়সলমীর?’

‘হ্যাঁ। কিন্তু সেটা রামদেওরা পৌঁছবে ভোর রাত্রিতে—তিনটে তিক্কাম। এখান থেকে এখন হাঁটা দিলে রামদেওরা পৌঁছতে বাড়া দু'ঘণ্টা। সকালের ট্রেনটা ধরার যদি আশা থাকত, তা হলে হঠেয়াওয়াতে একটা লাভ ছিল। অন্তত পোকরানটা



পৌঁছনো যেত। এই মাঠের মাঝখানে...’

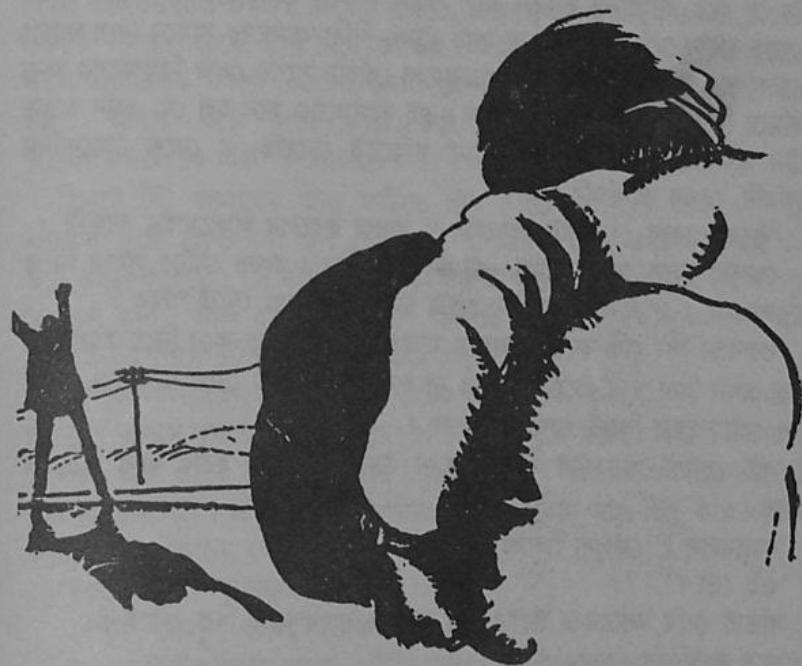
লালমোহনবাবু এই অবস্থার মধ্যেও হেসে একটু কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, ‘যাই বলুন মশাই, এ সব সিচুয়েশন লিঙ্গ উপন্যাসেই পাওয়া যায়। রিয়েল লাইফেও যে এরকমটা—’

ফেলুদা হঠাত বাড়িয়ে ভদ্রলোককে থামতে বললেন। চারিদিকে একটা ও শব্দ নেই, সারা পৃথিবী যেন এখানে এসে বোবা হয়ে গেছে। এই নিষ্কৃতার মধ্যে স্পষ্ট শুনতে পেলাম একটা ক্ষীণ আওয়াজ—বুক-বুক বুক-বুক বুক-বুক বুক-বুক...

ট্রেন আসছে। পোকরানের ট্রেন। কিন্তু লাইন কোথায়?

শব্দের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে হঠাত দূরে চোখে পড়ল ধৌঁয়া। আর তার সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে পেলাম টেলিগ্রাফের পোল। জমিটা ঢালু হয়ে গেছে তাই বোবাই যায় না। পিছনের লাল মাটির সঙ্গে লাল টেলিগ্রাফ পোল মিশে প্রায় অদৃশ্য হয়ে আছে। আকাশে মাথা উঁচিয়ে থাকলে আগেই চোখে পড়ত।

‘দৌড়ো !’



ফেলুদা চীৎকারটা দিয়েই ধৌঁয়া লক্ষ্য করে ছুট দিল। সঙ্গে সঙ্গে আমিও। আর আমার পিছনে জটায়। আশ্চর্য! ভদ্রলোক ওই লিকপিকে শরীর নিয়ে এমন ছুটতে পারেন, তা আমি ভাবতে পারিনি। আমাকে ছাড়িয়ে প্রায় ফেলুদাকে ধরে ফেলেন আর কী!

পায়ের তলায় ঘাস, কিন্তু সে ঘাসের রং সবুজ নয়—একেবারে তুলোর মতো সাদা। তার উপর দিয়ে পড়ি-কি-মরি ছুট দিয়ে আমরা ঢালুর নিচে লাইনের ধারে পৌঁছে দেখি, ট্রেনটা আমাদের একশো গজের মধ্যে এসে পড়েছে।

ফেলুদা এক মুহূর্ত ইতন্তত না করে এক লাফে একেবারে লাইনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ে দুটো হাত মাথার উপর তুলে হৈ-হৈ করে নাড়তে আরম্ভ করে দিল। ট্রেন এদিকে হইসল দিতে আরম্ভ করেছে, আর সেই হইসল ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে জটায়ুর চীৎকার—‘রোককে, রোককে, হল্ট, হল্ট, রোককে !...’

কিন্তু কে কার কথা শোনে। এ ট্রেন যদিও ছোট, কিন্তু মাটিন কোম্পানির ট্রেনের মতো নয় যে, মাৰ-ৱাস্তায় দাঁড়িয়ে হাত দেখালে বাসের মতো থেমে যাবে। প্রচণ্ড হইসল মারতে মারতে স্পীড বিন্দুমাত্ৰ না কমিয়ে ট্রেনটা একেবারে হৈ হৈ করে আমাদের সামনে এসে পড়ল। ফলে ফেলুদাকে বাধ্য হয়ে লাইন থেকে বাইরে চলে আসতে হল, আর ট্রেনও দিব্য আমাদের সামনে দিয়ে ঘ্যাচাং ঘ্যাচাং শব্দ করতে করতে কুচকুচে কালো ধৌয়ায় সূর্মের তেজ কিছুক্ষণের জন্য কমিয়ে দিয়ে দূৰে অদৃশ্য হয়ে গেল। এই দুঃসময়েও মনে হল যে, এমন অস্তুত ট্রেন একমাত্র হলিউডের ‘ওয়েস্টাৰ্ন’ ছবিতেই দেখেছি, এ দেশে কোনোদিন দেখিনি, দেখব ভাবিওনি।

‘শুয়োপোকার রোয়াবটা দেখলেন?’ মন্তব্য করলেন লালমোহন গাঙ্গুলী।

ফেলুদা বলল, ‘ব্যাড লাক। ট্রেনটা লেট ছিল। অথচ সেটাৰ সুযাগ নিতে পারলাম না। পোকৰানে হয়তো একটা ট্যাক্সিও পাওয়া যেতে পারত।’

গুৰুবচন সিং বুদ্ধি করে আমাদের মালগুলো সব হাতে করে নিয়ে আসছিল, কিন্তু এখন আর তার প্রয়োজন হবে না। লাইনের দিকে চেয়ে দেখলাম, এখন আর ধৌয়া ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

‘বাট হোয়াট অ্যাবাউট ক্যামেলস?’ উত্তেজিত স্বরে হঠাতে বলে উঠলেন জটায়ু।

‘ক্যামেলস?’ ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

‘ওই তো !

সত্তিই দেখি, আরেকটা উটের দল আসছে যোধপুরের দিক থেকে।

‘গুড আইডিয়া। চলুন !

ফেলুদার কথায় আবার দৌড়।

‘সে রকম খেপে উঠলে নাকি উট টোয়েন্টি মাইলস পার আওয়ার ছুটতে পারে’—ছুটতে ছুটতেই বললেন লালমোহনবাবু।

উটের দলকে থামানো হল। এবারে দু'জন লোক আর সাতখানা উট। ফেলুদা প্রস্তাৱ কৰল—রামদেওৱা যাব, তিনটে উট কত লাগবে বলো। এদের ভাষা আবার হিন্দি নয়; স্থানীয় কোনো একটা ভাষায় কথা বলে। তবে হিন্দি বোৰো, আৱ ভাঙা ভাঙা বলতেও পাৱে। গুৰুবচন সিং এসে আমাদের হয়ে কিছুটা কথাবাৰ্তা বলে দিল। দশ টাকায় রাজী হয়ে গেল উট ভাড়া দিতে।

‘দৌড়ানে সেকেগা আপকা উট?’ লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস কৰলেন। ‘ট্রেন ধৰনে হোগা।’

ফেলুদা হেসে বলল, ‘আগে তো উঠুন। দৌড়ের কথা পৰে।’
‘উঠব ?’

এই প্রথম বোধহয় লালমোহনবাবু উটের সামনে পড়ে তার পিঠে ওঠার ব্যাপারটা তলিয়ে দেখলেন। আমি জানোয়াৱলোকে ভালো কৰে দেখছিলাম। কী বিদঘুটে চেহারা, কিন্তু কী বাহারের সাজ পরিয়েছে তাদেৱ। হাতিৰ পিঠে যেমন ঝালৱওয়ালা জাজিম দেখেছি ছবিতে, এদেৱ পিঠেও তাই। একটা কাঠেৱ বসবাৱ ব্যবস্থা রয়েছে, তার নিচে জাজিম। জাজিমে আবাৱ লাল নীল হলদে সবুজ জ্যামিতিক নকশা। উটেৱ গলাও দেখলাম লাল চাদৰ দিয়ে ঢাকা, আৱ তাতে আবাৱ কড়ি দিয়ে কাজ কৰা। বুৰলাম, যতই কুকুৰি হৈক, জানোয়াৱলোকে এৱা ভালোবাসে।

তিনটে উট আমাদেৱ জন্য মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসেছে। আমাদেৱ দুটো সুটকেস্, দুটো হোল্ড-অল আৱ ছোটখাটো যা জিনিস ছিল, সবই গুৰুবচন সিং এনে জড়ো কৰেছে। সে বলে দিল, ট্রেন ধৰতে পাৱলে আমৱা যেন পোকৰানে অপেক্ষা কৰি; আজ রাত্ৰেৱ মধ্যে সে অবশ্যাই পৌছে যাবে। মালগুলো অন্য দুটো উটেৱ পিঠে চাপিয়ে বেঁধে দেওয়া হল।

ফেলুদা লালমোহনবাবুকে বলল, ‘উটেৱ বসাটা লক্ষ কৰলেন তো? সামনেৱ পা দুটো প্রথমে দুমড়ে শৰীৱেৱ সামনেৱ দিকটা আগে মাটিতে বসছে। তাৱপৰ পেছন। আৱ ওঠাৰ সময় কিন্তু হবে ঠিক উল্টোটা। আগে উঠবে পিছন দিকটা, তাৱপৰ সামনেটা। এই হিসেবটা মাথায় রেখে শৰীৱটা আগু-পিছু কৰে নেবেন, তাহলে আৱ কোনো কেলেক্ষারি হবে না।’

‘কেলেক্ষারি?’ জটায়ুৰ গলা কাঠ।

‘দেখুন’, ফেলুদা বলল, ‘আমি আগে উঠছি।’

ফেলুদা উটেৱ পিঠে চাপল। উটওয়ালাদেৱ মধ্যে একজন মুখ দিয়ে একটা আওয়াজ কৰতেই ঠিক যেৱকমভাবে ফেলুদা বলেছিল সেইভাবে উটটা তেড়ে বেঁকে ভীষণ একটা ল্যাগব্যাগে ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়াল। এটা বুৰতে পাৱলাম যে, ফেলুদার বেলা কোনো কেলেক্ষারি হল না।

‘তোপ্সে ওঠ। তোৱা হালকা মানুষ, তোদেৱ ঝামেলা অনেক কম।’

উটওয়ালারা দেখি বাবুদেৱ কাণ দেখে দাঁত বাব কৰে হাসছে। আমিও সাহস কৰে উঠে পড়লাম, আৱ সেই সঙ্গে উটটাও উঠে দাঁড়াল। বুৰলাম যে আসল গোলমালটা হচ্ছে এই যে, পিছনেৱ পা-টা যখন থাড়া হয়, সওয়াৱিৱ শৰীৱটা তখন এক বাটকায় সামনেৱ দিকে অনেকখানি এগিয়ে যায়। মনে মনে ঠিক

করলাম যে, এর পরে যদি কখনো উঠি তাহলে প্রথম দিকে শরীরটাকে পিছনে হেলিয়ে টান করে রাখব, তাহলে ব্যালেন্সটা ঠিক হবে।

‘জয় ম্যা—’

লালমোহনবাবুর মা-টা ম্যা হয়ে গেল এই কারণেই যে, তিনি কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই উটের পিছন দিকটা এক বটকায় উঁচু হয়ে গেল, যার ফলে তিনি খেলেন এক রামছমড়ি। আর তারপরেই উল্টো হাঁচকায় ‘হেঁইক’ করে এক বিকট শব্দ করেই ভদ্রলোক একেবারে পারপেন্ডিকুলার।

গুরুবচন সিং-এর কাছে বিদায় নিয়ে আমরা তিনি বেদুইন রামদেওরা স্টেশনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম।

‘আধা ঘন্টে মে আট মিল যানা হ্যায়, টিরেন পাকড়ানা হ্যায়’, ফেলুদা উটওয়ালাদের উদ্দেশ্যে করে হাঁক দিল। কথাটা শুনে একজন উটওয়ালা আরেকটা উটের পিঠে চড়ে খচ্মচ খচ্মচ করে সামনে এগিয়ে গেল। তারপর অন্য লোকটার মুখ দিয়ে হেঁই হেঁই করে কয়েকটা শব্দ বেরোতেই শুরু হল উটের দোড়।

নড়বড়ে জানোয়ার, দৌড়ের সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা বাঁকুনি ও থায়: রীতিমত কিন্তু তাও ব্যাপারটা আমার মোটেই খারাপ লাগছিল না। আর তা ছাড়া বালি আর সাদা বলসানো ঘাসের ওপর দিয়ে ছুটে চলেছি, জায়গাটাও রাজস্থান, সব মিলিয়ে বেশ একটা রোমাঞ্চই লাগছিল।

ফেলুদা আমার চেয়ে খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিল। লালমোহনবাবু আমার পিছনে। ফেলুদা একবার ঘাড়টা পিছনে ফিরিয়ে হাঁক দিল—

‘শিপ অফ দ্য ডেজার্ট কীরকম বুবছেন মিস্টার গাম্বুলী?’

আমিও একবার মাথা ঘুরিয়ে দেখে নিলাম লালমোহনবাবুর অবস্থাটা। খুব শীত লাগলে লোকে যেমন মুখ করে—তলার ঢেঁট ফাঁক হয়ে দেখা যায় দাঁতে দাঁত লেগে রয়েছে, আর গলার শিরাগুলো সব বেরিয়ে আসে—লালমোহনবাবুর দেখি সেই রকম অবস্থা।

‘কী মশাই?’ ফেলুদা হাঁকল, ‘কিছু বলছেন না যে?’

পিছন থেকে এবার পাঁচটা ইনস্টলমেন্টে পাঁচটা কথা বেরোল—‘শিপ... অলরাইট... বাট... টকিং... ইমপিসিবল...’

কোনো রকমে হাসি চেপে সওয়ারির দিকে মন দিলাম। আমরা এখন রেল লাইনের ধার দিয়ে চলেছি। একবার মনে হল, দূরে যেন ট্রেনের ধৌয়াটা দেখতে পেলাম, তারপর আবার সেটা মিলিয়ে গেল। সূর্য নেমে আসছে। দৃশ্যও বদলে আসছে। আবার আবছা পাহাড়ের লাইন দেখতে পাচ্ছি বহু দূরে। ডান দিকে একটা প্রকাণ্ড বালির সূপ পড়ল। দেখে বুঝলাম তার উপরে মানুষের পায়ের

ছাপ পড়েনি। সমস্ত বালির গায়ে চেউয়ের মতো লাইন।

উটগুলোর বোধহয় একটানা এত দোড়নো অভ্যেস নেই, তাই মাঝে মাঝে তাদের শ্পীড কমে যাচ্ছিল, তারপর পিছন থেকে হেঁই হেঁই শব্দে তারা আবার দোড়তে শুরু করছিল।

সোয়া চারটে নাগাদ আমরা দূরে লাইনের ধারে চৌকো ঘরের মতো একটা কিছু দেখতে পেলাম। এটা স্টেশন ছাড়া আর কী হতে পারে?

আরো কাছে এলে পর বুঝলাম, আমাদের আন্দাজ ঠিকই। একটা সিগন্যালও দেখা যাচ্ছে। এটা একটা রেলওয়ে স্টেশন, এবং নিচয়ই রামদেওরা স্টেশন।

আমাদের উটের দোড় চিমে হয়ে এসেছে। কিন্তু আর হেঁই হেঁই করার প্রয়োজন হবে না, কারণ ট্রেন এসে চলে গেছে। কতক্ষণের জন্য ট্রেনটা ফসকে গেল জানি না, তবে ফসকে যে গেছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

তার মানে এখন থেকে রাত তিনটে পর্যন্ত আমাদের এই জনমানবশূন্য প্রান্তরে এক অজানা জায়গায় একটা নাম-কা-ওয়ান্টে রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বসে কাটাতে হবে।

॥ ৯ ॥

স্টেশন বলতে একটা প্ল্যাটফর্ম, আর একটা ছেট্ট কাজ চালাবার মতো টিকিট ঘর। আসলে স্টেশন তৈরির কাজ এখনো চলছে; কবে শেষ হবে তার কোনো ঠিক নেই। আমরা টিকিট ঘরের কাছেই একটা জায়গা বেছে নিয়ে সুটকেস আর হোল্ড-অল মাটিতে পেতে তার উপরে বসেছি। এখনে বসার একটা কারণ এই যে, কাছেই কাঠের পোস্টে একটা কেরোসিনের বাতি বুলছে, কাজেই অন্ধকার হলেও সেই আলোতে আমরা অন্তত পরম্পরের মুখটা দেখতে পাব।

স্টেশনের কাছে একটা ছেট্টখাটো গ্রাম জাতীয় ব্যাপার আছে। ফেলুদা একবার সেদিকটায় ঘুরে এসে জানিয়েছে যে, খাবারের দোকান বলে কিছুই নাকি সেখানে নেই। খাবার বলতে আমাদের এখন যা সম্ভল দাঁড়িয়েছে, সেটা হচ্ছে ফ্লাক্সের মধ্যে সামান্য জল আর লালমোহনবাবুর কাছে এক টিন জিভেগজা। বুঝতে পারছি, আজ রাতটা এই গজা খেয়েই থাকতে হবে। মিনিট দশকে হল সূর্য ডুবেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে। গুরুবচন সিং আসবে বলে বিশেষ ভরসা হয় না, কারণ আমরা এই যে তিনি ঘন্টা হল এসেছি, তার মধ্যে একটি গাড়িও যায়নি রাস্তা দিয়ে—না যোধপুরের দিকে, না জয়সলমীরের দিকে। রাত তিনটে পর্যন্ত এই প্ল্যাটফর্মে বসে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় আছে বলে মনে হয় না।

ফেলুদা ওৱা সুটকেস্টার উপৰ বসে রেলেৱ লাইনেৱ দিকে চেয়ে আছে একদৃষ্টি। ওকে এৱা মধ্যে বাবু দু-তিন দেখেছি বাঁ হাতেৱ তেলোৱ চাপে ডাব আঙুল মটকাতে। বেশ বুবোছি ওৱা ভেতৰে একটা চাপা উত্তেজনাৰ ভাব রয়েছে, আৱ তাই ও কথাও বলছে না বেশি।

দালদাৱ টিনটা খুলে একটা জিভেগজা বাবু কৰে তাতে একটা কামড় দিয়ে লালমোহনবাবু বললেন, ‘কী থেকে কী হয়ে যায় মশাই। আগা থেকে যদি এক কামৰায় সীট না পড়ত, তা হলে কি আৱ এভাবে আমাৱ হলিডেৱ চেহারাটা পালটে যেতো ?’

‘আপনাৰ কি আপসোস হচ্ছে ?’ ফেলুদা জিঞ্জেস কৰল।

‘বলেন কী মশাই !’ ফেলুদাৱ প্ৰশ্নটা ভদ্ৰলোক হেসেই উড়িয়ে দিলেন। ‘তবে কী জানেন, ব্যাপারটা যদি আমাৱ কাছে আৱেকটু ক্লিয়াৰ হত, তা হলে মজাটা আৱো জমত !’

‘কোন ব্যাপারটা ?’

‘কিছুই তো জানি না মশাই। খালি শাটুলককেৱ মতো এদিকে থাপ্পড় খেয়ে ওদিকে যাচ্ছি, আৱ ওদিকে থাপ্পড় খেয়ে এদিকে আসছি। এমনকি আপনি যে আসলে কে—হিৱো না ভিলেন—তাই তো বুঝতে পাৰছি না, হে হে !’

‘কী হবে জেনে ?’ ফেলুদা মুচকি হেসে বলল। ‘আপনি যখন উপন্যাস লেখেন, সব জিনিস কি আগে থেকে বলে দেন ? এই রাজস্থানেৱ অভিজ্ঞতাটাকেও একটা উপন্যাস বলে ধৰে নিন না। গল্পেৱ শেষে দেখবেন সব রহস্য পৰিকাৰ হয়ে গেছে !’

‘আমি আস্ত থাকব তো গল্পেৱ শেষে ? জ্যাস্ত থাকব তো ?’

‘ঠেকায় পড়লে আপনি যে দৌড়িয়ে খৰগোশকেও হাব মানাতে পাৱেন সেটা তো চোখেই দেখলাম। এটা কি কম ভৱসাৰ কথা ?’

একটা লোক এসে কখন জানি কেৱেসিনেৱ বাতিটা জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। সেই আলোয় দেখতে পেলাম স্থানীয় পোশাক পৰা দুটো পাগড়িধাৰী লাঠি ঠক ঠক কৰতে কৰতে আমাদেৱ দিকে এগিয়ে আসছে। তাৱা এসে আমাদেৱ ঠিক চার-পাঁচ হাত দূৰে মাটিতে উৰু হয়ে বসে নিজেদেৱ মধ্যে দুৰ্বোধ্য ভাষায় কথাৰ্বার্তা আৱস্ত কৰে দিল। লোক দুটোৱ একটা ব্যাপার দেখে আমাৱ মুখ হাঁ হয়ে গেল। তাদেৱ দু'জনেই গৌঁফ জোড়া অস্তত চার বাবু পাক খেয়ে গালেৱ দু'পাশে দুটো ঘড়িৱ স্প্ৰিং-এৱ মতো হয়ে রয়েছে। মনে হয়, টেনে সোজা কৰলে এক এক দিকে অস্তত হাত দেড়েক লম্বা হবে। লালমোহনবাবুৱ দেখি চক্ষুষ্টিৰ।

ফেলুদা চাপা গলায় বলল, ‘ব্যান্ডিটস্ !’

‘বলেন কী ?’ লালমোহনবাবু ঝাঙ্ক থেকে জল ঢেলে খেলেন।
‘নিঃসন্দেহে !’

লালমোহনবাবু এবাৱ দালদাৱ টিনটা বন্ধ কৰতে গিয়ে ঢাকনাটা হাত থেকে ফসকে ফেলে একটা বিশ্রী খ্যানখেনে শব্দ কৰে নিজেই আৱো বেশি নাভাৰ্স হয়ে পড়লেন।

লোকগুলোৱ গায়েৱ রং একেবাৱে সদ্য কালি দিয়ে বুৰুশ কৰা নতুন জুতোৱ মতো চকচকে। দুটোৱ মধ্যে একটা লোক এবাৱ একটা সিগারেট বাবু কৰে মুখে পুৱল, তাৱপৰ পকেট থাবড়ে থুবড়ে একটা দেশলাইয়েৱ বাক্স বাবু কৰে সেটা খালি দেখে ট্ৰেনেৱ লাইনেৱ দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। খচ কৰে একটা শব্দ শুনে ফেলুদাৱ দিকে চেয়ে দেখি, সে তাৱ লাইটাৱটা জ্বালিয়ে লোকটাৱ দিকে এগিয়ে দিয়েছে। লোকটা প্ৰথমে একটু অবাক, তাৱপৰ মুখ বাড়িয়ে সিগারেটটা ধৰিয়ে ফেলুদাৱ কাছ থেকে লাইটাৱটা নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে এখানে-সেখানে টিপে ফস কৰে সেটাকে জ্বালাল। লালমোহনবাবু কী জানি বলতে গেলেন, কিন্তু গলা দিয়ে পৰিকাৰ আওয়াজ বেৱোল না। লোকটা আৱো তিনবাৱ লাইটাৱটা জ্বালিয়ে-নিভিয়ে সেটা ফেলুদাকে ফেরত দিয়ে দিল। লালমোহনবাবু এবাৱ ঢাকনা লাগানো টিনটা সুটকেসে ভৱতে গিয়ে পুৱো টিনটাই হাত থেকে ফেলে গতবাৱেৱ চেয়ে আৱো চারণ্ণ বেশি শব্দ কৰে বসলেন। ফেলুদা সেদিকে কোনো ভুক্ষেপ না কৰে তাৱ থলি থেকে নীল খাতাটা বাবু কৰে এই টিমটিমে আলোতেই সেটা উলটো-পালটো দেখতে লাগল।

হঠাৎ লক্ষ কৰলাম টিকিট ঘৰেৱ পিছনে কিছুটা দূৰে একটা কাঁটা ঝৌপেৱ উপৰ কোথেকে জানি এসে পড়েছে।

আলোটা বাড়ছে। এবাৱ একটা গাড়িৱ আওয়াজ পেলাম। জয়সলমীৱেৱ দিক থেকে আসছে গাড়িটা। যাক বাবা ! মনে হচ্ছে গুৰুবচনেৱ সমস্যাৰ সমাধান হলেও হতে পাৱে।

গাড়িটা হস্ত কৰে নাকেৱ সামনে দিয়ে যোধপুৱেৱ দিকে চলে গেল। ঘড়িতে দেখলাম সাড়ে সাতটা।

ফেলুদা খাতা থেকে মুখ তুলে লালমোহনবাবুৱ দিকে চাইল। তাৱপৰ বলল, ‘আছা লালমোহনবাবু, আপনি তো গল্পটুল লেখেন, বলুন তো ফোসকা জিনিসটা কী এবং ফোসকা কেন পড়ে ?’

‘ফোসকা ?... ফোসকা ?...’ লালমোহনবাবু থতমত থেকে গেছেন। ‘কেন পড়ে মানে, এই ধৰন আপনি সিগারেট ধৰাতে গিয়ে হাতে ছাঁকা লাগল—’

‘সে তো বুলাম—কিন্তু ফোসকা পড়বে কেন ?’

‘কেন ? ও—আই সী—কেন...’

‘ঠিক আছে। এবাব বলুন তো একটা লোককে মাথার উপর থেকে দেখলে তাকে বেঁটে মনে হয় কেন?’

লালমোহনবাবু চুপ করে হাঁ করে চেয়ে রইলেন। আবছা আলোয় দেখলাম তিনি হাত কচলাচ্ছেন। পাশের লোক দুটো এক সুরে একভাবে গল্প করে চলেছে। ফেলুদা একদৃষ্টে লালমোহনবাবুর দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

লালমোহনবাবু জিভ দিয়ে ঠোঁট চেঁটে বললেন, ‘আমাকে এসব, মানে, কোশেন—’

‘আরেকটা প্রশ্ন আছে লালমোহনবাবু—এটার উন্নত আপনি নিশ্চয়ই জানেন।’

লালমোহনবাবু নির্বাক। ফেলুদা যেন তাঁকে হিপনোটাইজ করে ফেলেছে।

‘আজ সকালে আপনি সাকিঁট হাউসের পিছনের বাগানে আমার জানালার কাছে কী করছিলেন?’

লালমোহনবাবু এক মুহূর্ত পাথর। তারপরেই তিনি একেবারে হাত-পা ছুঁড়ে হাউমাউ করে উঠলেন।

‘আরে মশাই—আপনার কাছেই তো যাচ্ছিলুম! আপনারই কাছে! এমন সময় ময়ূরটা এমন চেঁচিয়ে উঠল—আর তারপর একটা চীৎকার শুনলাম—কেমন জানি নার্ভাস-টার্ভাস হয়ে…’

‘আমার ঘরে যাবার কি অন্য রাস্তা ছিল না? আর আমার কাছে আসার জন্য মাথায় পাগড়ি আর গায়ে চাদর দিতে হয়?’

‘আরে মশাই, গায়ের চাদর তো বিছানার চাদর, আর পাগড়ি তো সার্কিট হাউসের তোয়ালে। একটা ডিজগাইজ না হলে লোকটার উপর স্পাইং করব কী করে?’

‘কোন্ লোকটা?’

‘মিস্টার ট্রাটার! ভেরি সাসপিশাস! ভাগ্যে গেসলুম। কী পেলুম দেখুন না, ওর জানালার বাইরে ঘাসের উপর। সিক্রেট কোড! এইটৈই তো আপনাকে দিতে যাচ্ছিলুম, আর ঠিক এই সময় ময়ূরটা চেঁচামেচি লাগিয়ে সব ভঙ্গুল করে দিলে।’

আমি লক্ষ করছিলাম লালমোহনবাবুর ঘড়িটা। সত্যি, এই ঘড়িটাই তো দেখেছিলাম হাত থেকে।

লালমোহনবাবু সুটকেস খুলে তার খাপ থেকে একটা কোঁকড়ানো কাগজের টুকরো বার করে ফেলুদাকে দিল। বুঝলাম কাগজটাকে দলা পাকানো হয়েছিল, সেটা আবাব সোজা করা হয়েছে।

ফেলুদার পাশে গিয়ে কেরোসিনের আলোতে দেখলাম কাগজটায় পেনসিল দিয়ে লেখা আছে—

IP 1625+U

U—M

ফেলুদা ভীষণভাবে ভুক কুচকে কাগজটার দিকে চেয়ে রইল। আমি এই অ্যালজেব্রার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না, যদিও লালমোহনবাবু দুবার ফিস ফিস করে বললেন, ‘হাইলি সাসপিশাস।’

ফেলুদা ভাবছে, আর ভাবতে ভাবতে আপন মনে বিড়বিড় করছে—

‘যোল শ’ পঁচিশ... যোল শ’ পঁচিশ... এই সংখ্যাটা কোথায় যেন দেখেছি রিসেন্টলি ?...’

‘ট্যাক্সির নম্বর?’ আমি জিজ্ঞেস করলাম।

‘উহ... যোল শ’ পঁচিশ... সিঙ্ক্রিন টোয়েন্টি ফা—’

ফেলুদা কথাটা শেষ না করে এক বটকায় থলে থেকে ব্র্যাড্শ টাইম টেবলটা বার করল। পাতা ভাঁজ করা জায়গাটা খুলে পাতার উপর থেকে নিচের দিকে আঙুল চালিয়ে এক জায়গায় এসে থামল।

‘ইয়েস। সিঙ্ক্রিন টোয়েন্টি ফাইভ হচ্ছে অ্যারাইভ্যাল।’

‘কোথায়?’ জিজ্ঞেস করলাম।

‘পোকরানে।’

বললাম, ‘তা হলে তো Pটা পোকরান হতে পারে। পোকরানে সিঙ্ক্রিন টোয়েন্টি ফাইভ। আর বাকিটা?’

‘বাকিটা... বাকিটা... আই পি আবার প্লাস ইউ।’

‘তলার Mটা কিন্তু ভালো লাগছে না মশাই,’ লালমোহনবাবু বললেন। ‘M বললেই কিন্তু মার্ডার মনে পড়ে।’

‘দাঁড়ান মশাই—আগে ওপরেরটাৰ পাঠোদ্ধাৰ কৰি।’

লালমোহনবাবু বিড়বিড় করে বললেন, ‘মার্ডার... মিস্ট্ৰি... ম্যাসাকার মনস্টার...’

ফেলুদা কোলের উপর কাগজটা খোলা রেখে ভাবতে লাগল। লালমোহনবাবু গজার টিনটা বার করে আমাদের আবাব অফার করলেন।

আমি একটা নেবাব পর ফেলুদার দিকে টিনটা এগিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, ‘ভালো কথা—আমিই যে আপনার জানালার কাছে গিয়েছিলুম, সেটা কী করে বুঝলেন স্যার? আপনি কি আমায় দেখে ফেলেছিলেন নাকি?’

ফেলুদা একটা গজা তুলে নিয়ে বললেন, ‘পাগড়িটা খোলাৰ পৰ বোধহয় চুলটা আঁচড়াননি। ঘটনাটাৰ কিছুক্ষণ পৰ যখন আপনার সঙ্গে দেখা হয়, তখন আপনার চুলেৰ অবস্থাটা দেখেই সন্দেহ হয়েছিল।’

ভদ্রলোক হেসে বললেন, ‘কিছু মনে কৰবেন না স্যার আপনাকে কিন্তু সেন্ট-পারসেন্ট গোয়েন্দা বলেই মনে হচ্ছে।’

ফেলুদা এবাব তাৰ একটা কাৰ্ড বাব করে লালমোহনবাবুকে দিল।
লালমোহনবাবুৰ দৃষ্টি উত্তুসিত হয়ে উঠল।

‘ওঃ!—প্ৰদোষ সি মিটাৰ! এটা কি আপনাৰ রিয়্যাল নাম?’
‘আজ্জে হাঁ। সন্দেহেৰ কোনো কাৰণ আছে কি?’
‘না, মানে ভাৰছিলাম কী অন্তুত নাম?’

‘অন্তুত?’
‘অন্তুত নয়? দেখুন না কেমন মিলে যাচ্ছে।—প্ৰদোষ—প্ৰ হচ্ছে
প্ৰফেশন্যাল, দোষ হচ্ছে ক্ৰাইম আৰ সি হচ্ছে—টু সি—অৰ্থাৎ দেখা—অৰ্থাৎ
ইনভেস্টিগেট। অৰ্থাৎ প্ৰদোষ সি ইজ ইকুয়াল টু প্ৰফেশন্যাল ক্ৰাইম
ইনভেস্টিগেটৰ।’

‘সাধু সাধু!—আৱ মিটাৰ?’
‘মিটাৰটা একটু ভেবে দেখতে হবে,’ লালমোহনবাবু মাথা চুলকে বললেন।
‘কিম্বা ভাৱাৰ দৰকাৰ নেই। আমি বলে দিচ্ছি। ট্যাক্সি মিটাৰ জানেন তো?
সেই মিটাৰ—অৰ্থাৎ ইনভিকেটৰ। তাৰ মানে শুধু ইনভেস্টিগেশন নয়, অলসো
ইনভিকেশন। ক্ৰাইমেৰ তদন্তই শুধু নয়, ক্ৰিমিন্যাল বাব করে তাৰ দিকে অঙ্গুলি
নিৰ্দেশ। হল তো?’

লালমোহনবাবু ‘ব্ৰাভো’ বলে হাততালি দিয়ে উঠলেন। ফেলুদা কিঞ্চিৎ আৰাব
সিৱিয়াস। আৱেকবাৰ হাতেৰ কাগজটাৰ দিকে দেখে সেটাকে সাটোৱে বুক-পকেটে
গুঁজে রেখে সিগাৰেটো বাব করে বলল, ‘I এবং U-এৰ অবিশ্যি খুব সহজ মানে
হতে পাৰে। I অৰ্থাৎ আমি এবং U অৰ্থাৎ তুমি, কিঞ্চিৎ প্লাস ইউ-টা গোলমেলে।
আৱ দ্বিতীয় লাইনটাৰ কোনো কিনারাই কৰা যাচ্ছে না।...তোপসে, তুই বৱং
হোল্ড-অলটা বিছিয়ে শুয়ে পড়। আপনিও—লালমোহনবাবু। এখনো তো সাড়ে
সাত ঘণ্টা দেৱি ট্ৰেন আসতে। আমি আপনাদেৱ ঠিক সময়ে তুলে দেবো।’

কথাটা মন্দ বলেনি ফেলুদা। শুধু স্ট্রাপ দুটো খুলে হোল্ড-অলটাকে বিছিয়ে
প্ল্যাটফৰ্মেৰ উপৰ শুয়ে পড়লাম। চিত হওয়ামাত্ৰ আকাশেৰ দিকে চোখ গেল,
আৱ তক্ষনি বুবাতে পাৱলাম যে, একসঙ্গে এত তাৰা আমি জীবনে কখনো
দেখিনি। মৰণভূমিতে কি আকাশটা তা হলে একটু বেশি পৰিকাৰ থাকে? তাই
হবে।

আকাশ দেখতে দেখতে ক্ৰমে চোখটা ঘুমে বুজে এল। একবাৰ শুনলাম
লালমোহনবাবু বলছেন, ‘উটে চড়লে গাঁটে বেশ ব্যথা হয় মশাই।’ আৱেকবাৰ
যেন বললেন, ‘এম ইজ মাৰ্ডৰি।’ এৱ পৱ আৱ কিছু মনে নেই।

ঘুম ভাঙল ফেলুদাৰ ঝাঁকানিতে।
‘তোপসে—উঠে পড়—গাড়ি আসছে।’

তড়ক করে উঠে হোল্ড-অল বেঁধে ফেলতে ফেলতে ট্ৰেনেৰ হেড-লাইট দেখা
গৈল।

॥ ১০ ॥

মিটাৰ গেজেৰ প্যাসেঞ্জাৰ গাড়ি। কামৰাণ্ডলো তাই খুবই ছোট। যাত্ৰীও বেশি
নেই, তাই একটা খালি ফাৰ্স্ট ক্লাস। পাওয়াতে খুব একটা অবাক লাগল না।

কামৰা অন্ধকাৰ; হাতড়িয়ে সুইচ বাব করে টিপে কোনো ফল হলো না।
লালমোহনবাবু বললেন, ‘সভ্য দেশেই ৱেলেৱ বাল্ব লোপাট হয়ে যায়, ডাকাতৰে
দেশে তো ওটা আশা কৰাই ভুল।’

ফেলুদা বলল, ‘তোৱা দু’জন দু’দিকেৰ বেঁধিতে শুয়ে পড়। আমি মাঝখানেৰ
মেঘেতে শতৰাঞ্চি পেতে ম্যানেজ কৰছি। বাড়া ছ’ ঘণ্টা সময় আছে হাতে, দিব্য
গড়িয়ে নেওয়া যাবে।’

লালমোহনবাবু একবাৰ একটু আপত্তি কৰেছিলেন—‘আপনি আবাৰ ক্লাৰে
কেন মশাই, আমাকে দিন না?’—কিন্তু ফেলুদা একটু কড়া কৰে ‘মোটেই না’ বলাতে
ভদ্ৰলোক বোধহয় গাঁটোৱে ব্যথাৰ কথা ভেবেই বেঁধিতে হোল্ড-অল খুলে পেতে
নিলেন।

গাড়ি ছেড়ে প্ল্যাটফৰ্ম পেৱোনোৰ এক মিনিটেৰ মধ্যেই কে একজন আমাদেৱ
দৰজাৰ পা-দানিতে লাফিয়ে উঠল। লালমোহনবাবু হেসে বলে উঠলেন, ‘আৱে
বাবা, গাড়ি বিজাৰ্ভ হ্যায়। জেনানা কাম্বৰা হ্যায়।’

এবাৱে বাড়ক কৰে আমাদেৱ দৰজাটা খুলে গৈল, আৱ একটা উজ্জল টচেৰ
আলো জুলে উঠে কয়েক মুহূৰ্তেৰ জন্য আমাৰ চোখ ধৰ্মিয়ে দিল।

সেই আলোতেই দেখলাম, একটা হাত আমাদেৱ দিকে এগিয়ে এসেছে, আৱ
সে হাতে চকচক কৰছে একটা লোহাৰ নলওয়ালা জিনিস।

আমাদেৱ তিনজনেৰই হাত মাথাৰ উপৰ উঠে গৈল।

‘এবাৱ উঠুন তো বাবুৱা! দৰজা খোলা আছে, একে একে নেমে পড়ুন তো
বাইৱে।’

এ যে মন্দাৰ বোসেৱ গলা!

‘গাড়ি যে চলছে!—কাঁপা গলায় বলে উঠলেন লালমোহনবাবু।

‘শাট আপ! মন্দাৰ বোস গৰ্জন কৰে দু’পা এগিয়ে এলেন। টচেৰ আলোটা
অনৱৰত আমাদেৱ তিনজনেৰ উপৰ ঘোৱাফেৱা কৰছে। ‘ন্যাকামো হচ্ছে?
কলকাতায় চলন্ত ট্ৰাম-বাস থেকে ওঠানামা কৰা হয় না? উঠুন উঠুন—’

কথাটা শেষ হতে না হতে এমন একটা ব্যাপার ঘটে গৈল, যেটা আমি জীবনে

কোনোদিন ভুলব না । ফেলুদার ডান হাতটা একটা বিদ্যুতের শিখার মতো নেমে এসে তার নিজের শতরঞ্জির সামনের দিকটা খাম্চে ধরে মারল একটা প্রচণ্ড হাঁচকা টান—আর তার ফলে মন্দার বোসের পা দুটো সামনের দিকে হড়কে ছাঁকে শূল্যে উঠে গিয়ে উপরের শরীরটা এক ঝটকায় চিতিয়ে দড়াম করে লাগল ছাঁকে শূল্যে উঠে গিয়ে উপরের শরীরটা এক ঝটকায় চিতিয়ে দড়াম করে লাগল কামৰার দেয়ালে । আর সেই সঙ্গে তার ডান হাত থেকে রিভলভারটা ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে পড়ল লালমোহনবাবুর বেঞ্জিতে আর বাঁ হাত থেকে জ্বলন্ত টর্চটা ফসকে গিয়ে পড়ল মেঝেতে ।

মন্দার বোসের পুরো শরীরটা মাটিতে পড়বার আগেই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে ফেলুদা—তার হাতে কোটের ভিতর থেকে বার করা তার নিজের রিভলভার ।

‘গেট আপ !’ ফেলুদা মন্দার বোসকে উদ্দেশ করে গর্জিয়ে উঠল ।

মিটার গেজের গাড়ি প্রচণ্ড শব্দ করে দুলে দুলে এগিয়ে চলেছে মর্কৃমির মধ্যে দিয়ে । লালমোহনবাবু ইতিমধ্যে মন্দারবাবুর রিভলভারটা তার জাপান এয়ার লাইনস-এর ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন ।

‘উঠুন বলছি !’ ফেলুদা আবার গর্জিয়ে উঠল ।

টর্চটা মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে, অথচ বুঝতে পারছি সেটা মন্দার বোসের উপর ফেলা উচিত—নইলে লোকটা অঙ্কারের সুযোগ নিয়ে একটা গোলমাল করতে পারে । এই কথাটা ভেবে টর্চটা তুলতে গিয়েই হয়ে গেল সর্বনাশ ; আর সেটা এমনই সর্বনাশ যে সেটার কথা ভাবতে এখনো আমার রঙ্গ ঠাণ্ডা হয়ে যায় । মন্দার বোসের শরীরের উপর দিকটা ছিল আমার বেঞ্জির দিকে । আমি যেই টর্চটা তুলতে নিচু হয়েছি, ভদ্রলোক তৎক্ষণাত্মে একটা আচমকা ঝাঁপ দিয়ে আমাকে জাপটে ধরে আমাকে সুন্দ উঠে দাঁড়ালেন । তার ফলে মন্দার বোস আর ফেলুদার মাঝখানে পড়ে গেলাম আমি । এই চৰম বিপদের সময়েও মনে মনে লোকটার শয়তানি বুদ্ধির তারিফ না করে পারলাম না । বুঝতে পারলাম, ফেলুদা প্রথম রাউণ্ডে আশ্চর্য ভাবে জিতলেও, দ্বিতীয় রাউণ্ডে বেকায়দায় পড়ে গেছে । এটাও বুবলাম যে এই অবস্থাটার জন্য দায়ী একমাত্র আমি ।

মন্দার বোস আমাকে পিছন থেকে খাঁকড়ে ধরে সামনের দিকে রেখে খোলা দরজাটার দিকে পিছোতে লাগলেন । কাঁধের কাছটায় কী যেন একটা ফুটছে । বুবলাম সেটা মন্দার বোসের হাতের একটা নখ । নীলুর হাতের যন্ত্রণার কথা মনে পড়ে গেল ।

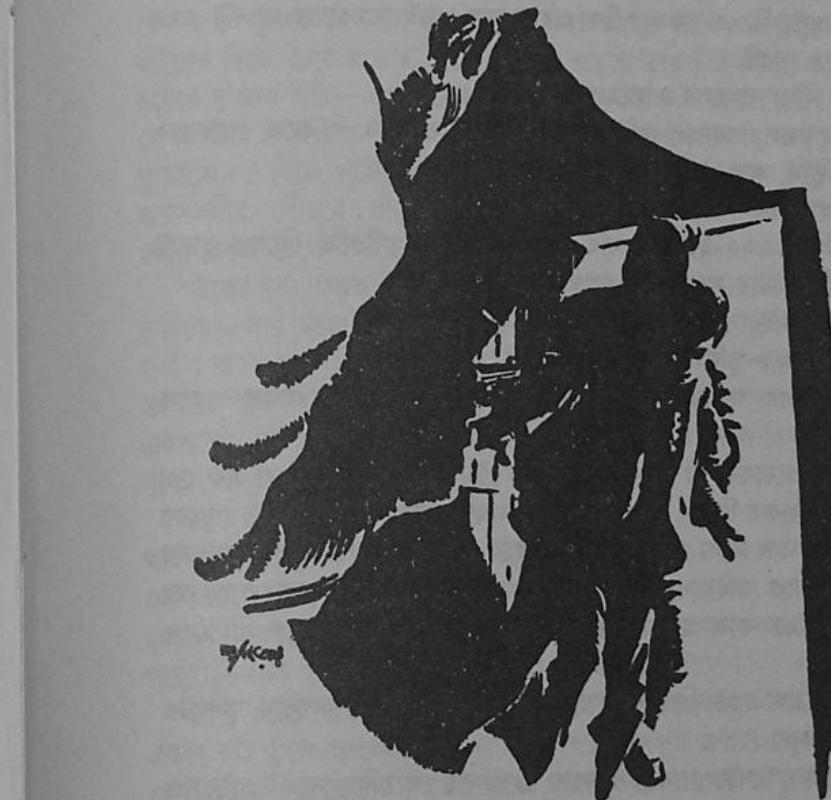
ক্রমে বুবলাম দরজার খুব কাছে এসে গেছি । কারণ বাইরে থেকে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে আমার বাঁ কাঁধটায় লাগছে ।

আরো এক পা পিছোলেন মন্দার বোস । ফেলুদা রিভলভার উঁচিয়ে রয়েছে

কিন্তু কিছু করতে পারছে না । জ্বলন্ত টর্চটা এখনো ট্রেনের দোলার সঙ্গে সঙ্গে মেঝের এদিকে ওদিকে গড়াচ্ছে ।

হঠাৎ পিছন থেকে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে আমি ফেলুদার উপর হমড়ি খেয়ে পড়লাম । আর তার পরেই একটা শব্দ পেলাম যাতে বুবলাম যে, মন্দার বোস চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়েছেন । তিনি বাঁচলেন কী মরলেন, সেটা বোঝার কোনো উপায় নেই ।

ফেলুদা দরজা দিয়ে গলা বাড়িয়ে কিছুক্ষণ দেখে ফিরে এল । তারপর যথাস্থানে রিভলভারটাকে চালান দিয়ে নিজের জায়গায় বসে পড়ে বলল,



‘দু-একটা হাড়গোড় অন্তত না ভাঙলে খুব আক্ষেপের কারণ হবে ।’
লালমোহনবাবু যেন একটু অতিরিক্ত জোরেই হেসে উঠে বললেন,

‘বলেছিলাম না মশাই, লোকটা সাম্পৰ্শাস।’

আমি এর মধ্যে ফ্লাস্ক থেকে খানিকটা জল খেয়ে নিয়েছি। বুকের ধড়ফড়ানিটা আস্তে আস্তে কমছিল, নিষ্ঠাস-প্রশ্নাস স্বাভাবিক হয়ে আসছিল। কী ভীষণ একটা ঘটনা কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল, সেটা যেন এখনো ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছিলাম না।

ফেলুদা বলল, ‘শ্রীমান্ তপেশ ছিলেন বলে লোকটা এ-যাত্রা পার পেয়ে গেল, নইলে বন্দুকটা নাকের সামনে ধরে ওর পেট থেকে সব বার করে নিতাম। অবিশ্বি—’

ফেলুদা থামল। তারপর বলল, ‘খুব বড় বিপদের সামনে পড়লেই দেখছি আমার মাথাটা বিশেষ রকম পরিষ্কার হয়ে যায়। ওই সংকেতের মানেটা এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছি।’

‘বলেন কী! বললেন লালমোহনবাবু।

ফেলুদা বলল, ‘আসলে খুবই সহজ। আই হচ্ছে আমি, পি হচ্ছে পোকরান, ইউ হচ্ছে তুমি, আর এম হচ্ছে মিডির—প্রদোষ মিডির।’

‘আর প্লাস-মাইনাস?’

‘আই পি ১৬২৫+ইউ। অথবা আমি পোকরান পৌঁচছি বিকেল চারটে পঁচিশে, তুমি আমার সঙ্গে এসে যোগ দিও।’

‘আর ইউ মাইনাস এম?’

‘আরো সহজ—তুমি মিডিরকে কাটাও।’

‘কাটাও! ধুৱা গলায় বললেন লালমোহনবাবু। তার মানে মাইনাস হচ্ছে মার্ডারি?’

‘মার্ডারের প্রয়োজন কী? মাঝপথে চলন্ত ট্রেন থেকে নামিয়ে দিলে এক তো জথম হ্বার সন্তান ছিলই, তার উপর চৰিশ ঘন্টা অপেক্ষা করতে হত পরের ট্রেনের জন্য। তার মধ্যে ওদের কার্যসন্দৰ্ভ হয়ে যেত। দুরকারটা ছিল আমাদের জয়সলমীর থেকে মাইনাস করা। সেই জন্মেই তো রাস্তায় এত পেরেকের ছড়াচাঢ়ি। সেটায় কাজ হয়নি বুঝতে পেরে শেষটায় ট্রেন থেকে নামানোর চেষ্টা।’

এতক্ষণে হঠাৎ একটা জিনিস খেয়াল করলাম। ফেলুদাকে বললাম, ‘চুক্টের গন্ধ পাচ্ছি ফেলুদা।’

ফেলুদা বলল, ‘সেটা লোকটা কামরায় ঢোকামাত্র পেয়েছি। সার্কিট হাউসেও কোনো ব্যক্তি যে চুক্ট খাচ্ছেন সেটা আগেই বুঝেছি। মুকুলের হাতের সেই রাঙ্গাটা চুক্টেই জড়ানো থাকে।’

‘আর ভদ্রলোকের একটা নখ ভীষণ বড়ো। আমার কাঁধটা বোধহয় নীলুর

হাতের মতোই ছড়ে গেছে।’

‘কিন্তু যিনি ইন্স্ট্রাকশন দিচ্ছেন সেই আই-টি কিনি?’ জিজ্ঞেস করলেন লালমোহনবাবু।

ফেলুদা গভীর গলায় বলল, ‘সার্কিট হাউসে পাওয়া ইংরিজিতে লেখা হমকি চিঠির সঙ্গে এই সংকেতের লেখা মিলিয়ে তো একটা লোকের কথাই মনে হয়।’

‘কে?’ আমরা দু’জনে এক সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম।

‘ডক্টর হেমাসমোহন হাজরা।’

রাত্রে সবসুন্দ বোধহয় ঘন্টা তিনেক ঘুমিয়েছি। যখন ঘুম ভাঙল তখন বাইরে রোদ। ফেলুদাকে দেখলাম মেঝে থেকে উঠে আমার বেঢ়ির এক কোণে বসে বাইরের দিকে চেয়ে রয়েছে। তার কোলে রয়েছে তার নীল খাতা, আর হাতে রয়েছে দু’খানা চিঠি—একটা সেই ইংরিজিতে হমকি আর অন্যটা ডক্টর হাজরার লেখা চিঠি। ঘড়িতে দেখি পৌনে সাতটা। লালমোহনবাবু এখনো দিব্য ঘুমোচ্ছেন। খিদে পাছিল ভীষণ, কিন্তু গজা খেতে আর মন চাইছিল না। জয়সলমীর পৌছবে প্রায় ন’টায়। বুকুলাম এই দু’ ঘন্টা সময় খিদেটাকে কোনোরকম চেপে রাখতে হবে।

বাইরের দৃশ্য অস্তুত মাইলের পর মাইল অল্প চেউ-খেলানো জমি দেখা যাচ্ছে দু’দিকে—তার মধ্যে একটা বাড়ি নেই, একটা লোক নেই, একটা গাছ পর্যন্ত নেই। অথচ মরুভূমি বলা যায় না, কারণ, বালি মাঝে মাঝে থাকলেও, বেশির ভাগটাই শুকনো সাদা ঘাস, লালচে মাটি আর লাল-কালো পাথরের কুচি। এরপরেও যে আবার একটা শহর থাকতে পারে সেটা ভাবলে বিশ্বাস হতে চায় না।

একটা স্টেশন এল—জেঠা চন্দন। আমি ব্র্যাক্ষ খুলে দেখলাম এটার পর থাইয়ৎ হামিৰা, আর তার পরেই জয়সলমীর। স্টেশনে দোকান-টোকান নেই, লোকজন নেই, কুলি নেই, ফেরিওয়ালা নেই। সব মিলিয়ে মনে হয় যেন পথিকীর কোনো একটা অনাবিকৃত জায়গায় এই ট্রেনটা কেমন করে জানি এসে পড়েছে—ঠিক যেমনি করে রকেট গিয়ে হাজির হয় চাঁদে।

এবার গাড়ি ছাড়ার মিনিটখানেক পরেই লালমোহনবাবু উঠে পড়ে বিরাট একটা হাই তুলে বললেন, ‘ফ্যান্টাস্টিক স্বপ্ন দেখলুম মশাই। একদল ডাকাত, গোঁফগুলো সব ভেড়ার শিশের মতো পাঁচানো—তাদের আমি হিপনোটাইজ করে নিয়ে চলেছি একটা কেল্লার ভিতর দিয়ে। সেই কেল্লায় একটা সুড়ঙ্গ। তাই দিয়ে একটা আন্দরগাউড় চেম্বারে পৌঁছালুম। জানি সেখানে গুপ্তধন আছে, কিন্তু গিয়ে দেখি একটা উট মেঝেতে বসে জিভেগজা থাচ্ছে।’

‘গজা থাচ্ছে সেটা জানলেন কী করে?’ ফেলুদা জিজ্ঞেস কৰল। ‘হ' করে দেখাল?’

‘আৱে না মশাই। স্পষ্ট দেখলুম আমাৰ দালদার টিনটা খোলা পড়ে আছে উত্তোৱ ঠিক সামনে।’

থাইয়ৎ হামিৱা স্টেশন পেৱনোৱে কিছুক্ষণ পৱেই দূৰে আবছা একটা পাহাড় চোখে পড়ল। এ-ও সেই রাজস্থানী চাপটা টেব্ল মাউন্টেন। আমাদেৱ ট্ৰেনটা মনে হল সেই পাহাড়েৱ দিকে যাচ্ছে।

আটটা নাগাদ মনে হল পাহাড়টাৱ উপৱ একটা কিছু রয়েছে।

ক্ৰমে বুৰাতে পাৱলাম, সেটা একটা কেল্লা। সমস্ত পাহাড়েৱ উপৱটা জুড়ে মুকুটেৱ মতো বসে আছে কেল্লাটা—তাৱ উপৱ সোজা গিয়ে পড়েছে বকঝকে পৱিক্ষাৱ সকালেৱ ঝলমলে রোদ। আমাৰ মুখ থেকে একটা কথা আপনা থেকেই বেৱিয়ে পড়ল—

‘সোনাৰ কেল্লা।’

ফেলুদা বলল, ‘ঠিক বলেছিস। এটাই হল রাজস্থানেৱ একমাত্ৰ সোনাৰ কেল্লা। বাটিটা দেখেই সন্দেহ হয়েছিল। তাৱপৱ গাইডবুক দেখে কন্ফাৰ্মড হলাম। বাটিটা যে পাথৱেৱ তৈৱি, কেল্লাও সেই পাথৱেৱ তৈৱি—ইয়েলো স্যান্ডস্টোন। মুকুল যদি সত্যি কৱেই জাতিস্মৰ হয়ে থাকে, আৱ পূৰ্বজন্ম বলে যদি সত্যিই কিছু থেকে থাকে, তাহলে মনে হয় ও এখনেই জন্মেছিল।’

আমি বললাম, ‘কিন্তু ডষ্টেৱ হাজৱা কি সেটা জানেন?’

ফেলুদা এ কথাৱ কোনো উত্তোৱ না দিয়ে একদষ্টে কেল্লার দিকে চেয়ে থেকে বলল, ‘জনিস তোপসে—অস্তুত এই সোনালি আলো। মাকড়সাৱ জালেৱ নকশাটা চোখেৱ সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এই আলোয়।’

॥ ১১ ॥

জয়সলমীৱ স্টেশনে নেমে প্ৰথমেই যেটা কৱলাম সেটা হচ্ছে একটা খাবাৱেৱ দোকানে গিয়ে চা আৱ একটা নতুন রকমেৱ মিষ্টি খেয়ে খিদেটাকে মিষ্টিয়ে নিলাম। ফেলুদা বলল—মিষ্টি জিনিসটা নাকি দৱকাৱ—ওতে থুকোজ থাকে—সামনে পৱিশ্বম আছে—থুকোজে এনাজি দেবে।

স্টেশনেৱ বাইৱে এসে দেখলাম গাড়িটাড়িৱ কোনো বালাই নেই। একটা জীপ আছে দাঁড়িয়ে, তবে সেটা যে ভাড়াৱ নয়, সেটা দেখেই বোৰা যায়। টাঙ্গা একা সাইক্ল-রিক্ষা ট্যাক্সি কিছু নেই। আমাৰ যখন ট্ৰেন থেকে নেমেছিলাম তখন একটা কালো অ্যাম্বাসাদৰ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম; এখন দেখছি সে

গাড়িটাও নেই। ফেলুদা বলল, ‘জায়গাটা ছেট সেটা বোৰাই যাচ্ছে। কাজেই এক জায়গা থেকে আৱেক জায়গাৰ দূৰত্ব বেশি নয় নিশ্চয়ই। ডাকবাংলো একটা আছে সেটা গাইড-বুকে লিখেছে। আপাতত সেটাৱ খৌজ কৱা যাক।’

যে যাৱ মালপত্ৰৰ হাতে নিয়ে স্টেশন থেকে বেৱিয়ে পড়লাম। কাছেই একটা পেট্ৰোল স্টেশনে একটা লোককে জিজ্ঞেস কৱতেই সে রাস্তা বাতলে দিল। বুৰালাম যে ডাকবাংলোয় যাবাৰ জন্য পাহাড়ে উঠতে হবে না, সেটা পাহাড়েৱ দক্ষিণ দিকে সমতল জমিৱ উপৱেই। হাঁটতে হাঁটতে রাস্তাৱ বালিৱ উপৱ টায়াৱেৱ দাগ দেখে ফেলুদা বলল, ‘অ্যাম্বাসাদৰটাও এই রাস্তাতেই গেছে বলে মনে হচ্ছে।’

প্ৰায় মিনিট পনেৱোহাঁটাৱ পৱ একটা একতলা বাড়িৱ সামনে কাঠেৱ ফলকে লেখা দেখে বুৰালাম আমাৰ ডাকবাংলোয় এসে গেছি। বাংলোৱ সামনেই দেখি কালো অ্যাম্বাসাদৰটা দাঁড়িয়ে আছে।

আমাদেৱ দেখতে পেয়েই বোধহয় একটা খাকি সার্ট খাটো ধৃতি আৱ পাকানো পাগড়ি পৱা বুড়ো লোক পাশেৱ একটা আউট-হাউস থেকে বেৱিয়ে আমাদেৱ দিকে এগিয়ে এল। ফেলুদা তাকে হিন্দিতে জিজ্ঞেস কৱল সে চৌকিদাৰ কিনা। লোকটা মাথা নেড়ে হাঁ বুবিয়ে দিল। তাৱ চাউনি দেখে বুৰালাম যে আমাদেৱ আসাটা তাৱ কাছে অপ্ৰত্যাশিত, আৱ ব্যাপারটা সে একটু সন্দেহেৱ চোখে দেখছে, কাৰণ পাৱিশন ছাড়া বাংলোয় থাকতে দেয় না এটা আমি জানি।

ফেলুদা বাংলোয় থাকাৱ প্ৰশ্নটাই তুলল না। সে বলল যে আপাতত সে শুধু মালগুলো রেখে যেতে চায়, তাৱপৱ পাৱিশনেৱ চেষ্টা দেখবে। চৌকিদাৰ বলল সেটাৱ জন্য রাজাৰ সেক্রেটাৱিৰ কাছে যেতে হবে। রাজবাড়ি কোনদিকে সেটাৱ সে হাত তুলে দেখিয়ে দিল। দূৰে গাছপালাৱ মাথাৱ উপৱ দিয়ে হলদে পাথৱেৱ তৈৱিৱ প্যালেসেৱ খানিকটা অংশও দেখতে পেলাম।

চৌকিদাৰ মালগুলো রাখতে দিতে কোনো অপত্তি কৱল না। তাৱ একটা কাৰণ অবিশ্য এই যে, ফেলুদা ইতিমধ্যে তাৱ হাতে একটা কড়কড়ে দু' টাকাৱ নোট গুঁজে দিয়েছে।

একটা ঘৰেৱ মধ্যে সুটকেস বিছানা রেখে ফ্লাক্সগুলোতে জল ভৱে কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে চৌকিদাৰকে জিজ্ঞেস কৱা হল কেল্লায় যেতে হলে কোন রাস্তা দিয়ে যেতে হবে।

‘ইউ ওয়ান্ট টু গো টু দ্য ফোৰ্ট?’

প্ৰশ্নটা এল বারান্দাৱ ও-মাথা থেকে। একটি ভদ্ৰলোক ওদিকেৱ একটা ঘৰ থেকে সবেমাত্ৰ বেৱিয়েছেন। ফৰ্মা রং, বয়স চলিশেৱ বেশি নয়, খুব মন দিয়ে ছাঁটা সৱৰ একটা গৌফ চোখা নাকেৱ নিচে। এবাৱ আৱেকটু বেশি বয়সেৱ

আরেকটি ভদ্রলোক ঘর থেকে বেরিয়ে প্রথম ভদ্রলোকটির পাশে দাঁড়ালেন। এর হাতে একটা লাঠি—যেমন লাঠি আমরা যোধপুরের বাজারে দেখেছি—আর গায়ে কেমন যেন একটা বেখাঙ্গা কালো স্যুট। এরা দু'জনে কোন্ দেশী সেটা বোৰা গেল না। লক্ষ করলাম দ্বিতীয় ভদ্রলোকটি একটু যেন খৌড়াচ্ছেন, আর সেই জন্যেই বোধহয় তার লাঠির দরকার হচ্ছে।

ফেলুদা বলল, ‘ফোটটা একবাৰ দেখতে পাৱলে মন্দ হত না।’

‘কাম অ্যালঙ্গ উইথ আস্—উই আৱ গোয়িং দ্যাট ওয়ে।’

ফেলুদা কয়েক সেকেন্ডে জন্য কী জানি ভোবে যেতে রাজী হয়ে গেল।

‘থ্যাক ইউ ভেৱি মাচ। দ্যাট ইজ ভেৱি কাইন্দ অফ ইউ।’

আমরা গাড়িৰ দিকে যাবাৰ সময় লালমোহনবাবু ফিসফিস কৰে বললেন, ‘এৱা আৱাৰ চলন্ত মোটৱাগাড়ি থেকে নামিয়ে দিতে চাইবে না তো ?’

গাড়ি কেল্লাৰ দিকে রওনা দিল। লাঠিওয়ালা ভদ্রলোক জিজ্ঞেস কৰলেন, ‘আৱ ইউ ফ্ৰম ক্যালকাটা ?’

ফেলুদা বলল, ‘হাঁ।’

বাঁ দিকে বালিৰ উপৱ দূৰে দেখলাম দেবীকৃষ্ণের মতো কতগুলো স্মৃতিস্তম্ভ রয়েছে। ফেলুদা বলল ও জিনিসটা নাকি রাজহানেৰ সব শহৰেই রয়েছে।

আমাদেৱ গাড়ি ক্ৰমে পাহাড়েৰ গা বেয়ে চড়াই উঠতে আৱন্ত কৰল।

মিনিটখানেক ওঠাৰ পৱ পিছন থেকে আরেকটা গাড়িৰ শব্দ পেলাম। গাড়িটা ক্ৰমাগত হৰ্ণ দিচ্ছে। অথচ আমরা যে খুব আন্তে চলছিলাম তাও নয়। তাহলে লোকটা বাৱ বাৱ হৰ্ণ দিচ্ছে কেন ?

ফেলুদা দুই ভদ্রলোকেৰ সঙ্গে পিছনে বসেছিল। সে হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে কাঁচেৰ মধ্যে দিয়ে দেখে নিয়ে আমাদেৱ গাড়িৰ ড্ৰাইভাৱকে উদ্দেশ কৰে বলে উঠল, ‘ৱোককে, ৱোককে !’

আমাদেৱ গাড়ি রাস্তাৰ এক পাশে থামতেই আমাদেৱ ডান পাশে এস দাঁড়াল একটা ট্যাক্সি—তাৱ স্টিয়াৰিং ধৰে হাসিমুখে বসে আমাদেৱ সেলাম জানাচ্ছেন গুৱবচন সিং।

আমরা তিনজনেই নেমে পড়লাম। ফেলুদা ভদ্রলোক দু'জনকে ইংৰিজিতে বলল—আপনাদেৱ অনেক ধন্যবাদ। আমাদেৱ নিজেদেৱ ট্যাক্সিটা পথে খারাপ হয়ে গিয়েছিল—সেটা এসে পড়েছে।

গুৱবচন বলল ভোৱ সাড়ে ছটায় নাকি একটা চেনা ট্যাক্সি জয়সলমীৰ থেকে ফিরছিল—তাৱ কাছ থেকে স্পেয়াৰ চেয়ে নিয়েছে। নবহই মাইল রাস্তা নাকি সে দু' ঘণ্টায় এসেছে। এখানে এসে পেট্ৰোল স্টেশনটায় দাঁড়িয়ে ছিল, হঠাৎ কালো অ্যাস্ফাল্টৱার ভিতৰ আমাদেৱ দেখতে পায়।

আৱো খানিকটা পথ যেতেই আমরা একটা বাজাৱেৰ মধ্যে এসে পড়লাম। চারদিকে দোকানপাট গিজগিজ কৰছে, লাউডস্পীকাৰে হিন্দী ফিল্মেৰ গান হচ্ছে, একটা ছোট সিনেমা হাউসেৰ বাইৱে আবাৰ হিন্দী ছবিৰ বিজ্ঞাপনও রয়েছে।

‘আপলোগ কিল্লা দেখনে মাংতা ?’ গুৱবচন সিং জিজ্ঞেস কৰল। ফেলুদা হাঁ বলতে গুৱবচন সিং ট্যাক্সি থামল। ‘ইয়ে হায় কিল্লেকা গেট।’

ডান দিকে চেয়ে দেখি এক পেঞ্জায় ফটক—তাৱপৰ পাথৰে বাঁধানো রাস্তা চড়াই উঠে গেছে আরেকটা ফটকেৰ দিকে। বুৰলাম, এটা বাইৱেৰ গেট আৱ ভেতৱেৱটা আসল গেট। দ্বিতীয় গেটেৰ পিছন থেকেই খাড়াই উঠে গেছে জয়সলমীৰেৰ সোনাৰ কেল্লা।

গেটেৰ বাইৱে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখলেই প্ৰহৱী বলে বোৱা যায়। ফেলুদা তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস কৰল সকালেৰ দিকে কোনো বাঙলী ভদ্রলোক একটা ছোট ছেলেকে সঙ্গে কৰে কেল্লা দেখতে এসেছিলেন কিনা। ফেলুদা হাত দিয়ে মুকুলেৰ হাইটাও বুঝিয়ে দিল।

—আয়া থা, কিন্তু এখন নেই, চলে গেছে।

—কখন ?

—আধ ঘণ্টা হৰে।

—গাড়িতে এসেছিল ?

—হাঁ—এক টেক্সি থা।

—কোন দিকে গেছে বলতে পাৱ ?

প্ৰহৱী পশ্চিম দিকেৰ রাস্তাটা দেখিয়ে দিল। আমরা সেই রাস্তা ধৰে অলিগলি দোকানপাটেৰ মধ্যে দিয়ে চলতে লাগলাম। লালমোহনবাবু সামনে বসেছেন গুৱবচনেৰ পাশে, আমি আৱ ফেলুদা পিছনে। কিছুক্ষণ চলাৰ পৱ ফেলুদা হঠাৎ প্ৰশ্ন কৰল, ‘আপনাৰ অস্ত্ৰটা আনেননি তো সঙ্গে ?’

লালমোহনবাবু অন্যমনস্কতাৰ মধ্যে হঠাৎ প্ৰশ্ন শুনে চমকে বললেন, ‘ভোপালি ? ইয়ে-মানে-গিয়ে-আপনাৰ—ভোজালি ?’

‘হাঁ। আপনাৰ নেপালী ভোজালি।’

‘সে তো সুটকেসে স্যার।’

তাহলে আপনাৰ পাশে রাখা জাপান এয়াৱ লাইন্সেৰ ব্যাগ থেকে মন্দাৰ বোসেৱ রিভলভাৱটা বাৱ কৰে কোটেৱ তলায় বেল্টেৰ মধ্যে হুঁজুন—যাতে বাইৱে থেকে বোৱা না যায়।

লালমোহনবাবুৰ নড়াচড়া থেকে বুৰলাম তিনি ফেলুদাৰ আদেশ পালন কৰছেন। এই সময় তাৱ মুখটা দেখতে ভীষণ ইচ্ছে কৰছিল।

‘কিছু না,’ ফেলুদা বলল, ‘গোলমাল দেখলে শ্ৰেফ ট্যাঁক থেকে ওঠি বাৱ কৰে

সামনের দিকে পয়েন্ট করে দাঁড়িয়ে থাকবেন।'

'আর পে-পেছন দিয়ে যদি—'

'পেছনে কিছু হচ্ছে বুঝলে আপনি নিজে ঘুরে যাবেন, তখনই সেটা সামনে হয়ে যাবে।'

'আর আপনি? আপনি বুঝি আজ, মানে, নন-ভায়োলেন্ট?'

'সেটা প্রয়োজন বুঝে।'

ট্যাঙ্কিটা বাজার ছাড়িয়ে একটা খোলা জায়গায় এসে পড়ল। আমরা এর মধ্যে আরো দু-একজনকে জিজ্ঞেস করে অন্য ট্যাঙ্কিটা কোন পথে গেছে জেনে নিয়েছি। তাছাড়া রাস্তার বালির উপর মাঝে মাঝে টায়ারের দাগ দেখতে পাচ্ছি। আর তাতেই বুঝতে পারছি যে আমরা হেমাঙ্গ হাজরার রাস্তাতেই চলেছি।

গুরুবচন সিং বলল, 'ইয়ে হ্যায় মোহনগড় জানেকা রাস্তা। আউর এক মিল জানা সেক্তা। উসকে বাদ রাস্তা বহুৎ খারাপ হ্যায়। জীপ ছোড়কে দুস্রা গাড়ি নেই যাতা।'

এক মাইলও অবিশ্য যেতে হল না। কিছু দূর গিয়েই দেখতে পেলাম রাস্তার এক ধারে একটা ট্যাঙ্কি দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার ডান দিকে খানিকটা দূরে রয়েছে একসঙ্গে অনেকগুলো পরিত্যক্ত একতলা ছাত ছাড়া খুপরির মতো পাথরের বাড়ি। বুঝলাম, এটাও হচ্ছে একটা প্রাচীন গ্রাম, যেমন গ্রাম আমরা এর আগে আরো দু-একটা দেখেছি। এসব গ্রাম থেকে লোকজন নাকি বহুকাল আগে চলে গেছে; শুধু দেয়ালগুলো পাথরের তৈরি বলে এখনো দাঁড়িয়ে আছে।

গুরুবচন সিংকে অপেক্ষা করতে বলে আমরা বাড়িগুলোর দিকে এগোলাম। সর্দারজী দেখলাম গাড়ি থেকে নেমে অন্য ট্যাঙ্কির দিকে এগিয়ে গেল—বোধহয় জাতভাইয়ের সঙ্গে আড়া মারতে।

চারিদিক থমথম করছে। পিছন দিকে চাইলে দূরে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের মাথায় জয়সলমীরের কেল্লা। রাস্তার উলটো দিকে খাড়াই উঠে গেছে পাহাড়। তার ঠিক পায়ের কাছে একটা প্রকাণ্ড খোলা জায়গা জুড়ে মাটিতে পৌঁতা শিল-নোড়ার মতো হলদে পাথরের সারি। ফেলুদা ফিসফিস করে বলল, 'যোদ্ধাদের কবর।'

লালমোহনবাবু খসখসে মিহি গলায় বললেন, 'আমার কিন্তু আবার লো ভ্রাড প্ৰেশাৰ।'

'কিছু ভাববেন না', ফেলুদা বলল, 'দেখতে দেখতে হাই হয়ে যেমনটি চাই তেমনটি হয়ে যাবে।'

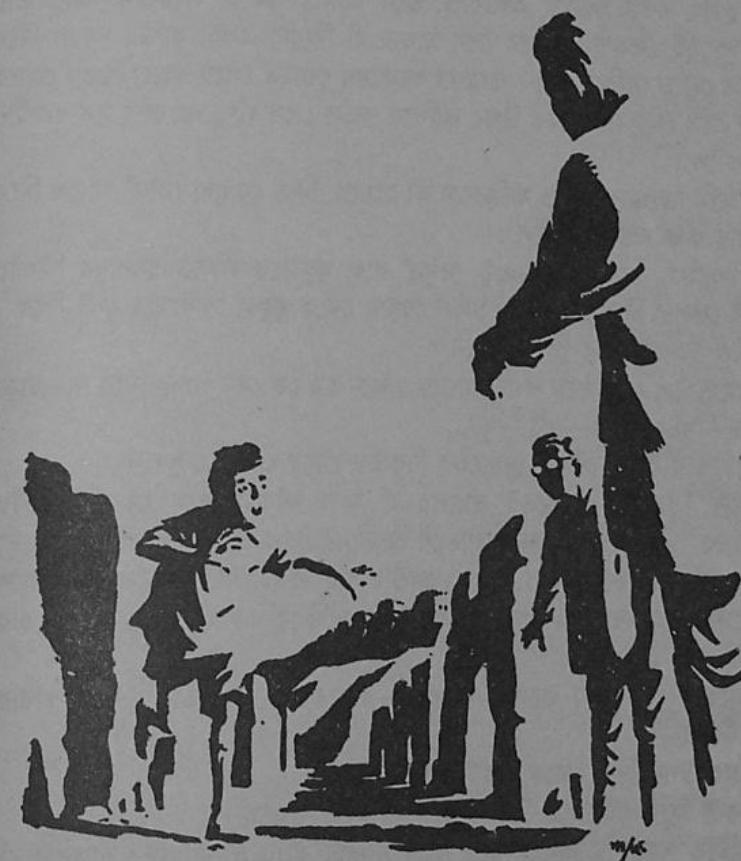
বাড়িগুলোর কাছে এসে পড়েছি। সারি সারি বাড়ির মাঝখান দিয়ে চলে গেছে সোজা রাস্তা। বেশ বুঝলাম এ গ্রাম বাংলাদেশের গ্রামের মতো নয়। এর মধ্যে

একটা সহজ জ্যামিতিক প্ল্যান আছে।

কিন্তু ট্যাঙ্কির যাত্রীরা কোথায়? মুকুল কোথায়? উষ্টুর হেমাঙ্গ হাজরা কোথায়?

মুকুলের কিছু হয়নি তো?

হঠাতে খেয়াল হল কানে একটা শব্দ আসছে—এখনো খুবই আস্তে—কিন্তু কান পাতলে শোনা যায়। খট—খট—খট...



অত্যন্ত সাবধানে একটুও শব্দ না করে আরো কয়েক পা এগিয়ে দেখলাম, একটা চৌরাস্তায় এসে পড়েছি। আমরা এখনো দুটো রাস্তার ক্রসের মাঝখানে

দাঁড়িয়ে আছি। ডান দিক দিয়ে শব্দটা আসছে। রাস্তার দু'দিকে দশ-বারোটা বাড়ির সারি—তাদের দেয়াল আর দরজার ফাঁকগুলো শুধু দাঁড়িয়ে আছে।

আমরা ডানদিকের রাস্তাটা ধরেই পা টিপে টিপে এগোতে লাগলাম।

ফেলুদা দাঁতের ফাঁক দিয়ে প্রায় শোনা যায় না এমনভাবে বলল, ‘রিভলভার’—আর সেই সঙ্গে তার নিজের হাতটাও চলে গেল কোটের ভিতর। আড়চোখে দেখলাম লালমোহনবাবুর হাতেও রিভলভার এসে গেছে, আর সেটা অসন্তুষ্ট কাঁপছে।

হঠাতে একটা খচমচ আওয়াজ শুনে আমরা থমকে দাঁড়ালাম, আর তার পরমুহুর্তেই দেখলাম রাস্তার শেষ মাথায় বাঁ দিকের একটা বাড়ির দরজা দিয়ে মুকুল দৌড়ে বেরিয়ে এল—তারপর আমাদের দেখতে পেয়ে আরো দ্বিগুণ জোরে ছুটে এসে ফেলুদার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সে হাঁপাছে, তার মুখ রক্তহীন ফ্যাকাসে।

আমি জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম কী হয়েছে, কিন্তু ফেলুদা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে আমার কথা বন্ধ করে দিল।

ফিসফিস করে ‘একে একটু দেখুন’ বলে মুকুলকে লালমোহনবাবুর জিম্মায় রেখে ফেলুদা নিঃশব্দে এগিয়ে চলল যেখান থেকে মুকুল বেরিয়েছে সেই দিকে। আমিও চললাম তার পিছন পিছন।

এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে শব্দটা বাড়ছে। মনে হয় কে যেন পাথর নিয়ে নাড়াচাড়া করছে—খট—খটাং—খুট—খুট...

বাড়িটার কাছে পৌছে দেয়ালের দিকটায় দেঁয়ে গেল ফেলুদা।

আর তিন পা বাড়াতেই দরজার হাঁ করা ফাঁকটা দিয়ে দেখলাম ডষ্টের হাজরাকে। ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে পিঠ করে পাগলের মতো একটা ভাঙা পাথরের স্তুপ থেকে একটার পর একটা পাথর তুলে এক পাশে ফেলেছেন। আমরা যে এসে দরজার মুখে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছি, সেটা তাঁর খেয়াল নেই।

আরেক পা সামনে এগোল ফেলুদা—তার হাতে রিভলভার ডষ্টের হাজরার দিকে উঠোনো।

হঠাতে উপর দিক থেকে একটা ঝটপট শব্দ।

একটা ময়ুর পাঁচিলের উপর থেকে লাফিয়ে পড়েছে।

মাটিতে পড়েই তীরবেগে ছুটে গিয়ে ময়ুরটা উপুড় হওয়া ডষ্টের হাজরার বাঁ কানের ঠিক নিচে একটা সাংঘাতিক ঠোকর মারল। ডষ্টের হাজরা যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে হাত দিয়ে ঠোকরানোর জায়গাটা চেপে ধরতেই তার সাদা সাটোর আস্তিনটা লাল হয়ে উঠল।

এদিকে ময়ুরটা ঠোকর মেরেই চলেছে। তার মধ্যেই ডষ্টের হাজরা পালাতে গিয়ে আমাদের সামনে দেখে ভূত দেখার মতো ভাব করলেন। আমরা দরজা ছেড়ে পিছিয়ে দাঁড়ালাম, আর ময়ুর তাকে ঠুকরে ঘর থেকে বার করে দিল।

‘গুপ্তধনের জায়গায় যে ময়ুরের বাসা থাকবে, আর তার মধ্যে যে ডিম থাকবে—এটা বোধহয় আপনি ভাবতে পারেননি—তাই না?’

ফেলুদার গলার স্বর ইস্পাত, তার রিভলভার ডষ্টের হাজরার দিকে তাগ করা। বেশ বুবাতে পারছিলাম যে ডষ্টের হাজরাই শয়তান, আর তার শাস্তি ও হয়েছে চমৎকার, কিন্তু অন্য অনেক কিছুই এখনো এত ধৈঁয়াটে রয়েছে যে মাথাটা কেমন জানি গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল।

একটা গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল। ডষ্টের হাজরা মাটিতে উপুর হয়ে আছেন। তার ঘাড়টা আস্তে আস্তে ফেলুদার দিকে ফিরল, তার বাঁ হাতটা এখন একটা রক্তাক্ত কুমাল সমেত ক্ষতের উপর চাপা।

ফেলুদা বলল, ‘আর কোনো আশা নেই জানেন! এবার আপনার দু'-দিকের রাস্তাই বন্ধ।’

ফেলুদার কথা শেষ হবার আগেই ডষ্টের হাজরা হঠাতে চোখের পলকে দাঁড়িয়ে উঠে একটা উগ্রাদ দৌড় দিলেন উঠে দিকে। ফেলুদা রিভলভারটা নামিয়ে নিল—কারণ সত্যই পালাবার কোনো পথ নেই। উঠে দিক থেকে আমাদের দু'জন চেনা ভদ্রলোক এগিয়ে আসছেন। যার হাতে লাঠি নেই, তিনি খপ করে ক্রিকেট বল লোফার মতো ডষ্টের হাজরাকে বগলদাবা করে নিলেন।

এবারে লাঠিওয়ালা ভদ্রলোকটি ফেলুদার দিকে এগিয়ে এলেন। ফেলুদা রিভলভারটা বাঁ হাতে চালান দিয়ে ডান হাতটা ভদ্রলোকের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, ‘আসুন ডষ্টের হাজরা।’

অ্যাঁ! ইনিই ডষ্টের হাজরা?

ভদ্রলোক ফেলুদার সঙ্গে হ্যাভশেক করে বললেন, ‘আপনিই তো বোধহয় প্রদোষ মিত্রি?’

‘আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার নাগরা পরার দরুন ফোসকাটা এখনো সারেনি বলে মনে হচ্ছে...’

আসল ডষ্টের হাজরা হেসে বললেন, ‘পরশু সুধীরবাবুকে ট্রাঙ্ক কল করেছিলাম। উনিই বললেন আপনি এসেছেন। যা বর্ণনা দিলেন তা থেকে চিনতে কোনো অসুবিধা হয়নি। আলাপ করিয়ে দিই—ইনি হলেন ইঙ্গেল্সের রাঠোর।’

‘আর উনি?’ ফেলুদা হাত-কড়া পরা মাথা হেঁট-করা ময়ুরের ঠোকর-খাওয়া ভদ্রলোকটির দিকে দেখাল। ‘উনিই বুঝি ভবানন্দ?’

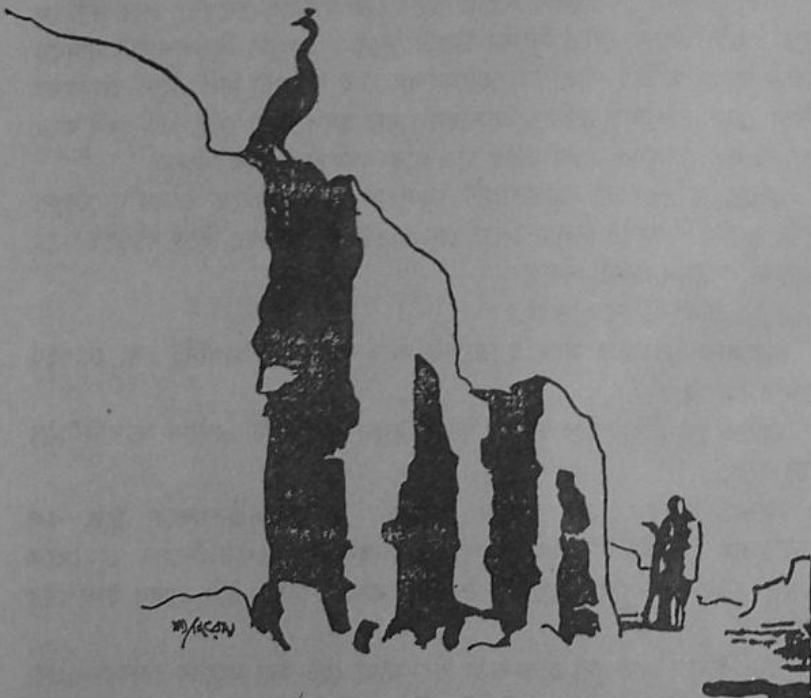
‘ইয়েস’, বললেন ডক্টর হাজরা, ‘ওৱফে অমিয়নাথ বৰ্মণ, ওৱফে দ্য গ্ৰেট
বাৰম্যান—উইজার্ড অফ দ্য ইন্স্ট’।

॥ ১২ ॥

ভবানন্দ এখন রাজস্থানী পুলিশের জিম্মায়। তার বিৰুদ্ধে অভিযোগ—ডক্টর হেমাঙ্গ হাজরাকে খুন কৰার চেষ্টা, তার জিনিসপত্র নিয়ে সটকে পড়া, নিজের নাম
ভাঁড়িয়ে হেমাঙ্গ হাজরার ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা ইত্যাদি। আমৰা ডাকবাংলোৱ
বারান্দায় বসে উটেৰ দুধ দেওয়া কৰি থাছিছি। মুকুল সামনেৰ বাগানে দিবি
ফুর্তিতে খেলে বেড়াচ্ছে, কাৰণ সে জানে আজই সে কলকাতা রওনা হৈবে।

সোনার কেল্লা দেখাৰ পৰ তাৰ আৱ রাজস্থানে থাকাৰ ইচ্ছে নেই।
ফেলুদা আসল ডক্টর হাজরার দিকে ফিরে বলল, ‘ভবানন্দ শিকাগোতে সত্যিই
ভঙ্গামি কৰছিল তো ? কাগজে যা বেিয়েছিল তা সত্যি তো ?’

হাজৰা বললেন, ‘যোল আনা সত্যি। ভবানন্দ আৱ তাৰ সহকাৰী মিলে যে



কত দেশে কত কুকীর্তি কৰেছে তাৰ ইয়ন্তা নেই। তা ছাড়া শিকাগোয় আৱো
ব্যাপার আছে। নিজেৰ ভণামিৰ সঙ্গে সঙ্গে আমাৰ মিথ্যে বদনাম রটাছিল,
আমাৰ কাজেৰ বিষ্টৰ অসুবিধা কৰছিল। কাজেই শেষটায় বাধ্য হয়ে স্টেপ নিতে
হল। অবিশ্যি এ হল চাৰ বছৰ আগেৰ কথা। ওৱা কবে দেশে ফিরেছে জানি
না। আমি ফিরেছি মাত্ৰ তিন মাস হল। সুধীৱবাবুৰ দোকানে গিয়েছিলাম,
মেখানে তাৰ ছেলেৰ কথা শুনে তাকে দেখতে যাই। তাৰ পৱেৰ ব্যাপার তো
আপনি জানেনই। আমি যখন মুকুলকে নিয়ে রাজস্থানে আসা স্থিৰ কৰলাম, তখন
কিন্তু ভাবতেই পাৰিনি যে আমাৰ পিছনে লোক লাগবে।’

‘এক ঢিলে দুই পাখি কে না মাৰতে চায় বলুন !’ ফেলুদা বলল। ‘একে
গুপ্তধনেৰ আশা, তাৰ উপৰ আপনাৰ উপৰ প্ৰতিশোধ।...তা, এদেৱ সঙ্গে
কলকাতায় দেখা হয়নি আপনাৰ ?’

‘মোটেই না। প্ৰথম দেখা হয় একেবাৱে বান্দিকুই স্টেশনেৰ রিফ্ৰেশমেন্ট



কুমে। আমি আগ্রায় একদিন থেকে না গেলে ট্ৰেনে ওদের সঙ্গে দেখা হত না।
ভদ্রলোকেৰা নিজে থেকে এসে আমার সঙ্গে আলাপ কৰলেন।'

'আপনি চিনতে পারলেন না ?'

'কী কৰে চিনব ? শিকাগোতে তো এৱা ছিলেন একেবাৰে শুশ্রাণুফ্র সম্বলিত
মহাধৰ্ম মহেশ !'

'তাৰপৰ ?'

'তাৰপৰ আমাদেৱ সঙ্গে এক ট্ৰেইলে বসে থেলো, ম্যাজিক দেখিয়ে মুকুলেৱ
সঙ্গে ভাব জমালো, একই ট্ৰেনে একই কামৰায় উঠল। কিষণগড়ে নেমে মুকুলকে
কেল্লা দেখাৰ সেটা আগেই ঠিক কৰেছিলাম, কিন্তু এৱাও যে আমাৰ পিছু পিছু
নেমেছে সেটা জানতে পাৰিনি। আমি কেল্লায় যাবাৰ কিছু পৱেই এৱাও
পৌঁছেছে। জনমানবশূন্য জায়গা, চোৱেৱ মতো এসেছে, আড়ালে আড়ালে তাকে
তাকে থেকেছে, সুযোগ পেয়ে পাহাড়েৱ উপৰ থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে।
তাকে থেকেছে, সুযোগ পেয়ে পাহাড়েৱ উপৰ থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে।
গড়াতে গড়াতে শ' খানেক ফুট নিচে গিয়ে একটা ৰোপড়ায় আটকে পড়ে বৈচে
গেলাম। জামা খুললে দেখবেন সৰ্বাঙ্গ ছড়ে গেছে। যাই হোক—এই ৰোপড়াৰ
পাশে ঘণ্টাখানেক ওইভাৱেই রয়ে গেলাম। আমি চাইছিলাম যে ওৱা আপদ
গেছে ভেবে নিশ্চিন্তে মুকুলকে নিয়ে চলে যায়। যখন স্টেশনে পৌঁছালাম
ততক্ষণে আটটাৰ মাৰোয়াড়েৱ ট্ৰেন চলে গেছে। আৱ তাতে কৰেই চলে গেছে
মুকুল, এবং আমাৰ যাবতীয় মালপত্ৰ সমেত ওই দুই ধুৱকৰ। তাৰ মানে লোকেৰ
কাছে আমাৰ সঠিক পৱিচয়টা দেবাৱৰাস্তাও তাৰা বন্ধ কৰে দিয়ে গেছে।'

'মুকুল ওদেৱ সঙ্গে যেতে আপন্তি কৰল না ?'

ডষ্ট্ৰ হাজৰা হাসলেন। 'মুকুলকে চিনতে পাৱেননি এখনো ? নিজেৰ
বাপ-মায়েৰ ওপৰই যখন ওৱ টান নেই, তখন দু'জন অচেনা লোকেৰ মধ্যে ও
পাৰ্থক্য কৰবে কেন ? ভবানন্দ বলেছে ওকে সোনাৱ-কেল্লা দেখাৰে—ব্যস,
ফুৱিয়ে গেল। যাই হোক—হাল তো ছাড়ালাই না, বৰং জিদ চেপে গেল।
মানি-ব্যাগটা সঙ্গেই ছিল। নিজেৰ ছেঁড়া জামাকাপড় পুঁটলিৰ মধ্যে নিয়ে নতুন
পোশাক কিনে রাজস্থানী সাজলাম। নাগৰা পৱা অভ্যেস নেই, পায়ে ফোসকা
পড়ে গেল। পৱদিন কিষণগড়ে আপনাদেৱ কামৰায় উঠলাম। মারওয়াড়থেকেও
একই ট্ৰেনে যোধপুৰ এলাম। রঘুনাথ সৱাইয়ে উঠলাম। চেনা লোক ছিল
শহৱে—প্ৰফেসৱ ত্ৰিবেদী—তাকে গোড়ায় কিছু জানালাম না। বেশি হৈ-হঞ্জা
হলে ওৱা পালাতে পাৱে, কিংবা মুকুল ভয় পেয়ে বৈকে বসতে পাৱে। আমি
নিজে আঁচ কৰেছিলাম জয়সলমীৱই আসল জায়গা, এখন খালি অপেক্ষা—কৰে
ভবানন্দ ও মুকুলকে নিয়ে জয়সলমীৱে পাড়ি দেয়। তাৰ আগে পৰ্যন্ত আমাৰ কাজ
হবে ভবানন্দ ও মুকুলকে চোখে চোখে রাখা।'

'সেদিন সার্কিট হাউসেৱ বাইৱে তো আপনিই ঘুৱছিলেন ?'

'হাঁ। আৱ তাতেও তো এক ফ্যাসাদ ! মুকুল দেখি আমাকে চিনে ফেলেছে।
অন্তত সেৱকম একটা ভাব কৰেই গেট থেকে বেৱিয়ে সোজা আমাৰ দিকে চলে
আসছিল।'

'তাৰপৰ আপনি ভবানন্দকে ফলো কৰে পোকৱানেৱ গাড়িতে উঠলেন ?'

'হাঁ। আৱ সবচেয়ে মজা—ট্ৰেন থেকে দেখতে পেলাম আপনাৱা গাড়ি
থামাতে চেষ্টা কৰছেন।'

'সেটা নিশ্চয় ভবানন্দও দেখেছিল, আৱ তাই জেনে গিয়েছিল রামদেওৱাতেই
হয়ত আমৱা ট্ৰেন ধৰব !'

ডষ্ট্ৰ হাজৰা বলে চললেন, 'ট্ৰেনে ওঠাৰ আগে ত্ৰিবেদীকে ফোন কৰে
জয়সলমীৱে পুলিশকে খবৰ দিতে বলে দিয়েছিলাম। তাৰ আগেই অবশ্য ওৱ
বাড়ি থেকেই কলকাতায় ফোন কৰে আপনাৱা আসাৱ খবৰ পেয়েছি, আৱ
ত্ৰিবেদীৰ কাছ থেকে একটি স্যুট ধাৰ কৰে ভদ্রলোক সেজেছি।'

ফেলুন্দা বলল, 'পোকৱানে গিয়ে বোধহয় দেখলেন ভবানন্দেৱ অ্যাসিস্ট্যান্ট
ট্যাঙ্কি নিয়ে হাজৰি, তাই না ?'

'ওইখানেই তো গণগোল হয়ে গেল। আই লস্ট দেম। দশ ঘণ্টা অপেক্ষা
কৰে আৱাৰ রাত্ৰে ট্ৰেন ধৰতে হল। সে গাড়িতে যে আপনি আছেন তা তো
জানি না। আপনাদেৱ প্ৰথম দেখলুম এই ভাকবাংলাতে। এখন আমাৰ প্ৰশ্ন
হচ্ছে—আপনি কখন প্ৰথম ভবানন্দকে সন্দেহ কৰলেন ?'

ফেলুন্দা হেসে বলল, 'ভবানন্দকে সন্দেহ কৰেছিলাম বললে ভুল বলা হবে।
কৰেছিলাম ডষ্ট্ৰ হাজৰাকে। যোধপুৱে নয়, বিকানিৱে। দেবীকুণ্ডে গিয়ে দেখি
ভদ্রলোক হাত-মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছেন। তাৰ ঠিক আগেই একটা দেশলাই
কুড়িয়ে পাই—টেক্কা মাৰ্কা। এটা রাজস্থানে বিক্ৰি হয় না। তাৰপৰ ভদ্রলোককে
ওই বেগতিক অবস্থায় দেখে মনে হল যে-লোক এই কুকমটি কৰেছে তাৰই
হয়ত দেশলাই। কিন্তু তাৰপৰ দেখলাম বাঁধনেও গণগোল। একজন লোকেৰ
হাত-পা এক সঙ্গে বেঁধে দিলে সে লোক অসহায় হয়ে পড়তে পাৱে, কিন্তু যেখানে
শুধু হাত দুটো পেছনে বেঁধে দেওয়া হয়েছে, সেখানে একটু বুদ্ধি থাকলেই পা
দুটোকে ভাঁজ কৰে তাৰ তলা দিয়ে হাত দুটো সামনে এনে বাঁধন খুলে ফেলা
যায়। বুবতে পাৱলাম ভদ্রলোক নিজেই নিজেকে বেঁধেছেন। এটা বুবোও কিন্তু
ভাৰছি, ডষ্ট্ৰ হাজৰাই আসল কালপ্রিট। শেষটায় চোখ খুলে গেল আজ সকালে
ট্ৰেনে—আপনাৱা প্যাডে লেখা ভবানন্দৰ একটা চিঠিৰ দিকে চেয়ে থাকতে
থাকতে।'

'কীৱকম ?'

সেরা সত্তজিৎ

‘কাগজের ওপরে আপনার নাম ছাপা হয়েছে, তাতে J দিয়ে হাজরা লেখা। আর ইনি নাম সই করেছেন চিঠির নিচে তাতে দেখি Z। তখনই বুঝলাম এ হাজরা আসলে হাজরাই নন। কিন্তু ইনি তাহলে কে? নিশ্চয় যারা কলকাতায় নীল ছেলেটিকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল তাদেরই একজন। আর অন্যটি হচ্ছেন মন্দার বোস—যার ডান হাতের একটা নখ বড়, আর যার মুখে সিগারের গন্ধ আমিও পেয়েছি, নীলও পেয়েছে। কিন্তু তাহলে আসল হাজরা কোন ব্যক্তি এবং তিনি এখন কোথায়? এর উভৰ একটাই হতে পারে—হাজরা হলেন তিনিই, যিনি নাগরা পরে পায়ে ফোসকা করেছিলেন, কিষণগড়ে আমাদের কামরায় উঠেছিলেন, সার্কিট হাউসের এবং বিকানির কেল্লার আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছিলেন, এবং জয়সলমীরের ডাকবাংলোয় লাঠি হাতে খুড়িয়ে হাঁটেছিলেন।’

ডক্টর হাজরা বললেন, ‘সুধীরবাবু আপনাকে খবর দিয়ে খুবই বুদ্ধিমানের কাজ করেছিলেন, কারণ আমি একা বোধহয় জুত করে উঠতে পারতাম না। ভবানন্দর অ্যাসিস্ট্যান্টকে তো আপনারাই জব্ব করেছেন। এবারে তাঁর হাতেও হাতকড়াটি পড়লেই ঘোলো কলা পূর্ণ হয়।’

ফেলুদা লালমোহনবাবুর দিকে দেখিয়ে বলল, ‘মন্দার বোসকে প্রথম সন্দেহ করার পিছনে কিন্তু এনার যথেষ্ট কন্ট্রিবিউশন আছে।’

লালমোহনবাবু এর মধ্যে অনেকবার একটা কথা বলতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু পারেননি। এবার তিনি সেটা বলে ফেললেন—

‘আচ্ছা স্যার, তাহলে গুপ্তধনের ব্যাপারটা কী হচ্ছে?’

‘ওটা ময়ূরে পাহারা দিচ্ছে দিক না! বললেন ডক্টর হাজরা। ‘ওদের বেশি ঘাঁটালে কী ফল হয় সেটা তো দেখলেন।’

ফেলুদা বলল, ‘আপাতত আপনার কাছে যে গুপ্তধনটা রয়েছে সেটা তো ফেরত দিন যাশাই। অবিশ্য যেভাবে উঁচিয়ে রয়েছে আপনার কোটটা কোমরের কাছে, তাতে গুপ্ত আর বলা চলে না।’

লালমোহনবাবু বেশ একটু মন-মরা ভাবেই মন্দার বোসের রিভলভারটা বার করে ফেলুদাকে দিয়ে দিলেন।

সেটা হাতে নিয়ে ‘থ্যাক ইউ’ বলেই ফেলুদা হঠাতে কেমন জানি গভীর হয়ে গেল। তারপর রিভলভারটা নেড়েচেড়ে দেখল। তারপর বিড়বিড় করে বলল, ‘বলিহারি মিস্টার ট্রাটার—এভাবে ভাঁওতা দিলেন প্রদোষ মিত্রিকে?’

‘কী ব্যাপার? কী হল?’—আমরা সমস্বরে বলে উঠলাম।

‘আরে এ যে একেবারেই ফাঁকি—মেড ইন জাপান—ম্যাজিসিয়ানরা স্টেজে ব্যবহার করে এই রিভলভার।’

সকলে হেসে ফেটে পড়ার ঠিক আগে ফেলুদার হাত থেকে রিভলভারটা নিয়ে দাঁত বার করে জটায় বললেন, ‘ফর মাই কালেকশন—অ্যান্ড আজ এ স্মৃতিচিহ্ন অফ আওয়ার পাওয়ারফুল অ্যাডভেঞ্চার ইন রাজস্থান! থ্যাক ইউ স্যার।’

ছিমন্তার অভিশাপ

৪৯

রহস্য-রোমাধ্ব উপন্যাসিক লালমোহন গান্দুলী ওরফে জটায়ু ঢোকের সামনে
থেকে বইটা সরিয়ে ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন, 'রামমোহন রায়ের নাতির
সার্কাস ছিল সেটা জানতেন ?'

ফেলুদার মুখের উপর রুমাল চাপা, তাই সে শুধু মাথা নাড়িয়ে না জানিয়ে
দিল।

প্রায় দশ মিনিট ধরে একটা পর্বতপ্রমাণ খড়বোঝাই লরি আমাদের যে শুধু
পাশ দিচ্ছে না তা নয়, সমানে পিছন থেকে রেলগাড়ির মতো কালো ধৌঁয়া ছেড়ে
প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলেছে। লালমোহনবাবুর গাড়ির ড্রাইভার হরিপদবাবু বার বার
হর্ন দিয়েও কোনো ফল হয়নি। লরির পিছনের ফুলের নকশা, নদীতে সূর্য অন্ত
যাওয়ার দৃশ্য, হর্ন প্লাজ, টা-টা গুডবাই, থ্যাঙ্ক ইউ সব মুখ্য হয়ে গেছে।
লালমোহনবাবু সার্কাস সম্বন্ধে বইটা কিছুদিন হল জোগাড় করেছেন; অনেক দিন
আগের লেখা বই, নাম 'বাঙালীর সার্কাস'। বইটা ওর ঘোলার মধ্যে ছিল, লরির
জ্বালায় সামনে কিছু দেখবার জো নেই বলে সেটা বার করে পড়তে শুরু
করেছেন। ইচ্ছে আছে সার্কাস নিয়ে একটা রহস্য উপন্যাস লেখার, তাই ফেলুদার
পরামর্শ অনুযায়ী বিষয়টা নিয়ে একটু পড়াশুনা করে রাখছেন। সার্কাসের কথা
অবিশ্য এমনিতেই হচ্ছিল, কারণ আজ সকালেই রাঁচি শহরে দ্য গ্রেট ম্যাজিস্টিক
সার্কাসের বিজ্ঞাপন দেখেছি। হাজারিবাগে এসেছে সার্কাস, আর আমরা যাচ্ছি ও
হাজারিবাগেই। ওখানে সঙ্কেবেলা আর কিছু করার না থাকলে একদিন গিয়ে
সার্কাস দেখে আসব সেটাও তিনজনে প্ল্যান করে রেখেছি।

শীতের মুখটাতে কোথাও একটা যাবার ইচ্ছে ছিল; লালমোহনবাবুর নতুন বই
পুজোয় বেরিয়েছে, তিন সপ্তাহে দু হাজার বিক্রি, ভদ্রলোকের মেজাজ খুশ, হাত

...

খালি । নতুন বইয়ের নাম ‘ভ্যানকুভারের ভ্যামপায়ার’-এ ফেলুদার আপত্তি ছিল ; ও বলেছিল ভ্যানকুভার একটা পেল্লায় আধুনিক শহর, ওখানে ভ্যাম্পায়ার থাকতেই পারে না ; তাতে লালমোহনবাবু বললেন হর্নিম্যানের জিওগ্রাফির বই তন্মত্ব করে খেঁটে ওর মনে হয়েছে ওটাই বেস্ট নাম । ফেলুদা কোডার্মায় একটা তদন্ত করে এসেছে গত সেপ্টেম্বরে, মকেল সর্বেশ্বর সহায়ের একটা বাড়ি আছে হাজারিবাগে, সেটা প্রায়ই খালি পড়ে থাকে, তাই ফেলুদার কাজে খুশি হয়ে ভদ্রলোক তাঁর বাড়িটা অফার করছেন দিন দশকের জন্য । চৌকিদার আছে, সে-ই দেখাশুনা করে, আর তার বৌ রামা করে । খাওয়ার খরচ ছাড়া আর কোনো খরচ লাগবে না আমাদের ।

লালমোহনবাবুর নতুন অ্যান্সাডরেই যাওয়া ঠিক হল ; বললেন, ‘লঙ্ঘ রানে গাড়িটা কীরকম সার্ভিস দেয় সেটা দেখা দরকার !’ গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে আসানসোল-ধানবাদ হয়ে আসা যেত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত খড়গপুর-রাঁচি হয়ে আসাই ঠিক হল । খড়গপুর পর্যন্ত ফেলুদা চালিয়েছে, তারপর থেকে ড্রাইভারই চালাচ্ছে । গতকাল সকাল আটটায় রওনা হয়ে খড়গপুরে লাখ সেরে সন্ধ্যায় রাঁচি পৌঁছই । সেখানে অ্যান্সার হোটেলে থেকে আজ সকাল নটায় হাজারিবাগ রওনা দিই । পঞ্চাশ মাইল রাস্তা, খালি পেলে সোয়া ঘণ্টায় পৌঁছে যাওয়া যায়, কিন্তু এই লরির জ্বালায় সেটা নির্ধারিত দেড়ে গিয়ে দাঁড়াবে ।

আরো মিনিট পাঁচেক হৰ্ন দেবার পর লরিটা পাশ দিল, আর আমরাও সামনে খোলা পেয়ে হাঁপ ছাড়লাম । দু’পাশে বাবলা গাছের সারি, তার অনেকগুলোতেই বাবুইয়ের বাসা, দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে । মাঝে মাঝে পথের ধারেও টিলা পড়ছে । লালমোহনবাবু বই বন্ধ করে দৃশ্য দেখে আহা-বাহা করছেন আর মাঝে মাঝে বেমানান রবীন্দ্র-সঙ্গীত গুণগুণ করছেন, যেমন অধান মাসে ফাণ্ডুনের নবীন আনন্দে । ওর চেহারায় গান মানায় না, গলার কথা ছেড়েই দিলাম । মুশকিল হচ্ছে, উনি বলেন কলকাতার ডামাডোল থেকে বেরিয়ে নেচারের কলট্যাক্টে এলেই নাকি ওর গান আসে, যদিও স্টক কম বলে সব সময়ে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট গান মনে আসে না ।

তবে এটা বলতেই হবে যে ওর দৌলতে এই চবিশ ঘণ্টার মধ্যে সার্কাস সম্পন্নে অনেক তথ্য জেনে ফেলেছি । কে জানত আজ থেকে একশো বছর আগে বাঙালীর সার্কাস ভারতবর্ষে এত নাম কিনেছিল ? সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল প্রোফেসর বোসের গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস । এই সার্কাসে নাকি বাঙালী মেয়েরাও খেলা দেখাত, এমনকি বাঘের খেলাও । আর সেই সঙ্গে রাশিয়ান, আমেরিকান, জার্মান আর ফরাসী খেলোয়াড়ও ছিল । গাস-বার্নস বলে একজন আমেরিকানকে রেখেছিলেন প্রোফেসর প্রিয়নাথ বোস বাঘ-সিংহ ট্রেন করার জন্য । ১৯২০-এ

প্রিয়নাথ বোস মারা যান । আর তার পর থেকেই বাঙালী সার্কাসের দিন ফুরিয়ে আসে ।

‘এই গ্রেট ম্যাজেস্টিক কোন দেশী সার্কাস মশাই ?’ জিগ্যেস করলেন লালমোহনবাবু ।

‘দক্ষিণ ভারতীয়ই হবে’, বলল ফেলুদা, ‘সার্কাসটা আজকাল ওদের একচেটে হয়ে গেছে ।’

‘ভালো ট্র্যাপীজ আছে কিনা সেইটেই হচ্ছে প্রশ্ন । ছেলেবেলায় হার্মস্টোন আর কার্লেকার সার্কাসে যা ট্র্যাপীজ দেখিচি তা ভোলবার নয় ।’

লালমোহনবাবুর গল্পে নাকি ট্র্যাপীজের একটা বড় ভূমিকা থাকবে । শুন্যে সব লোমহর্ষক খেলার মাঝখানে একজন ট্র্যাপীজের খেলোয়াড় ঝুলন্ত অবস্থায় আরেকজনকে বিষাক্ত ইনজেকশন দিয়ে খুন করবে । রহস্যের সমাধান করতে হিরো প্রথর রুদ্রকে নাকি ট্র্যাপীজের খেলা শিখতে হবে । ফেলুদা শুনে বলল, ‘যাক, একটা জিনিস তাহলে আপনার হিরোর এখনো শিখতে বাকি ।’

৭২ কিলোমিটারের পোস্টটা পেরিয়ে কিছুদূর গিয়েই আরেকটা অ্যান্সাডর দেখা গেল । সেটা রাস্তার এক ধারে বনেট খোলা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, আর তার পাশেই দাঁড়িয়ে এক ভদ্রলোক হাত তুলে যে ভঙ্গিটা করছেন সেটা রেলের স্টেশনে খুব দেখা যায় । সেখানে সেটা গুড়-বাটি, আর এখানে হয়ে গেছে থামতে বলার সংকেত । হরিপদবাবু ব্রেক করলেন ।

‘ইয়ে, আপনারা হাজারিবাগ যাচ্ছেন কি ?’

ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি । গায়ের রং ফরসা, চোখে চশমা, পরনে খয়েরি প্যান্টের উপর সাদা সার্ট আর সবুজ হাত-কাটা পুলোভার । সঙ্গে ড্রাইভার আছে, যার শরীরের উপরের অর্ধেকটা এখন বনেটের নিচে ।

প্রশ্নের উত্তরে ফেলুদা ‘আজ্জে হাঁ’ বলায় ভদ্রলোক বললেন, ‘আমার গাড়িটা গণ্ডগোল করছে, বুরোছেন । বোধহয় সিরিয়াস । তাই ভাবছিলাম....’

‘আপনি আমাদের সঙ্গে আসতে চাইলে আসতে পারেন ।’

‘সো কাইড অফ ইউ !’—ভদ্রলোক বোধহয় ভাবতে পারেননি যে না চাইতেই ফেলুদা অফারটা করবে ।—‘আমি ওখান থেকে একটা মেকানিক নিয়ে ট্যাক্সি করে চলে আসব । তাছাড়াতো আর কোনো ইয়ে দেখছি না ।’

‘আপনার সঙ্গে লাগেজ কী ?’

‘একটা সুটকেস, তবে সেটা অবিশ্ব পরে নিয়ে যেতে পারি । এখান থেকে যেতে আসতে তিন কোয়ার্টারের বেশি লাগবে না ।’

‘চলে আসুন ।’

ভদ্রলোক ড্রাইভারকে ব্যাপারটা বুবিয়ে দিয়ে আমাদের গাড়িতে উঠে আরো

দু'বার বললেন সো কাইভ অফ ইউ। তারপর বাকি পথটা আমরা কিছু না জিগ্যেস করতেই নিজের বিষয়ে একগাদা বলে গেলেন। ওর নাম প্রীতিন্দ্র চৌধুরী। বাপ বছর দশেক হল রিটায়ার করে হাজারিবাগে বাড়ি করে আছেন, আগে রাঁচিতে অ্যাডভোকেট ছিলেন, নাম মহেশ চৌধুরী। এ অঞ্চলের নামকরা লোক।

‘আপনি কলকাতাতেই থাকেন?’ জিগ্যেস করল ফেলুদা।

‘হ্যাঁ। আমি আছি ইলেক্ট্রনিকসে। ইন্ডোভিশনের নাম শনেছেন?’

ইন্ডোভিশন নামে একটা নতুন টেলিভিশনের বিজ্ঞাপন কিছুদিন থেকে কাগজে দেখছি, সেটা নাকি এন্দেরই তৈরি।

‘আমার বাবার সন্তুর পূর্ণ হচ্ছে কাল’, বললেন ভদ্রলোক, ‘বড়দা আমার স্ত্রী আর মেয়েকে নিয়ে দিন তিনেক হল পৌঁছে গেছেন। আমার আবার দিল্লিতে একটা কাজ পড়ে গেল, আসা মুশকিল হচ্ছিল, কিন্তু বাবা টেলিগ্রাম করলেন মাস্ট কাম বলে। —একটু থামাবেন গাড়িটা কাইভলি?’

গাড়ি থামল; কেন তা বুঝতে পারছি না। ভদ্রলোক তাঁর হাতের ব্যাগটা থেকে একটা ছোট্ট ক্যামেট রেকর্ডার বার করে গাড়ি থেকে নেমে রাস্তার পাশেই একটা শালবনে ঢুকে মিনিট খানেকের মধ্যেই ফিরে এসে বললেন, ‘একটা ফ্লাইক্যাচার ডাকছিল; লাকিলি পেয়ে গেলাম। পাখির ডাক রেকর্ড করাটা আমার একটা নেশা। সো কাইভ অফ ইউ।’

ধন্যবাদটা অবিশ্য তাঁর অনুরোধে গাড়ি থামানোর জন্য।

আশ্চর্য, ভদ্রলোক নিজের সম্বন্ধে এত বলে গেলেও, আমাদের কোনো পরিচয় জানতে চাইলেন না। ফেলুদা অবিশ্য বলে যে একেকজন লোক থাকে যারা অন্যের পরিচয় নেওয়ার চেয়ে নিজের পরিচয় দিতে অনেক বেশি ব্যগ্র।

হাজারিবাগ টাউনে পৌঁছে ইউরেকা অটোমোবিলস-এ প্রীতিন্দ্রবাবুকে নামিয়ে দেবার পর আরেকবার সো কাইভ অফ ইউ বলে ভদ্রলোক হঠাৎ জিগ্যেস করলেন, ‘ভালো কথা, আপনারা উঠছেন কোথায়?’

জবাবটা দিতে ফেলুদার গলা তুলতে হল, কারণ গাড়ির কাছেই কেন জানি লোকের ভিড় জমেছে, আর সবাই বেশ উত্তেজিতভাবে কথা বলছে। কী বিষয়ে কথা হচ্ছে সেটা অবিশ্য পরে জেনেছিলাম।

ফেলুদা বলল, ‘সঠিক নির্দেশ দিতে পারব না, কারণ আমরা এই প্রথম আসছি এখানে। এটা বলতে পারি যে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড রেস্ট হাউস আর কর্নেল মোহাস্তির বাড়ির খুব কাছে।’

‘ও, তার মানে আমাদের বাড়ি থেকে মিনিট সাতকের হাঁটা পথ।—টেলিফোন আছে?’

‘সেভেন ফোর টু।’

‘বেশ, বেশ।’

‘আর আমার নাম মিত্র। পি সি মিত্র।’

‘দেখেছেন, নামটাই জানা হয়নি।’

ভদ্রলোককে ছেড়ে দিয়ে রওনা হবার পর ফেলুদা বলল, ‘নতুন মাল বাজারে ছাড়ছে বলে বোধহয় টেন্স হয়ে আছে।’

‘বাতিকগন্ত,’ বললেন লালমোহনবাবু।

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড রেস্ট হাউসের কথা জিগ্যেস করে আমাদের বাড়ির রাস্তা খুঁজে বার করতে কোনো অসুবিধা হল না। কর্নেল জি সি মোহাস্তির নাম লেখা মার্বেল ফ্লকওয়ালা গেট ছাড়িয়ে তিনটে বাড়ি পরেই এস সহায় লেখা বুগেনভিলিয়ায় ঢাকা গেটের বাইরে এসে হৰ্ন দিতেই একজন বেঁটে মাঝবয়সী লোক এসে গেটটা খুলে দিয়ে সেলাম টুকল। মোরাম ঢাকা পথে খনিকটা এগিয়ে গিয়ে একতলা বাংলো টাইপের বাড়ির সামনে আমাদের গাড়ি থামল। মাঝবয়সী লোকটাও দোড়ে এসেছে পিছন পিছন, জিগ্যেস করে জানলাম সে-ই চৌকিদার, নাম বুলাকিপ্রসাদ।

গাড়ি থেকে নেমে বুবলাম জায়গাটা কী নির্জন। বাংলোটা ঘিরে বেশ বড় কম্পাউন্ড (লালমোহনবাবু বললেন আঁট লীস্ট তিন বিঘে), একদিকে বাগানে তিন চার রকম ফুল ফুটে আছে, অন্য দিকে অনেকগুলো বড় বড় গাছ, তার মধ্যে তেঁতুল, আম আর অর্জুন চিনতে পারলাম। কম্পাউন্ডের পাঁচিলের উপর দিয়ে উত্তর দিকে একটা পাহাড় দেখা যাচ্ছে, সেটাই নাকি কানারি হিল, এখান থেকে মাইল দূরেক।

বাড়িটা তিনজনের পক্ষে একেবারে ফরমাশ দিয়ে তৈরি। সামনে তিন ধাপ সিঁড়ি উঠে চওড়া বারান্দার পর পাশাপাশি তিনটে ঘর। মাঝেরটা বৈঠকখানা, আর দু'দিকে দুটো শোবার ঘর। পিছন দিকে আছে খাবার ঘর, রান্নাঘর ইত্যাদি। সানসেট দেখা যাবে বলে লালমোহনবাবু পশ্চিমের বেডরুমটা নিলেন।

সুটকেস থেকে জিনিস বার করে বাইরে রাখছি, এমন সময় বুলাকিপ্রসাদ আমার ঘরে চা নিয়ে এসে ট্রেটা টেবিলের উপর রেখে যে কথাটা বলল, তাতে আমাদের দু'জনেরই কাজ বন্ধ করে ওর দিকে চাইতে হল। লালমোহনবাবু সবে ঘরে ঢুকেছেন, তিনিও দরজার মুখটাতেই দাঁড়িয়ে গেলেন।

‘আপলোগ যব বাহার যাইয়ে,’ বলল বুলাকিপ্রসাদ ‘পয়দল যানেসে যারা সমহালকে যানা।’

‘চোর ডাকাতের কথা বলছে নাকি মশাই?’ বললেন লালমোহনবাবু।

‘নেই, বাবু; বাঘ গিয়া মজিস্ট্রি সর্কস সে।’

সর্বনাশ ! লোকটা বলে কী !

জিগ্যেস করতে জানা গেল আজই সকালে নাকি একটা তাগড়াই বাঘ সার্কাসের খীচা থেকে পালিয়েছে। কী করে পালিয়েছে সেটা বুলাকিপ্রসাদ জানে না, কিন্তু সেই বাঘের ভয়ে সারা হাজারিবাগ শহর তটছ। বাঘের খেলাই নাকি এই সার্কাসের যাকে বলে স্টার অ্যাট্র্যাকশন। সার্কাসের বিজ্ঞাপনও যা দেখেছি, তাতে বাঘের ছবিটাই সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে। ফেলুদার অবিশ্য চোখই আলাদা, তাই সে আমাদের চেয়ে বেশি দেখেছে। বলল, বাঘের খেলা যিনি দেখান তিনি নাকি মারাঠী, নাম কারাভিকার, আর নামটা নাকি বিজ্ঞাপনে দেওয়া ছিল।

লালমোহনবাবু খবরটা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বললেন তাঁর গল্পে বাঘ পালানোর ঘটনা একটা রাখা যায় কিনা সেটা তিনি ভাবছিলেন, কাজেই এটাকে টেলিপ্যাথি ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। —‘তবে আপনি মশাই একেবারে ইন্কঙ্গিটো হয়ে থাকুন, গোয়েন্দা জানলে আপনাকে নির্ঘাত ওই বাঘ সন্ধানের কাজে লাগিয়ে দেবে।’

ইন্কঙ্গিটো অবিশ্য ইনকগনিটোর জটায়ু সংক্রণ। লালমোহনবাবু মাঝে মাঝে ইংরিজি কথায় এরকম ওলট পালট করে ফেলেন। খবরটা শুনে এত অবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে তাঁকে আর শুধরে দেওয়া হল না। ফেলুদা অবিশ্য অকারণে কখনই ওর পেশাটা প্রকাশ করে না। আর গোয়েন্দা বলেই যে ওকে যে কেউ যে কোনো তদন্তে ফাঁসিয়ে দেবে স্টেরও কোনো সন্তান নেই।

বুলাকিপ্রসাদ আরও বলল যে সার্কাসটা নাকি আগে শহরের মাঝখানে কার্জন মাঠে বসত, এইবারই নাকি প্রথম স্টে শহরের এক ধারে একটা নতুন জায়গায় বসেছে। এই মাঠটার উত্তরে নাকি বিশেষ বসতি নেই। বাঘ যদি সেদিক দিয়ে বেরোয় তাহলে রাস্তা পেরিয়ে কিছুদূর গিয়েই জঙ্গল পাবে। কাছাকাছি আদিবাসীদের গ্রাম আছে, খিদে পেলে স্থান থেকে গরু বাঢ়ুর টেনে নিয়ে যাওয়া কিছুই আশ্চর্য নয়।

মোটকথা, ঘটনাটা চাপ্পল্যকর। আপসোস এই যে হাজারিবাগের মতো জায়গায় এসে বাঘের ভয়ে স্বচ্ছন্দে হেঁটে বেড়ানো যাবে না।

চা খাওয়ার পর লালমোহনবাবু প্রস্তাব করলেন যে দুপুরে একবার গ্রেট ম্যাজেস্টিকে টুঁ মারা হোক। ঘটনাটা ঠিক কীভাবে ঘটেছে সেটা জানতে পারলে নাকি ওর খুব কাজে দেবে, ‘টুঁ মারা মানে কি টিকিট কেটে সার্কাস দেখার কথা ভাবছেন?’ ফেলুদা জিগ্যেস করল।

‘ঠিক তা নয়,’ বললেন লালমোহনবাবু, ‘আমি ভাবছিলাম যদি খোদ মালিকের সঙ্গে দেখা করা যায়। অনেক ডিটেলস জানা যেত ওর কাছে।’

‘সেটা ফেলু মিস্তিরের সাহায্য ছাড়া সন্তুষ্ণ নয়।’

॥ ২ ॥

দুপুরে বুলাকিপ্রসাদের বৌয়ের রান্না। মুরগীর কারি আর অড়হড়ের ডাল থেয়ে গাড়িতে করেই বেরিয়ে পড়লাম আমরা। বুঝতে পারলাম ফেলুদারও যথেষ্ট কোতুহল আছে এই বাঘ পালানোর ব্যাপারে। বেরোবার আগে থানায় একটা ফোন করল। কোডার্মায় ওকে বিহার পুলিশের সঙ্গে কাজ করতে হয়েছিল, সর্বেশ্বর সহায়কেও এখানে সবাই চেনে, তাই নাম করতেই ইনস্পেক্টর রাউত ফেলুদাকে চিনে ফেললেন। আসলে পুলিশের সাহায্য ছাড়া হয়ত এই জরুরী অবস্থায় সার্কাসের মালিকের সঙ্গে দেখা করা মুশ্কিল হত। রাউত বললেন, সার্কাসের সামনে পুলিশের লোক থাকবে, ফেলুদার কোনো অসুবিধা হবে না। ফেলুদা এটাও বলে দিল যে সে কোনোরকম তদন্ত করতে যাচ্ছে না, কেবল কোতুহল মেটাতে যাচ্ছে।

সমস্ত শহরে যে সাড়া পড়ে গেছে সেটা গাড়িতে যেতে যেতে বেশ বুঝতে পারছিলাম। শুধু যে রাস্তার মোড়ে জটলা তা নয়, একটা চৌমাথায় দেখলাম ঢাঁঢ়া পিটিয়ে লোকদের সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে। ফেলুদা একটা পানের দোকানে চারমিনার কিনতে নেমেছিল, স্থানে দোকানদার বলল যে বাঘটাকে নাকি উত্তরে ডাহির বলে একটা আদিবাসী গামের কাছাকাছি দেখা গেছে, তবে কোনো উৎপাতের কথা এখনো শোনা যায়নি।

সার্কাসের তাঁবু দেখলেই বুকের ভিতরটা কেমন জানি করে ওঠে, ছেলেবেলা ফেলুদার সঙ্গেই কত সার্কাস দেখেছি সে কথা মনে পড়ে যায়। গ্রেট ম্যাজেস্টিকের সাদা আর নীল ডোরাকাটা ছিমছাম তাঁবুটা দেখলেই বোৰা যায় এটা জাত সার্কাস। তাঁবুর চুড়োয় ফরফর করে হলদে ফ্ল্যাগ উড়ছে, চুড়ো থেকে বেড়া অবধি টেনে আনা দড়িতে আরো অজস্র রঙিন ফ্ল্যাগ। তাঁবুর গেটের বাইরে কমপক্ষে হাজার লোক, তারা অনেকেই টিকিট কিনতে এসেছে। বাঘ পালানোয় সার্কাস বন্ধ হয়নি, শুধু আপাতত বাঘের খেলাটাই স্থগিত। আরো কতরকম খেলা যে সে সার্কাসে দেখানো হয় সেটা হাতে আঁকা প্রকাণ্ড বড় বড় বিজ্ঞাপনে বোঝানো হয়েছে। শিল্পী খুব পাকা নন, তবে লোকের মনে চনমনে ভাব আনতে এই যথেষ্ট।

পুলিশের লোক গেটের বাইরেই ছিল। ফেলুদা কার্ডটা দিতেই খুব খাতির করে

ভিতরে ঢুকিয়ে দিল। বনল, মালিক মিঃ কুট্টিকেও বলা আছে, তিনি তাঁর ঘরে
অপেক্ষা করছেন।

ତୀବ୍ରାକେ ଘରେ ବେଶ ଖାନିକଟା ଜାଯଗା ଛେଡ଼େ ତାରପର ଠିନେର ବେଡ଼ା । ଏହି ବେଡ଼ାର ମଧ୍ୟେଇ ଏକଧାରେ ଦୌଡ଼ିଯେ ଆହେ ଦ୍ୟ ଗ୍ରେଟ ମ୍ୟାଜେସ୍ଟିକ ସାର୍କାରୀରେ ମାଲିକ ମିଃ କୁଟ୍ଟିର କ୍ୟାରାଭ୍ୟାନ । ବଲା ଯାଯ ଏକଟା ସୁଦୃଶ୍ୟ ଚଳନ୍ତ ବାଡ଼ି । ଦୁ'ପାଶେର ସାର ବଁଧା କାଁଚେର ଜାନାଲାଯ ନକଶା କରା ପର୍ଦାର ଫାଁକ ଦିଯେ ଟୁକରୋ ଟୁକରୋ ରୋଦ ଢକେଛେ ଭିତରେ ଆବଶ୍ୟା ଅନ୍ଧକାରେ । ମିଃ କୁଟ୍ଟି ଚୟାର ଛେଡ଼େ ଉଠେ ଆମାଦେର ତିନଙ୍ଗନେର ସଙ୍ଗେ ହ୍ୟାନ୍ତଶେକ କରେ ବସବାର ଜନ୍ୟ ମିନି-ସୋଫା ଦୋଖେ ଦିଲେନ । ଭଦ୍ରଲୋକେର ଗାୟେର ରଂ ମାଜା, ବୟସ ପଥିଗାଶେର ବେଶି ନା ହଲେଓ ମାଥାର ଚଳୁ ଧପଧପେ ସାଦା, ହାସଲେ ବୋଧା ଯାଯ ଦାଁତ ଓ ଚଳେର ସଙ୍ଗେ ମାନନ୍ତସିଇ, ଯଦିଓ ଫଳସ ଟାଥ ନମ୍ବ ।

ফেলুন্দা প্রথমেই বলে নিল যে ও পুলিশের লোক নয়, সার্কস ওর খুব প্রিয় জিনিস, গ্রেট ম্যাজিস্টিকের ঝাতির কথা ও জানে, হাজারিবাগে এসে সার্কস দেখার ইচ্ছে ছিল, আপসোস এই যে একটা দুর্ঘটনার জন্য আসল খেলাটাই দেখা হবে না। সেই সঙ্গে লালমোহনবাবুরও পরিচয় করিয়ে দিল একজন বিশিষ্ট লেখক বলে। —‘সার্কস নিয়ে একটা গল্প লেখার কথা ভাবছেন মিঃ গাঙ্গুলী।’

মিঃ কুটি বললেন, সার্কাসে আসার আগে ছবছর উনি কলকাতায় একটা জাহাজ কোম্পানিতে ছিলেন, বাঙালীদের ভালোবাসেন, কারণ বাঙালীরাই নাকি সার্কাসের সত্ত্বিকার কদর করে। আমরা সার্কাস দেখায় নিরুৎসাহ বোধ করছি জেনে বললেন যে বাঘের খেলা ছাড়াও অনেক কিছু দেখার আছে গ্রেট ম্যাজিস্টিকে। —‘কাল আমাদের স্পেশাল শো ছিল, হাজারিবাগের অনেক নামকরা লোকে আমরা ইনভাইট করেছিলাম। আপনাদেরও ইনভাইট করছি।’

‘ব্যাপারটা হল কীভাবে?’ লালমোহনবাবু হিন্দি আর ইংরিজি মিশিয়ে জিগ্যেস করলেন। (আসলে জিগ্যেস করেছিলেন—‘শের তো ভাগা, বাট হাউ?’)

‘ভেরি আনফরচুনেট, মিঃ গ্যাংগুলী,’ বললেন মিঃ কুটি। ‘বাঘের খাঁচার দরজাটা ঠিকভাবে বন্ধ করা হয়নি। বাঘ নিজেই স্টেটকে মাথা দিয়ে ঠেলে তুলে পালিয়েছে। তার উপর আরেকটা গলতি হয়েছে এই যে টিনের বেড়ার একটা অংশ কে জানি ফাঁক করে বাইরে যাবে বলে শর্টকাট করেছিল তারপর আর বন্ধ করেনি। কে দোষী স্টেটা আমরা বার করেছি, আর তার জন্য প্রপার স্টেপস নিছি।’

ফেন্দা বলল, ‘বয়েতে একবার ঠিক এইভাবে বাঘ পালিয়েছিল না

‘হাঁ, ন্যাশনাল সাক্ষী। শহরের রাস্তায় বেরিয়ে গিয়েছিল বাঘ। কিন্তু বেশি দূর যাবার আগেই রিং-মাস্টার তাকে ধরে নিয়েছিল।’

এখানকার বাঘ পালানোর ব্যাপারে আরো খবর জানলাম কুট্টির কাছে। কম
করে জনা পঞ্চাশেক লোক নাকি বাঘটাকে তাঁবুর বাইরে দেখেছে। এক পেট্রোল
স্টেশনের মালিকের বাড়ির উঠোনে নাকি বাঘটা চুকেছিল। ভদ্রলোকের স্ত্রী
সেটাকে দেখতে পেয়ে ভিরমি যান। এক নেপালী-ভদ্রলোক স্কুটারে যাচ্ছিলেন,
তিনি বাঘটাকে রাস্তা পেরোতে দেখে সোজা ল্যাম্পপোস্টে ধাক্কা মেরে পাঁজরার
তিনটে হাড় ভেঙে এখন হাসপাতালে আছেন।

‘আচ্ছা, আপনাদের তো রিং-মাস্টার আছে নিশ্চয়ই ?

ରିଂ-ମାସ୍ଟାର କଥାଟା ନତୁନ ଶିଖେ ସେଟା ବ୍ୟବହାର କରାର ଲୋଭ ସାମଲାତେ ପାରଲେନ
ନା ଜୟ !

‘কে, কারাণিকার ? তার শরীর কিছুদিন থেকে এমনিতেই খারাপ যাচ্ছে। বয়স হয়েছে নিয়ারলি ফটি । ঘাড়ে একটা ব্যথা হয় মাঝে মাঝে, তাই নিয়েই খেলা দেখায় । আমার কথা শুনবে না, ডাক্তারও দেখাবে না । মাস খানেক হল তাই আমি আরেকজন লোক রেখেছি । নাম চন্দ্রন । কেরলের লোক । ভেরি গুড় । সেও বাঘ ট্রেন করে, কারাণিকার অস্থ হলে সেই খেলা দেখায় ।’

‘କାଳ ସ୍ପେଶ୍ୟାଲ ଶୋ-ତେ କେ ଦେଖିଯେଛିଲ ?’ ଫେଲୁନା ଜିଗ୍ଯେସ କରିଲ

‘কাল কারাণিকারই দেখিয়েছিল। একটা খেলা ও ছাড়া আর কেউ দেখাতে পারে না। খেলার ক্লাইম্যাঞ্জে দু’হাতে বাঘের মুখ ফাঁক করে তার মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দেয়। দুঃখের বিষয়, কাল একটা বিশ্রী গণগোল হয়ে যায়। দু’বার চেষ্টা করেও যখন বাঘ মুখ খুলল না, তখন কারাণিকার হঠাৎ চেষ্টা থামিয়ে দিয়ে খেলা শেষ করে দেয়। ফলে হাততালির সঙ্গে তাকে কিছু টিকিবিংশ শুনতে হয়েছিল।’

‘আপনি তাতে কোনো স্টেপ নেননি ?

‘নিয়েছি বৈকি । পুরনো লোক, কিন্তু তাও কথা শোনাতে হল। ও সতেরো বছর
কাজ করছে সার্কাসে । প্রথম তিনি বছর গোল্ডেনে ছিল, বাকি সময়টা এখানে ।
ওর যা নাম তা আমার সার্কাসে খেলা দেখিয়েই । এখন বলছে কাজ ছেড়ে
দেবে । খুবই দুঃখের কথা, কারণ অস্তত আরো বছর তিনিক ও কাজ করতে
পারত বলে আমার বিশ্বাস ।’

‘ବାଘ ଖୁଜିତେ ସାର୍କାସେର ଲୋକ ଯାଇନି ?

‘কারণিকারেই যাবার কথা ছিল, কিন্তু ও রাজি হয়নি। তাই চন্দনকে যেতে হয়েছে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকের সঙ্গে।’

লালমোহনবাবুর সাহস বেড়ে গেছে। বললেন, ‘কারাণ্ডিকারের সঙ্গে দেখা
করা যায়?’

‘কোনো গ্যারান্টি দিতে পারি না,’ বললেন মিঃ কুট্টি, ‘খুব মুড়ি লোক।
মরগণেশের সঙ্গে যান আপনারা, গিয়ে দেখুন সে দেখা করে কিনা।’

মুকুগেশ হল মিঃ কুট্টির পার্সনাল বেয়ারা। সে বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিল, মনিবের ছক্কমে আমাদের তিনজনকে নিয়ে গেল রিং-মাস্টারের তাঁবুতে।

তাঁবুর ভিতরে দুটো ভাগ ; একটা বসার জায়গা, আরেকটা শোবার। আশ্চর্য এই যে খবর দিতেই বেডরুম থেকে বেরিয়ে এলেন রিং-মাস্টার। ভদ্রলোকের চেহারা দেখে বলে দিতে হয় না যে উনি একজন অত্যন্ত শক্তিশালী পুরুষ, বাধের খেলা দেখানোর পক্ষে এর চেয়ে উপযুক্ত চেহারা আর হয় না। লম্বায় ফেলুদার সমান, চওড়ায় ওর দেড়। ফর্সা রঙে কুচকুচে কালো চাড়া-দেওয়া গৌফটা আশ্চর্য খুলেছে, চোখের দৃষ্টি এখন উদাস হলেও হঠাতে হঠাতে এক একটা কথা বলতে জলে ওঠে। ভদ্রলোক জানিয়ে দিলেন যে তিনি মারাঠী মালয়ালম তামিল আর ভাঙা ভাঙা ইংরিজি আর হিন্দি জানেন। শেষের দুটো ভাষাতেই কথা হল।

কারাণ্ডিকার প্রথমেই জানতে চাইলেন আমরা কোনো খবরের কাগজ থেকে আসছি কিনা। বুবলাম ভদ্রলোক লালমোহনবাবুর হাতে খাতা পেনসিল দেখেই প্রশ্নটা করেছেন। ফেলুদা প্রশ্নের জবাবটা যেন বেশ হিসেব করে দিল।

‘যদি তাই হয়, তাহলে আপনার কোনো আপত্তি আছে?’

‘আপত্তিতোনেইই, বরং সেটা হলে খুশই হব। এটা পাবলিকের জানা দরকার যে বাঘ পালানোর জন্য ট্রেনার কারাণ্ডিকার দায়ী নয়, দায়ী সার্কাসের মালিক। বাঘ দু’জন ট্রেনারকে মানে না, একজনকেই মানে। অন্য ট্রেনার আসার পর থেকেই সুলতানের মেজাজ খারাপ হতে শুরু করেছিল। আমি সেটা মিঃ কুট্টিকে বলেছিলাম, উনি গা করেননি। এখন তার ফল ভোগ করছেন।’

‘আপনি বাঘটাকে খুঁজতে গেলেন না যে?’ ফেলুদা জিগ্যেস করল।

‘ওরাই খুঁজুক না,’ গভীর অভিমানের সঙ্গে বললেন কারাণ্ডিকার।

লালমোহনবাবু বিড়বিড় করে ফেলুদাকে বাংলায় বললেন, ‘একটু জিগ্যেস করুন তোতেমন তেমন দরকার পড়লে উনি যাবেন কিনা। খবরটা পেলে বাঘ ধরা দেখা যেত। অবিশ্য একা নয়, ইন ইওর কম্প্যানি। খুব থ্রিলিং ব্যাপার হবে নিশ্চয়ই।’

ফেলুদা জিগ্যেস করাতে কারাণ্ডিকার বললেন যে বাঘকে গুলি করে মারার প্রস্তাব উঠলে তাঁকে যেতেই হবে বাধা দিতে, কারণ সুলতান ওর আঝায়ের বাড়া।

আমিও একটা জিনিস জিগ্যেস করার কথা ভাবছিলাম, শেষ পর্যন্ত ফেলুদাই করল।

‘আপনার মুখে কি বাঘ কোনোদিন আঁচড় মেরেছিল?’

‘নট সুলতান,’ বললেন কারাণ্ডিকার। ‘গোল্ডেন সার্কাসের বাঘ। গাল আর নাকের খানিকটা মাংস তুলে নিয়েছিল।’

কথাটা বলে কারাণ্ডিকার তাঁর সার্ট খুলে ফেললেন। দেখলাম বুকে পিঠে কাঁধে কত যে আঁচড়ের দাগ রয়েছে তার হিসেব নেই।

আমরা ভদ্রলোককে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে উঠে পড়লাম। তাঁবু থেকে বেরোবার সময় ফেলুদা বলল, ‘আপনি এখন এখানেই থাকবেন?’

কারাণ্ডিকার গভীর হয়ে বললেন, ‘আজ সতেরো বছর আমি সার্কাসের তাঁবুকেই ঘর বলে জেনেছি। এবার বোধহয় নতুন ডেরা দেখতে হবে।’

লালমোহনবাবু মিঃ কুট্টিকে বলে রেখেছিলেন যে তিনি ম্যাজেস্টিকের পশুশালাটা একবার দেখতে চান। মুকুগেশের সঙ্গে গিয়ে আমরা সার্কাসের অবশিষ্ট দুটি বাঘ, একটা বেশ বড় ভাল্লুক, একটা জলহস্তী, তিনটে হাতী, গোটা ছয়ক ঘোড়া আর সুলতানের গা ছমছম করা খালি খাঁচাটা দেখে বাড়ি ফিরতে ফিরতে হয়ে গেল পাঁচটা। বুলাকিপ্রসাদকে চা দেবার জন্য ডেকে পাঠাতে সে বলল, চৌধুরী সাহেবের বাড়ি থেকে একজন বাবু এসেছিলেন, বলে গেছেন আবার আসবেন।

সাড়ে ছাঁচায় এলেন প্রীতিন্দু চৌধুরী। ইতিমধ্যে সূর্য দেবার সঙ্গে সঙ্গে ঝপ করে ঠাণ্ডা পড়েছে, আমরা সবাই কেট পুলোভার চাপিয়ে নিয়েছি, লালমোহনবাবুর মাফিক্যাপটা পরার মতো ঠাণ্ডা এখনো পড়েনি, কিন্তু ওর টাক বলে উনি রিস্ক না নিয়ে এর মধ্যেই ওটা চাপিয়ে বসে আছেন।

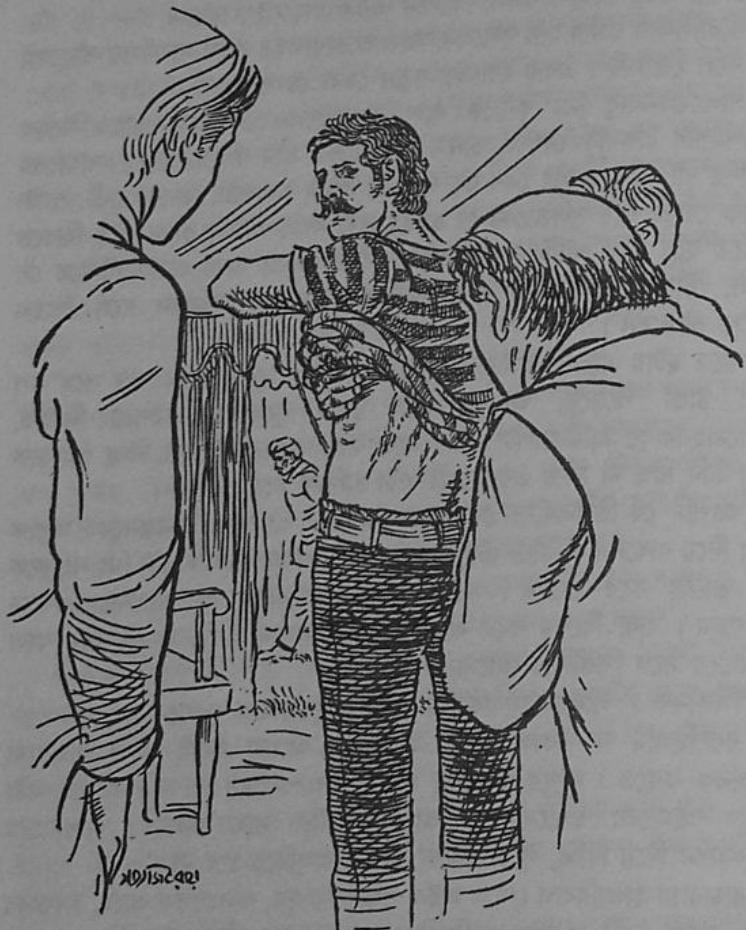
‘আপনি যে ডিটেকটিভ সেটা তো বলেননি!’ আমাদের তিনজনকেই অবাক করে দিয়ে বললেন প্রীতিন্দু চৌধুরী। —‘বাবা তো আপনার মক্কেল মিঃ সহায়কে খুব ভালো করে চেনেন। সহায় ওঁকে জানিয়েছেন যে আপনারা এখানে আসছেন। বাবা বিশেষ করে বলে দিয়েছেন আপনারা তিনজনেই যেন কাল আমাদের সঙ্গে পিকনিকে আসেন।’

‘পিকনিক?’ লালমোহনবাবু ভুরু কপালে তুলে প্রশ্ন করলেন।

‘বলেছিলাম না—কাল বাবার জন্মদিন। আমরা সবাই যাচ্ছি রাজরাম্পা পিকনিক করতে। দুপুরে ওখানেই খাওয়া। আপনাদের তো গাড়ি রয়েছে, নটা নাগাদ আমাদের ওখানে চলে আসুন। বাড়ির নাম কৈলাস। আপনাদের ডিরেকশন দিয়ে দিচ্ছি, খুঁজে পেতে কোনো অসুবিধে হবে না।’

রাজরাম্পা হাজারিবাগ থেকে মাইল পথগাশেক দূর, জলপ্রপাত আছে, চমৎকার দৃশ্য, আর একটা পুরানো কালীমন্দির আছে—নাম ছিমন্তার মন্দির। এসব আমরা আসবার আগেই জেনে এসেছি, আর পিকনিকের নেমন্টন না হলে নিজেরাই যেতাম।

প্রীতিন্দু আরো বললেন যে আমরা যদি একটু আগে আগে যাই, তাহলে মহেশবাবুর প্রজাপতি আর পাথরের কালেকশনটাও দেখা হয়ে যেতে পারে।



‘কিন্তু পিকনিকে যে যাচ্ছেন আপনারা, বাঘ পালানোর খবরটা জানেন কি ? ধরা গলায় প্রশ্ন করলেন জটায়।

‘জানি বৈকি !’ হেসে বললেন প্রীতীনবাবু, ‘কিন্তু তার জন্য ভয় কী ? সঙ্গে বন্দুক থাকবে। আমার বড়দা ক্যাক শট। তাছাড়া বাঘতো শুনেছি উত্তরে হানা দিচ্ছে, রাজরাপ্পা তো দক্ষিণে, রামগড়ের দিকে। কোনো ভয় নেই।’

ঠিক হল আমরা সাড়ে আটটা নাগাদ মহেশ চৌধুরীর বাড়িতে পৌঁছে যাব। লালমোহনবাবু ‘কৈলাস নাম দিল কেন, মশাই’-এর উত্তরে ফেলুদা বলল, শিবের বাসস্থান কৈলাস, আর মহেশ শিবের নাম, তাই কৈলাস।

প্রীতীনবাবু চলে যাবার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুরঘৃতি অঙ্ককার হয়ে এল। আমরা বারান্দায় বেতের চেয়ারে এসে বাতিটা জ্বালাম না, যাতে চাঁদের আলো উপভোগ করা যায়। ছিমস্তার মন্দিরের কথাটা লালমোহনবাবু জানতেন না, তাই বোধহয় মাঝে মাঝে নামটা বিড়বিড় করছিলেন। সাতবারের বার ছিন্ন বলেই থেমে যেতে হল, কারণ ফেলুদা হাত তুলেছে।

আমরা তিনজনেই চুপ, যিয়ি পোকার ডাক ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই, এমন সময় শোনা গেল—বেশ দূর থেকে, তাও গায়ের রক্ত জল করা—বাঘের গর্জন। একবার, দুবার, তিনবার।

সুলতান ডাকছে।

কোনদিক থেকে, কতদূর থেকে, সেটা বুঝাতে হলে শিকারীর কান চাই।

॥ ৩ ॥

আমি ভেবেছিলাম যে সার্কাসের বাঘ পালানোটাই বুঝি হাজারিবাগের আসল ঘটনা হবে ; কিন্তু তা ছাড়াও যে আরো কিছু ঘটবে, আর ফেলুদা যে সেই ঘটনার জালে জড়িয়ে পড়বে, সেটা কে জানত ? ২৩শে নভেম্বর মহেশ চৌধুরীর বার্থডে পিকনিকের কথাটা অনেকদিন মনে থাকবে, আর সেই সঙ্গে মনে থাকবে রাজরাপ্পার আশচর্য সুন্দর রূক্ষ পরিবেশে ছিমস্তার মন্দির।

কাল রাত্রে বাঘের ডাক শোনার পর থেকেই লালমোহনবাবুর মুখটা জানি কেমন হয়ে গিয়েছিল, ভাবছিলাম বলি উনি আমাদের ঘরে আমার সঙ্গে শোন, আর ফেলুদা পশ্চিমের ঘরটা নিক, কিন্তু সেদিকে আবার ভদ্রলোকের গোঁ আছে। চোকিদারের কাছে টাঙ্গি আছে জেনে, আর লোকটা বেঁটে হলেও সাহসী জেনে ভদ্রলোক খানিকটা আশ্বাস পেয়ে নিজের তিন সেলের টর্চের বদলে আমাদের পাঁচ সেলটা নিয়ে দশটা নাগাদ নিজের ঘরে চলে গেলেন। বড় টর্চ নেওয়ার কারণ এই যে, ফেলুদা বলেছে তীব্র আলো চোখে ফেললে বাঘ নাকি অনেক সময় আপনা

থেকেই সরে পড়ে।—‘অবিশ্বি জানালার বাইরে যদি গর্জন শোনেন, তখন টর্চ
জ্বালানোর কথা, আর সেই টর্চ জানালার বাইরে বাঘের ঢোকে ফেলার কথা, মনে
থাকবে কিনা স্টো জানি না।’

যাই হোক, রাত্রে বাঘ এসে থাকলেও সে গঁজন করোন, তাই ঢ় ফেলারও ক্ষেত্রে দরকার হয়নি।

আমরা প্রীতিনবাবুর নির্দেশ অনুযায়ী ঠিক সাড়ে আটটার সময় কৈলাসের লাল ফটকের সামনে গিয়ে হাজির হলাম। বাইরে থেকে বাড়িটা দেখে লালমোহনবাবু মন্তব্য করলেন যে মোঝাই যাচ্ছে এ শিব হল সাহেব শিব। সত্যই, বছর দশকে আগে তৈরি হলেও বাড়ির চেহারাটা সেই পদ্ধতি বছর আগের বিটিশ আমলের বাড়ির মতো।

দারোয়ান গেট খুলে দিতে আমরা গাড়িটা বাইরে রেখে কাঁকর বিছানো রাস্তা দিয়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। আরো তিনটে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে কম্পাউন্ডের এক পাশে: একটা কালকের দেখা প্রীতিনবাবুর কালো আমবাসাড়ির, একটা সাদ ফিলাট, আর একটা পুরানো হলদে পনচিয়াক।

‘একটা ক্ল পাওয়া গেছে মশাই !’

ଲାଲମୋହନବୁ ବାଗାନ ଆର ରାତ୍ରାର ମାଘିଥାମେ ସାଦା ରଂ କରା ଇଟେର ଡେଡ଼ାର ପାଶେ
ଥେବେ ଏକଟା କାଗଜ କୁଡ଼ିଯେ ନିଯେ ଫେଲୁଦାକେ ଦିଲେନ । ଫେଲୁଦା ବଲଲ, ‘ଆପଣି
ବତସୋର ଅବର୍ତ୍ତମାନେଇ ଝୁରେର ସଙ୍କଳନ ପାଞ୍ଚନ ?’

‘जिनिसों की बहुत मिस्टिरियास भले होचे ना ?’

একটা কুলটানা খাতার পাতা, তাতে সবুজ কালিতে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা
কিছু অর্থহীন ইংরিজি কথা। মিষ্টির কিছুই নেই, বোঝাই যাচ্ছে সেটা বাচ্চার
হাতের লেখা, আর সেই কারণেই কথাগুলোর কোনো মানে নেই।
যেমন—OKAHA, RKAHA, LOKC।

‘ପ୍ରକାଶ ଯେ ଜାପାନୀ ନାମ ମେତୋ ବୋଲାଇ ଯାଚେ’ ବଲଲେନ ଲାଲମୋହନବାବୁ ।

‘বাঙ্গলা নামটা না চিনে আগেই জাপানী নামটা চিনে ফেললেন?’—বলে
ফেলদা কাগজটা পকেটে পরে নিল।

একজন ভীষণ বুড়ো মুসলমান বেয়ারা দাঁড়িয়েছিল গাড়িবারান্দার নিচে, সে আগামের সেলাম করে ‘আইয়ে’ বলে ভিতরে নিয়ে গেল। একটা চেনা গলা আগে থেকেই পাছিলাম, বৈঠকখনার ঢোকাঠ পেরোতেই প্রীতিনিবাবু আগামের দিকে এগিয়ে এলেন।

‘ଆସନ, ଆସନ—ସୋ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଇୟ ଟୁ କାମ ।’

ঘরে ঢকে প্রথমেই চোখ চলে যায় দেয়ালের দিকে। তিন দেয়াল জুড়ে ছবির

ছিমিস্তার অভিশাপ

বদলে টাঙ্গনো রয়েছে ক্রমে বাঁধানো মহেশ চৌধুরীর সংগ্রহ করা পিনে আঁটা সার সার ডানা মেলা প্রজাপতি। প্রতি ক্রমে আটটা, সব মিলিয়ে চৌষট্টি, আর তাদের রঙের বাহারে পুরো ঘরটা যেন হাসছে।

যাঁর সংগ্রহ, তিনি সোফায় বসে ছিলেন, আমাদের দেখে হাসিমুখে উঠে দাঁড়ালেন। বুঝলাম এককালে ভদ্রলোক বেশ শক্ত সুপুরুষ ছিলেন। টকটকে রঙ, দাঢ়িগৌঁফ পরিষ্কার করে কামানো, চোখে রিমলেস চশমা, পরনে ফিলফিনে ধূতি, গরদের পাঞ্জাবি আর ঘন কাজ করা কাশীরী শাল। বুঝলাম এটা মহেশ চৌধুরীর সন্তুর বছরের জ্যাদিন উপলক্ষে স্পেশাল প্রোশাক !

প্রীতিনিবাবু শুধু ফেলুদার নামটাই জানেন, তাই বাকি দুজনের পরিচয় ফেলুদাকেই দিতে হল। ভদ্রলোক কিছু বলার আগেই লালমোহনবাবু আমাদের অবাক করে দিয়ে বললেন, ‘হ্যাপি বার্থডে ট ইউ, সাব’!

ଭଦ୍ରଲୋକ ହୋ ହୋ କରେ ହେସେ ଉଠିଲେନ ।—‘ଥ୍ୟାଙ୍କ ଇଉ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ଇଉ !’
ବୁଡୋମାନୁଷେର ଆବାର ଜୟମଦିନ । ଏମବ ଆମାର ବୌମାର କାଣ ।—ସାକ୍ତ ଆପନାରା
ଏସେ ଗିଯେ ଖୁବ ଭାଲୋଇ ହଲ । ହୋଯାର ଇଇ ଦ୍ୟ ଡେଡ ବଡ଼ ଖୁଜେ ବାର କରତେ
ଅସବିଧା ହୁଯନି ତା ?’

প্ৰশ্নটা শুনে আমাৰ আৱ লালমোহনবুৰ মুখ একসঙ্গে হাঁ হয়ে গেছে। ফেলদু কিস্তি ভূৰপ্তা একটু তুলেই নামিয়ে নিল। ‘আজ্জে না, অসবিধা হয়নি।’

‘ভেরি গুড়। আমি বুঝেছিলাম আপনি যখন গোয়েন্দা তখন হয়ত আমার সাংকেতিক ভাষা বুঝতে পারবেন। তবে আপনার দুই বন্ধু মনে হচ্ছে গোয়েন্দা।’

ଫେଲୁଦା ବୁଝିଯେ ଦିଲ । ‘କୈଲାସ ହଚ୍ଛେ “କାଇ ଲାଶ” ?’

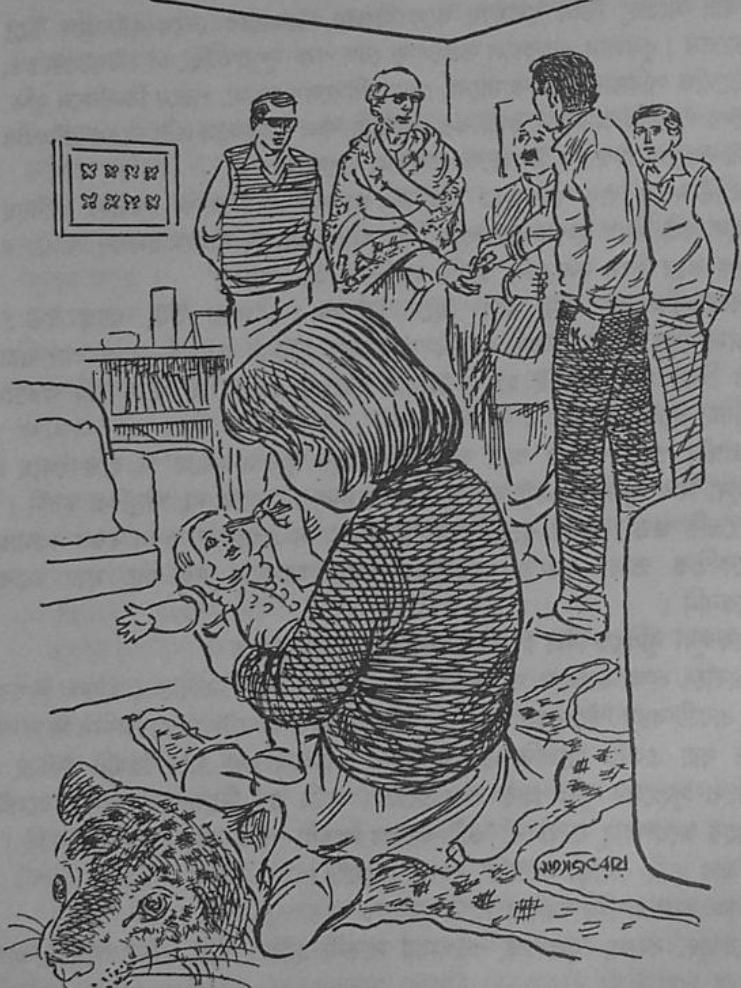
এবারে লক্ষ করলাম ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা চিতাবাঘের ছালের উপর
বসে একটি বছর পাঁচেকের মেয়ে ডান হাতে একটা চিমটের মতো জিনিস নিয়ে বাঁ
হাতে ধরা একটি বিলিতি ডলের ভুরুর জায়গায় এক মনে চিমটি কাটছে।
বোধহয় পুতুলের ভুরু প্লাক করা হচ্ছে। আমি ওর দিকে চেয়ে আছি বলেই
বোধহয় মহেশবাব বললেন, ‘ওটি আমার নাতনী ; ওর নাম জোড়া মৌমাছি।’

‘ଆରୁ ତୟି ଜୋଡ଼ା କାଟାରି’, ବଲଲ ଯେବୋଟି

‘বৰাগেনতো মিঃ মিত্র ?

ফেলুদা বলল, ‘বুঝলাম, আপনার নাতনী হলেন বিবি, আর আপনি তার
দাদা।’

ଲାଲମୋହନବାବୁ ଆମାର ଦିକେ ଫ୍ୟାଲଫ୍ୟାଲ କରେ ଚେଯେ ଆଛେନ ଦେଖେ ବୁଝିଯେ ଦିଲାମ ବିବି ହଞ୍ଚେ Bee-Bee, ଆର ଦାଦୁର ‘ଦ’ ହଳ କଟାରି ଆର ‘ଦୁ’ ହଳ ଦୁଇ । ଫେଲୁଦା ଆର ଆମି ଅନେକ ସମୟରେ ବାଡ଼ିତେ ବସେ କଥାର ଖେଳା ତୈରି କରେ ଖେଳି,



তাই এগুলো বুঝতে অসুবিধা হল না।

প্রীতীনবাবু 'দাদাকে ডাকি' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন ; আমরা তিনজনে সোফায় বসলাম। মহেশবাবুর ঠাঁটের কোণে হাসি, তিনি একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছেন ফেলুদার দিকে। ফেলুদার তাতে কোনো উসখুসে ভাব নেই, সেও দিবি উল্টে চেয়ে আছে ভদ্রলোকের দিকে।

'ওয়েল, ওয়েল, ওয়েল', অবশ্যে বললেন মহেশ চৌধুরী, 'সহায় আপনার খুব সুখ্যাতি করছিল, তাই আপনি এসেছেন শুনে তিরিকে বললুম, ভদ্রলোককে ডাক, তাকে একবার দেখি। আমার জীবনেও তো অনেক রহস্য, দেখুন যদি তার দু একটাও সমাধান করে দিতে পারেন।'

'তিরি মানে আপনার ঢৃতীয় পুত্র কি?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'বাইট এগেন', বললেন ভদ্রলোক। 'আমি যে কথা নিয়ে খেলতে ভালোবাসি সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।'

'ও বাতিকটা আমারও আছে।'

'সে তো খুব ভালো কথা। আমার নিজের ছেলেদের মধ্যে টেকা তবু একটু আধটু বোবে, তিবির মাথা এদিকে একেবারেই খেলে না। তা যাক গে—আপনি গোয়েন্দাগিরি করছেন কদিন?'

'বছর আষ্টেক।'

'আর উনি কী করেন? মিঃ গান্দুলী?'

'উনি লেখেন। রহস্য উপন্যাস। জটায়ু ছদ্মনামে।'

'বাঃ! আপনাদের কম্বিনেশনটি বেশ ভালো। একজন রহস্য-প্রট পাকান, আরেকজন রহস্যের জট ছাড়ান। ভেরি গুড়।'

ফেলুদা বলল, 'আপনার প্রজাপতি আর পাথরের সংগ্রহ তো দেখতেই পাচ্ছি; এ ছাড়া আরো কিছু জমিয়েছেন কি কোনোদিন?'

পাথরগুলো রাখা ছিল ঘরের একপাশে একটা বড় কাঁচের আলমারির ভিতর। এত রকম রঙের পাথর যে হয় তা আমার ধারণাই ছিল না। কিন্তু ফেলুদা হঠাৎ এ প্রশ্ন করল কেন? ভদ্রলোকও বেশ অবাক হয়ে বললেন, 'অন্য সংগ্রহের কথা হঠাৎ জিগ্যেস করলেন কেন?'

'আপনার নাতনীর হাতের চিমটোকে পুরানো টুইজারস বলে মনে হচ্ছে তাই—'

'বিলিয়ান্ট! বিলিয়ান্ট!'—ভদ্রলোক ফেলুদার কথার উপর তারিফ চাপিয়ে দিলেন।—'আপনার অস্তুত চোখ। আপনি ঠিক ধরেছেন, ওটা স্ট্যাম্প কালেকটরের চিমটোই বটে। ডাকটিকিট এককালে জমিয়েছি বইকি, আর বেশ যত্ন নিয়ে সিরিয়াসলি জমিয়েছি। এখনও মাঝে মাঝে গিবন্সের ক্যাটালগের

পাতা উলটোই। ওটাই আমার প্রথম হবি। যখন ওকালতি করি তখন আমার এক মক্কেল, নাম দোৱাৰবজী, আমার উপর কৃতজ্ঞতাবশে তার একটি আন্ত পুৱানো, অ্যালবাম আমাকে দিয়ে দেয়। তার নিজের অবিশ্বিশ্ব শখ মিটে গিয়েছিল, কিন্তু এ জিনিস সহজে কেউ দেয় না। বেশ কিছু দুষ্প্রাপ্য টিকিট ছিল সেই অ্যালবামে।’

আমি নিজে স্ট্যাম্প জমাই, আর ফেলুদারও এক সময় ডাকটিকিটের নেশা হয়েছিল। ও বলল, ‘সে অ্যালবাম দেখা যায়?’

‘আজ্জে?’—ভদ্রলোক যেন একটু অন্যমনক্ষ হয়ে পড়েছিলেন—‘অ্যালবাম? অ্যালবাম তো নেই ভাই। সেটা খোং গেছে।’

‘খোং গেছে?’

‘বলছি না—আমার জৌবনে অনেক রহস্য। রহস্যও বলতে পারেন, ট্র্যাজিডিও বলতে পারেন। তবে আজকের দিনটায় সেসব আলোচনা থাক।—এসো টেক্কা, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।’

টেক্কা মানে বোঝাই যাচ্ছে ভদ্রলোকের বড় ছেলে। প্রীতীনবাবুর সঙ্গে এসে ঘরে ঢুকলেন। বয়সে প্রীতীনবাবুর চেয়ে বেশ কিছুটা বড়। ইনি সুপুরুষ, যদিও মোটার দিকে, আর প্রীতীনবাবুর মতো ছটফটে নন; বেশ একটা ভারভার্তিক ভাব।

‘তিরিকে মাইক সন্দেক্ষে জিগ্যেস করলে আপনি ভালো জবাব পাবেন’, বললেন মহেশ চৌধুরী, ‘আর ইনি মাইকার কারবারি! অকৃণেন্দ্ৰ। কলকাতায় অফিস, হাজারিবাগ যাতায়াত আছে কৰ্মসূত্রে।’

‘আর দুরি বুঝি উনি?’ ফেলুদা কুপোর ফ্রেমে বাঁধানো একটা ছবির দিকে দেখাল। ফ্যামিলি গ্রুপ। মহেশবাবু, তাঁৰ স্ত্রী, আর তিন ছেলে। অন্তত বছর পঁচিশ আগে তোলা, কারণ বাপের দু'পাশে দাঁড়ানো দু'জন ছেলেই হাফ প্যাট পৱা, আর তৃতীয়টি মায়ের কোলে। দাঁড়ানো ছেলে দুটির মধ্যে যে ছোট সেই নিশ্চয় মহেশবাবুর দ্বিতীয় ছেলে।

‘ঠিকই বলেছেন আপনি,’ বললেন মহেশবাবু, ‘তবে দুরির সঙ্গে আলাপের সৌভাগ্য আপনার হবে কিনা জানি না, কারণ সে ভাগলওয়া।’

অকৃণবাবু ব্যাপারটা বুবিয়ে দিলেন। ‘বীরেন বিলেত চলে যায় উনিশ বছর বয়সে; তারপর আর ফেরেনি।’

‘ফেরেনি কি?’—মহেশবাবুর প্রশ্নে কোথায় যেন একটা খটকার সুর।

‘ফিরলে কি আর তুমি জানতে না, বাবা?’

‘কী জানি!’—সেই সুরে বললেন মহেশ চৌধুরী। ‘গত দশ বছরতোসে আমাকে চিঠিও লেখেনি।’

ঘরে কেমন একটা থমথমে ভাব এসে গেছিল বলেই বোধহয় সেটা দূর করার

জন্য মহেশবাবু হঠাতে চাঙা হয়ে সোফা ছেড়ে উঠে পড়লেন।—‘চলুন, আপনাদের আমার বাড়িটা একটু ঘূরিয়ে দেখাই। অখিল আৰ ইয়ে যখন এখনো এল না, তখন হাতে কিছুটা সময় আছে।’

‘তুমি উঠছ কেন বাবা’, বললেন অকৃণবাবু, ‘আমিই দেখিয়ে আনছি।’

‘নো স্যার, আমার প্র্যাণ কৰা আমার বাড়ি, আমিই দেখাব। আসুন, মিঃ মিষ্টির।’

দোতলায় উভয়ের রাস্তার দিকে একটা চমৎকার চওড়া বারান্দা, সেখান থেকে কানারি হিল দেখা যায়। বেডরুম তিনটৈ, তিনটেতেই এখন লোক রয়েছে। মাঝেরটায় থাকেন মহেশবাবু নিজে, এক পাশে বড় ছেলে, অন্য পাশে স্ত্রী আৰ মেয়েকে নিয়ে প্রীতীনবাবু। নিচে একটা গেস্টকুম আছে, তাতে এখন রয়েছেন মহেশবাবুৰ বন্ধু অখিল চক্রবর্তী। অকৃণবাবুৰ দুই সন্তানের মধ্যে বড়টি ছেলে, সে এখন বিলেতে, আৰ মেয়েটিৰ সামনে মাধ্যমিক পৰীক্ষা বলে সে মায়েৰ সঙ্গে কলকাতায় রয়ে গেছে।

মহেশবাবুৰ বেডরুমেও দেখলাম কিছু পাথর আৰ প্ৰজাপতি রয়েছে। একটা বুকশেলফে পাশাপাশি রাখা অনেকগুলো একৱকম দেখতে বইয়ের দিকে ফেলুদার দৃষ্টি গিয়েছিল, ভদ্রলোক বললেন, ওগুলো ওঁৰ ডায়াৰি। চলিশ বছর একটানা ডায়াৰি লিখেছেন উনি। খাটোৰ পাশে টেবিলে একটা ছোট বাঁধানো ছবি দেখে লালমোহনবাবু বলে উঠলেন, ‘আৱে, এ যে দেখছি মুকুন্দেৰ ছবি।’

মহেশবাবু হেসে বললেন, ‘আমার বন্ধু অখিল দিয়েছে ওটা।’ তারপর ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন, ‘তিনটে মহাদেশেৰ শক্তি এৰ পিছনে।’

‘কারেক্ট! বললেন লালমোহনবাবু, ‘বিৱাট তাৰিক সাধু। ইন্ডিয়া, ইউৱোপ, আমেৰিকা—সৰ্বত্র এৰ শিষ্য।’

‘আপনি তো অনেক খবৰ রাখেন দেখছি,’ বললেন মহেশ চৌধুরী, ‘আপনিও এৰ শিষ্য নাকি?’

‘আজ্জে না, তবে আমার পাড়ায় আছেন একজন।’

দোতলায় থাকতেই একটা গাড়িৰ শব্দ পেয়েছিলাম, নিচে এসে দেখি, যে-দুজনের কথা মহেশবাবু বলছিলেন, তাঁৰা এসে গেছেন। একজন মহেশবাবুই বয়সী, সাধাৱণ ধূতি পাঞ্জাবি আৰ গাঢ় খয়েৰি রঙেৰ আলোয়ান গায়ে। ইনি যে উকিল-টুকিল ছিলেন না কোনোদিন সেটা বলে দিতে হয় না, আৰ সাহেবীৱৰও কোনো গন্ধ নেই এৰ মধ্যে। অন্য ভদ্রলোককে মনে হল চলিশেৰ নিচে বয়স, বেশ হাসিখুশি সপ্রতিভ ভাব, মহেশবাবু আসতেই তাঁকে টিপ কৰে প্ৰণাম কৰলেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিৰ হাতে মিষ্টিৰ হাঁড়ি ছিল, সেটা তিনি প্রীতীনবাবুৰ হাতে চালান দিয়ে মহেশবাবুৰ দিকে ফিরে বললেন, ‘আমাৰ কথা যদি শোনতো

পিকনিকের পরিকল্পনাটা বাদ নাও। একে যাত্রা অশুভ, তার উপর বাঘ পালিয়েছে। শার্দুলবাবাজী যদি মুক্তানন্দের শিষ্যটিয়ে হন তাহলে একবার ছিমন্তায় হাজিরা দেওয়াটা কিছুই আশ্চর্য নয়।'

মহেশবাবু আমাদের দিকে ফিরে বললেন, 'আলাপ করিয়ে দিই—এই কুড়াক-ডাকা ভদ্রলোকটি হলেন আমার অনেকদিনের বক্ষু শ্রীঅখিলবক্ষু চক্ৰবৰ্তী, এক্স-স্কুলমাস্টার, জ্যোতিষচৰ্চা আৰ আযুৰ্বেদ হচ্ছে এনার হৰি; আৰ ইনি হলেন শ্রীমান শক্রলাল মিশ্র, আমার অত্যন্ত মেহের পাত্ৰ, বলতে পারেন আমার মিসিং পুত্ৰের স্থান অনেকটা অধিকার কৰে আছেন।'

সবাই যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে দেখে অখিলবাবু আৱেকবাৰ বললেন, 'তাহলে আমার নিমেধ কেউ মানছে না ?'

'না ভাই, বললেন মহেশ চৌধুৰী, 'আমি খবৰ পেয়েছি বাঘের নাম সুলতান, কাজেই সে মুসলমান, তাৰিক নয়।—ভালো কথা, মিঃ মিত্রি যদি সময় পানতো সার্কস্টা একবার দেখে নেবেন। আমাদের ইনভাইট কৰেছিল পৰশু। বৌমা আৰ বিবিদিমণিকে নিয়ে আমি দেখে এসেছি। দিশী সার্কস যে এত উন্নতি কৰেছে জানতাম না। আৰ বাঘের খেলার তো তুলনাই নেই।'

'কিন্তু পৰশু নাকি বাঘের খেলায় গোলমাল হয়েছিল ?' প্ৰশ্ন কৰলেন লালমোহনবাবু।

'সেটা খেলোয়াড়ের কোনো গণগোলে নয়। জানোয়াৱেৰও তো মুড় বলে একটা জিনিস আছে। সে-তো আৰ কলেৱ পুতুল না যে চাৰি টিপলেই লফবাস্প কৰবে।'

'কিন্তু সেই মুড়ের ঠেলাতো এখন সামলানো দায়,' বললেন অকণবাবু। 'শহৰে তো প্যানিক ওটাকে এক্ষুনি মেৰে ফেলা উচিত। বিলিতি সার্কস হলে এ জিনিস কক্ষনো হত না।'

মহেশবাবু একটা শুক্নো হাসি হেসে বললেন, 'হাঁ—তুমি তো আবাৰ বন্যপশু-সংহার সমিতিৰ সভাপতি কিনা, তোমাৰ হাত তো নিশ্চিপিশ কৰবেই।'

রাজরাষ্ট্ৰা রওনা হবাৰ আগে আৱেকজনেৰ সঙ্গে আলাপ হল। উনি হলেন প্ৰীতিনিবাবুৰ শ্রী নীলিমা দেবী। এঁকে দেখে বুঝলাম যে চৌধুৰী পৰিবাৰেৱ সকলেই বেশ ভালো দেখতে।

॥ ৪ ॥

রাজরাষ্ট্ৰা হাজিৱিবাগ থেকে আশি কিলোমিটাৰ। ৪৮ কিলোমিটাৰ গিয়ে রামগড় পড়ে, সেখান থেকে বাঁয়ো রাস্তা ধৰে গোলা বলে একটা জায়গা হয়ে

ভেড়া নদী পৰ্যন্ত গাড়ি যায়। নদী হেঁটে পেৱিয়ে খানিকদূৰ গিয়েই রাজরাষ্ট্ৰা।

শক্রলাল মিশ্রেৰ গাড়ি নেই। তিনি আমাদেৱ গাড়িতেই এলেন। দু'জন বেয়াৰাকেও নেওয়া হয়েছে পিকনিকেৰ দলে, তাদেৱ একজন হল বুড়ো নূৰ মহম্মদ, যে মহেশবাবুৰ ওকালতিৰ জীবনেৰ শুৰু থেকে আছে। অন্য জন হল যণ্ডা মাৰ্কা জগৎ সিং, যাৰ জিঞ্চায় রয়েছে অৱণবাবুৰ বন্দুক আৰ টেটাৰ বাক্স।

মিঃ মিশ্রকে দেখেই বেশ ভালো লেগেছিল, তাৰ সঙ্গে কথা বলে আৱো ভালো লাগল। ভদ্রলোকেৰ জীবনেৰ ঘটনাও শোনবাৰ মতো। শক্রলালেৰ বাবা দীনদয়াল মিশ্র ছিলেন মহেশবাবুৰ দারোয়ান। আজ থেকে পঁয়ত্ৰিশ বছৰ আগে, যখন শক্রলালেৰ বয়স চার—দীনদয়াল নাকি একদিন হঠাৎ নিখৌজ হয়ে যায়। দু'দিন পৰে এক কাঠুৰে তাৰ মৃতদেহ দেখতে পায় মহেশবাবুৰ বাড়ি থেকে প্ৰায় সাত-আট মাইল দূৰে একটা জঙ্গলেৰ মধ্যে। কোনো জানোয়াৱেৰ হাতে তাৰ মৃত্যু হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু দীনদয়াল ওই জঙ্গলে কেন গিয়েছিল সেটা জানা যায়নি। একটা পুৱালো শিবমন্দিৰ আছে সেখানে, কিন্তু দীনদয়াল কোনোদিন সেখানে যেত না।

এই ঘটনার পৰ থেকে নাকি মহেশবাবুৰ ভীষণ মায়া পড়ে যায় বাপহাৰা চার বছৰেৰ শিশু শক্রলালেৰ উপৰ। তিনি শক্রলালকে মানুষ কৰাব ভাৰ নেন। শক্রলালও খুব বুদ্ধিমান ছেলে ছিল; পৰীক্ষায় বৃত্তি পায়, বি এ পাশ কৰে রাঁচিতে শক্র বুক স্টোৰ্স নামে একটা বইয়েৰ দেকান খোলে। হাজিৱিবাগে ব্ৰাহ্ম আছে, দু'জায়গাতোই যাতায়াত আছে ভদ্রলোকেৰ।

এই খৰটা শুনে অবিশ্য লালমোহনবাবু জিগ্যেস কৰাব লোভ সামলাতে পাৱলেন না এই বইয়েৰ দেকানে বাঙলা বইও পাওয়া যায় কিনা। 'নিশ্চয়ই', বললেন শক্রলাল, 'আপনাৰ বইও বিক্রী কৰেছি আমৱা।'

ফেলুদা সব শুনে বলল, 'মহেশবাবুৰ দ্বিতীয় ছেলে তাহলে আপনারই বয়সী ছিলেন ?'

'বীৰেন্দ্ৰ ছিল আমাৰ চেয়ে কয়েক মাসেৰ ছোট,' বললো শক্রলাল। 'আমৱা দুজন ইন্দুলো এক ক্লাসেই পড়েছি, যদিও কলেজেৰ পড়াটা ওৱা তিন ভাইই কৰেছে কলকাতায় ওদেৱ এক জ্যাঠামশাইয়েৰ বাড়িতে থেকে। বীৰেন্দ্ৰেৰ পড়াশুনায় মন ছিল না। সে ছিল বেপৰোয়া, রোম্যান্টিক প্ৰকৃতিৰ ছেলে। উনিশ বছৰ বয়সে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়।'

ফেলুদা বলল, 'মহেশবাবু কি সাধুসংস্কৃত-টৰ্গ কৰেন নাকি ?'

'আগে কৰতেন না মোটেই, তবে ওঁৰ জীবনে অনেক পৱিত্ৰতা হয়েছে। আমি যদিও দেখিনি, তবে শুনেছি এককালে মিলিটাৰি মেজাজ ছিল, প্ৰচুৰ মদপান কৰতেন। সব ছেড়ে দিয়েছেন।। সাধুসঙ্গ না কৱলেও, আমাৰ বিশ্বাস আজ

রাজরাম্পায় পিকনিকের কারণ ছিমমন্তার মন্দির ।

‘এটা কেন বলছেন?’

‘উনি বাইরে বিশেষ প্রকাশ করেন না, কিন্তু আম এর আগেও কথেকবার
রাজরাম্পা গিয়েছি ওঁর সঙ্গে। মন্দিরের সামনে এলে ওঁর মুখের ভাব বদলে যায়
এটা লক্ষ করেছি।’

‘অতীতে কি এমন কোনো ঘটনা ঘটে থাকতে পারে যার ফলে এত হওয়া
সম্ভব?’

‘সেটা আমি বলতে পারব না। ভুলে যাবেন না, আমি ছিলাম তার দায়োয়ানীরে
ছেলে।’

সাড়ে দশটা নাগাদ পরপর তিনখনা গাড়ি এসে থামল ভেড়া নদীর ধারে। আমাদের গাড়িটা ছিল সবচেয়ে পিছনে; আমাদের সামনে প্রীতিনবাবুর গাড়ি। তিনিই প্রথমে নামলেন গাড়ি থেকে, হাতে টেপ রেকর্ডার আর নেমেই চলে গেলেন বাঁয়ে জঙ্গলের দিকে। আমরা সবাই নামলাম। মহেশবাবু ছিলেন প্রথম গাড়িতে, তিনি আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বললেন, ‘তাড়া নেই, নদী পেরিয়েই রাজারাঙ্গা, সঙ্গে ফ্লাক্সে কফি আছে, একটু রিল্যাক্স করে তবে ওপারে যাত্রা।’

আমরা সবাই নদীর দিকে এগিয়ে গেলাম। পাহাড়ে নদা, থাকে বলে খরস্তো। বর্ষার ঠিক পরে এ নদী পেরোনো নাকি মুশকিল, কারণ তখন জল থাকে হাঁটু অবধি। ছোট বড় মেজ সেজো নানান সাইজের সাদা কালো খয়েরি পাটকিলে ছিটার সব পাথর ডিঙিয়ে পাশ কাটিয়ে, যুগ যুগ ধরে সেগুলোকে মোলায়েম করে, পালিশ করে ব্যস্তবাগীশ ভেড়া নদী তড়িঘড়ি ছুটে চলেছে দামোদরে ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে। এই বাঁপের জায়গাই হল রাজরাপ্তা।

ନୀଲିମା ଦେବୀ କଫି ଚେଲେ ଦିଲେନ କାଗଜେର କାପେ, ଆମରା ସବାଇ ଏକେ ଏକେ ଗିଯେ ନିଯେ ନିଲାମ । ପ୍ରୀତିନିବାବୁକେ ବୋଧହ୍ୟ ନଦୀର ଶନ୍ଦ ବୌଚିଯେ ପାଥିର ଡାକ ରେକର୍ଡ କରତେ ହବେ ବଳେ ବନେର ଏକଟୁ ଭିତର ଦିକେ ଯେତେ ହେଯେଛେ । ପାଥି ଯେ ଡାକଛେ ନାନାରକମ୍ ସେଟ୍ ଠିକ୍ଇ ।

এখানে এসে নতুন যাদের সঙ্গে আলাপ হল, ফেলুদার কায়দায় তাদের একটু স্টোড়ি করাৰ ছেষ্টা কৰলাম।

ବୟାମେ ସେ ସବଚେଯେ ଛୋଟ, ମେ ତାର ଡଲଟାକେ ଏକଟା ପାଥରେ ଉପର ବସିଯେ ଦିଯେ ବଲଲ, 'ଚୁପାଟି କରେ ବସେ ଥାକ । ଦୁଷ୍ଟମି କରନେଇ ଭେଡା ନଦୀତେ ଫେଲେ ଦେବ, ତଥନ ଦେଖିବେ ମଜା ।'

অরুণবাবু হাত থেকে কাগজের কাপ ফেলে দিয়ে একটু দূরে একটা বোপের পিছনে অদৃশ্য হলেন, আর তার পরেই বোপের মাথার উপর খোঁয়া দেখে বুঝালাম এই বয়সেও ভদ্রলোক বাপের সামনে সিগারেট খান না ।

মহেশ চৌধুরী হাত দুটো পিছনে জড়ে করে নদীর কাছেই দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে
জলের দিকে ঢেয়ে আছেন।

ফেলুদা দুটো পাথর ঠোকাঠুকি করে সেগুলো চকমকি কিনা পরীক্ষা করছিল, অধিলবাবু তার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, ‘আপনার রাশিটা কি জানা আছে?’ ফেলুদা বলল, ‘কুণ্ঠ! সেটা গোয়েন্দার পক্ষে ভালো না খারাপ?’

ନୀଲିମା ଦେବୀ ମାଟି ଥେକେ ଏକଟା ବୁଲୋ ହଲଦେ ଫୁଲ ତୁଳେ ସେଟା ଖୌପାଇଁ ଶୁଙ୍ଗେ
ଲାଲମୋହନବାସୁର ଦିକେ ଏଗିଯେ ଗିଯେ କୀ ଏକଟା ବଲାୟ ଲାଲମୋହନବାସୁ ମାଥଟି
ପିଛନେ ହେଲିଯେ ଶ୍ମାର୍ଟଲି ହାସତେ ଗିଯେ ଏକ ଲାକ୍ଷେ ବୌଯେ ସରେ ଗେଲେନ, ଆର ନୀଲିମା
ଦେବୀ ଖୋଲା ହାସି ହେସେ ବଲଲେନ, ‘ମେ କୀ, ଆପଣି ତିବରିଟି ଦେବେ ଭୟ ପାରେନ?’

শক্রলালকে খুজতে গিয়ে দেখি উনি ইতিমধ্যে কখন জানি নদী পেরিয়ে গিয়ে ওপারে একজন গেরয়াধারী ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছেন। একটা বাসে কিছু যাত্রী এসেছিল, তারা একটুক্ষণ আগেই নদী পেরিয়েছে সেটা দেখেছিলাম।

কফি খাওয়া শেষ, প্রীতিনিবাবুও এসে গেছেন, তাই আমরা ওপারে যাবার জন্য তৈরি হলাম। ধূতি, শাড়ি, প্যান্ট সবই একটু ওপরদিকে উঠে গেল, বিবি চড়ে বসল বুড়ো নূর মহম্মদের পিঠে, লালমোহনবাবু জলে নামবার আগে মনে হল চোখ বুজে কী জানি বিড়বিড় করে নিলেন, পেরোবার সময় বার তিনেক বেসামাল হতে হতে সামলে নিলেন, আর ওপারে পৌঁছিয়েই বললেন ব্যাপারটা যে এত সহজ সেটা উনি ভাবতেই পারেননি।

ବାକି ପଥଟାର ଦୁ ପାଶେ ଗାହପାଳା ଛିଲ, ଯଦିଓ ସେଟାକେ ଜଙ୍ଗଲ ବଲା ଚଲେ ନା
ତାଓ ଲାଲମୋହନବାବୁ ସେଦିକେ ବାରବାର ଆଡ଼ିଚୋଇସେ ଚାଓୟାତେ ବୁଝିଲାମ ଉନି ବାହେବ
କଥା ଭୋଲେନନି ।

একটা মোড় ঘুরতেই থিয়েটারের পর্দা সরে যাওয়ার মতো চোখের সামনে
রাজরান্না বেরিয়ে পড়াতে লালমোহনবাবু এত জোরে বাঃ বললেন যে পাশের গাছ
থেকে একসঙ্গে দট্টো ঘঘ উড়ে পালাল ।

ଅବଶ୍ୟ ବାଃ ବଲାର ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ଛିଲ । ଆମରା ଯେଖାନେ ଏମେ ଦାଙ୍ଗିଯେଇ ସେଖାନ ଥେକେ ଦୁଟୋ ନଦୀଇ ଦେଖା ଯାଚେ । ବାଁ ଦିକେ ଉତ୍ତରେ ଭେଡ଼ା, ଆର ଡାଇନେ ନିଚେ ଦାମୋଦର । ଜଳପ୍ରପାତେର ଜ୍ୟାଗଟା ଦେଖତେ ହଲେ ଆରୋ ଏଗିଯେ ବାଁଯେ ଯେତେ ହବେ, ଯଦିଓ ଶବ୍ଦଟା ଏକାନ ଥେକେଇ ପାଇଁ । ସାମନେ ଆର ନଦୀର ଓପାରେ ବିଶାଲ ବିଶାଲ କଞ୍ଚପେର ପିଠୀରେ ମତୋ ପାଥ୍ର, ଦରେ ବନ, ଆର ଆରୋ ଦରେ ଆବହା ପାହାଡ଼େର ଲାଇନ

ମନ୍ଦିର ଆମାଦେର ବାଯେ ବିଶ ହାତେର ମଧ୍ୟେ । ବୋଖାଇ ସାଥୀ ଅନେକଦିନେର ପୁରାନୋ କିନ୍ତୁ ସେଟାକେ ଆବାର ନୃତ୍ୟ କରେ ସାଜଗୋଜ ପରାନୋ ହେଁଯେ । ଏହି କିମ୍ବା ଆଗେଇ କାଳିପୁଜୋଡ଼େ ଏଥାନେ ମୋଷ ବଲି ହେଁଯେଛେ ବଲେ ଶୁଣିଲାମ । ଲାଲମୋହନବାବୁ ବଲଲେନ ଏକକାଳେ ନିର୍ଧାରିତ ନରବଲି ହତ । ଅବିଶ୍ୟ ସେଟା ଯେ ଖୁବ ଭୁଲ ବଲେଛେନ ତା ହୟତ ନା ।

বাসে যেসব যাত্রী এসেছে তাদের দৃশ্য দেখার উৎসাহ নেই, তারা সবাই মন্দিরের সামনে জড়ে হয়েছে। শঙ্করলাল ঠিকই বলেছিলেন। মহেশ চৌধুরী প্রায় মিনিট থানেক ধরে মন্দিরের দরজার দিকে চেয়ে রইলেন, যদিও অঙ্ককারে বিশ্রাম দেখাই যায় না। তারপর ধীরে ধীরে চলে গেলেন অন্যরা যেদিকে গেছে সেইদিকে। আমরা তিনজনও সেইদিকেই এগিয়ে গেলাম।

খানিকটা যেতেই ফ্ল্যাট দেখতে পেলাম। যেখানে বালির উপর শতরঞ্জি পাতা হচ্ছে সেখান থেকে ওটা দেখা যাবে। লালমোহনবাবু বললেন, ‘এটা কিন্তু ফাউ হয়ে গেল মশাই। হাজারিবাগ এসে সেকেত দিনেই একজন রিটায়ার্ড আডভোকেটের জন্মদিনে পিকনিকে ইনভাইটেড হবেন, এটা কি ভাবতে পেরেছিলেন?’

‘এ তো সবে শুরু’, বলল ফেলুদা।

‘বলছেন?’

‘দাবা খেলেছেন কখনো?’

‘রক্ষে করুন মশাই।’

‘তাহলে ব্যাপারটা বুবুতেন। দাবার শেষ দিকে যখন দু'পক্ষের পাঁচটি কি সাতটি ঘুঁটি বোর্ডের এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন অনড় অবস্থাতেই তাদের পরম্পরের মধ্যে একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহ চলতে থাকে। যারা খেলছে তারা তাদের প্রত্যেকটি স্নায় দিয়ে ব্যাপারটা অনুভব করে। এই চৌধুরী পরিবারটিকে দেখে আমার দাবার ঘুঁটির কথা মনে হচ্ছে, যদিও কে সাদা কে কালো, কে রাজা কে মন্ত্রী, তা এখনো বুঝিনি।’

আমরা মন্দির আর পিকনিকের জায়গার মাঝামাঝি একটা জায়গায় একটা অশ্বথগাছের তলায় পাথরের উপর বসলাম। এগারোটাও বাজেনি এখনো, খাবার তাড়া নেই, সবাইয়ের মধ্যে একটা নিশ্চিন্ত চিলেচালা ভাব। অধিলবাবু বালিতে উবু হয়ে বসে বিবিকে হাত নেড়ে কী যেন বোঝাচ্ছেন; নীলিমা দেবী শতরঞ্জিতে বসে তাঁর ব্যাগের ভিতর থেকে একটা ইংরিজি পেপারব্যাক বার করলেন, সেটা নিয়াত ডিটেকটিভ বই; প্রাতীনিবাবু একটি চিবির উপর বসে তাঁর টেপ রেকর্ডারে একটা নতুন ক্যাসেট ভরলেন; অরূপবাবু জগৎ সিংয়ের কাছ থেকে তাঁর বন্দুকটা নিলেন, মহেশবাবু মাটি থেকে একটা পাথরের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে সেটা নেড়ে চেড়ে দেখে আবার ফেলে দিলেন। ‘শঙ্করলালকে দেখছি না’, বললেন লালমোহনবাবু।

‘আছেন, তবে দূরে’, বলল ফেলুদা।

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম মন্দির ছাড়িয়ে আরো বেশ কিছুটা দক্ষিণে একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে শঙ্করলাল কিছুক্ষণ আগে দেখা সেই গেরুয়াধারীটির

সঙ্গে কথা বলছেন। ‘একটু যেন সাস্পিশাস বলে মনে হচ্ছে, মন্তব্য করলেন লালমোহনবাবু।

ফেলুদারও সাস্পিশাস মনে হচ্ছে কিনা সেটা জানবার আগেই আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন অরূপবাবু, তাঁর হাতে বন্দুক। ‘ওটা দিয়ে কি বাধ মারা যায়?’ জিগ্যেস করল ফেলুদা।

‘সার্কাসের বাধ এতদূর আসবে না’, হেসে বললেন অরূপবাবু। ‘সাম্বার মেরেছি এটা দিয়ে, তবে সাধারণত পাথিটাখিই মারি। এটা টোয়েন্টি-টু।’

‘তাই তো দেখছি।’

‘আপনি শিকার করেন?’

‘শুধু মানুষ।’

‘আপনার কি কোনো এজেন্সি আছে নাকি? না প্রাইভেট?’

ফেলুদা তার প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর লেখা একটা কার্ড অরূপবাবুকে দিয়ে দিল। ভদ্রলোক বললেন, ‘থ্যাক্স। কখন কাজে লেগে যায় বলা তো যায় না।’

ভদ্রলোক যেদিক দিয়ে এসেছিলেন সেইদিকেই চলে গেলেন। ফেলুদা এই ফাঁকে কখন যে সেই সকালের কাগজটা পকেট থেকে বের করেছে সেটা দেখতেই পাইনি। লালমোহনবাবু কাগজটার দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, ‘বাঙলা মামের কথা কী বলছিলেন মশাই?’

‘এই দেখুন।’

ফেলুদা পাশাপাশি লেখা চারটে ইংরিজি অক্ষরের দিকে দেখাল। লালমোহনবাবু ভুক্ত ঝুঁকে বললেন, ‘ওটাতোমনে হচ্ছে লক লিখতে গিয়ে বানান ভুল করে LOKC লিখেছে।’

‘এলোকেশনি! আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। এরকম ভাবে ইংরিজি অক্ষরে বাঙলা কথা আমিও লিখেছি ছেলেবেলায়।

‘বাঃ’, বললেন লালমোহনবাবু, ‘সত্যিই তো। আর এই জাপানী নামটা?’

‘ওকাহা? এটা একটা বাংলা সেন্টেস। OKAHA!’

‘ও, কে, এ, এইচ, এ? এটা একটা বাংলা সেন্টেস? একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না কি?’

‘ও, কে, এ, এইচ, এ—এটা তাড়াতাড়ি বলুনতো, না থেমে। দেখুনতো কী রকম শোনায়।’

এবার লালমোহনবাবুর মুখে একটা বিস্ময় আর খুশি মেশানো ভাব দেখি। ‘ও কে এয়েচে! ওয়ান্ডারফুল!...বাঃ, বাঃ, এইত, জলের মতো সোজা—SO—এসো; DO—দিও; NADO—এনে দিও; NHE—এনেচি।—ও বাবো! এটা যে বিরাট সেন্টেস; এর তো শেষ নেই

মশাই !—AKLO ATBB BBSO ADK SO RO ADK SO AT KLO
PC LO ROT OT DD OK OJT RO OG এ আমার সাধ্য নেই।’

‘দৈর্ঘ্য নেই বলুন। তোপসে পড়। পাংচুয়েট করে নিলে জলের মতোসোজা।’

‘বুব বেশি না ঠেকেই পড়ে গেলাম আমি।—

‘এ কে এল ? এটি বিবি। বিবি এস। এদিকে এস। আরো এদিকে এস। এটি
কে এল ? পিসি এল। আর ওটি ? ওটি দিদি। ও কে ? ও জেঠি। আর ও ? ও
বি !’

‘ওটা কোথায় পেলেন আপনারা ?’ মহেশবাবু হাসিমুখে আমাদের দিকে
এগিয়ে এসেছেন।

‘আপনার বাগানের ধারে পড়ে ছিল,’ বলল ফেলুদা।

‘বিবিদিমিনির সঙ্গে একটু খেলা করছিলাম আর কী !’

‘সেটা আন্দাজ করেছি,’ বলল ফেলুদা। আমরা তিনজনেই উঠতে যাচ্ছিলাম,
ভদ্রলোক বাধা দিয়ে আমাদের পাশেই পাথরের উপর বসে পড়লেন।

‘আরেকটি কাগজ দেখাব আপনাদের !’

মহেশবাবুর মুখে আর হাসি নেই। পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করে তার
ভিতর থেকে একটা পুরানো ভাঁজ করা পোস্টকার্ড বার করলেন।—‘আমার
দ্বিতীয় পুত্রের শেষ পোস্টকার্ড !’

ফেলুদা পোস্টকার্ডটা নিয়ে ভাঁজ খুলল। একদিকে রঙিন ছবি। লেক সমেত
জুরিখ শহরের দৃশ্য। উন্টেদিকে শুধুই নাম ঠিকানা দেখে আমরা সকলেই বেশ
অবাক।

মহেশবাবু বললেন, ‘শেষের দিকে ও তাই করত। শুধু জানান দিয়ে দিত
কোথায় আছে। আগেও দু’এক লাইনের বেশি লেখেনি কখনো।’

ভদ্রলোক ফেলুদার হাত থেকে পোস্টকার্ডটা নিয়ে আবার ভাঁজ করে ব্যাগে
রেখে দিলেন।

ফেলুদা বলল, ‘বীরেনবাবু বিলেতে কী করতেন সেটা জানতে পেরেছিলেন ?’

মহেশবাবু মাথা নাড়লেন। মাঝুলি চাকরি করার ছেলে ছিল না বীরেন। সে
ছিল যাকে বলে রেবেল। একটি অগ্নিশূলিঙ্গ। গতানুগতিকের একেবারে বাইরে।
তার আবার একটি হিরো ছিল। বাঙালী হিরো। একশো বছর আগে তিনিও নাকি
বাড়ি থেকে পালিয়ে জাহাজের খালাসী হয়ে বিলেত যান। তারপর শেষ পর্যন্ত
ব্রেজিল না মেঞ্জিকো কোথায় গিয়ে আর্মিতে ঢুকে কর্নেল হয়ে সেখানকার যুদ্ধে
অসাধারণ বীরত্ব দেখান।’

‘সুরেশ বিশ্বাস কি ?’ ফেলুদা জিগ্যেস করল। লালমোহনবাবুরও চোখ চকচক
করে উঠেছে। বললেন, ‘ইয়েস ইয়েস, সুরেশ বিশ্বাস। ব্রেজিলে মারা যান

ভদ্রলোক। কর্নেল সুরেশ বিশ্বাস।’

মহেশবাবু বললেন, ‘ঠিক বলেছেন। ওই নাম। কোথেকে তার একটা জীবনী
জোগাড় করেছিল, আর সেটা পড়েই ওর আডভেঞ্চারের শখ হয়। আমি বাধা
দিইনি। জানতাম দিলে কোনো ফল হবে না। উধাও হয়ে গেল। তারপর মাস
দুয়েক পরে এল ইউরোপ থেকে এক চিঠি। হল্যাস্ক, সুইডেন, জামানি,
অস্ট্রিয়া...কী করছে কিছু বলে না, শুধু জানিয়ে দেয় সে আছে। চলে গেছে বলে
যেমন দুঃখ হত, তেমনি নিজের চেষ্টায় নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে বলে গর্বও হত।
তারপর সিঙ্গাটি সেভনের পর আর চিঠি নেই।’

মহেশবাবু কিছুক্ষণ উদাস চোখে দূরের গাছপালার দিকে চেয়ে রইলেন।
তারপর বললেন, ‘সে আর আমার কাছে আসবে না। এত সুখ আমার কপালে
নেই। আমার উপরে যে অভিশাপ লেগেছে !

‘সে কি হে, তুমি আবার অভিশাপ-টভিশাপে বিশ্বাস কর করে
থেকে ?—অখিলবাবু আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। মহেশবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে
বললেন, ‘তুমি আমার কোষ্ঠাই বিচার করেছ অখিল, মানুষটাকে বিচার করনি।’

‘ওইখানেই তো ভুল’, বললেন অখিলবাবু, ‘মানুষের কুঠী, মানুষের রাশি গ্রহ
লগ্ন—এ সবের থেকেতো আলাদা নয় মানুষ। তোমায় বলেছিলুম সেই ফটিটুতে,
যে তোমার জীবনে একটা বড় চেঞ্জ আসছে—মনে আছে তোমার ?—শুনুন
মশাই—’ ফেলুদার দিকে ফিরলেন অখিলবাবু—‘এই যে দেখছেন একে, এখন
দেখলে বুঝতে পারবেন কি যে ইনি এককালে রাঁচি টু নেতারহাট যাবার পথে এর
একটি পুরানো ফোর্ড গাড়ি বিকল হয়ে যাওয়ায় তার উপর রাগ করে সেটাকে
পাহাড় থেকে হাজার ফুট নিচে ফেলে দিয়েছিলেন ?’

মহেশবাবু উঠে পড়েছিলেন। বললেন, ‘বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বদলায়
সেটা বলে দিতে কি জ্যোতিষীর দরকার হয় ?’

কথাটা বলে মহেশবাবু উন্নতরদিকে চলে গেলেন, বোধহয় পাথরের সন্ধানে।
অখিলবাবু বসলেন তাঁর জায়গায়। গল্প বলার মুডে ছিলেন ভদ্রলোক। বললেন,
‘আশ্চর্য লোক এই মহেশ। আমি ওর পড়শী ছিলাম। যদিও অন্য দিক দিয়ে
ব্যবধান বিস্তুর। আমি শিক্ষক, আর ও উদীয়মান আডভেঞ্চারেট। ওর ছেলেদের
চিউশনি করেছি কিছুদিন, সেই থেকে আলাপ। যালোপ্যাথিতে আস্থা ছিল না,
তাই অসুখ-টসুখ করলে মাঝে মাঝে শিকড় বাকল চেয়ে নিত আমার কাছে।
সামাজিক ব্যবধানটা কোনোদিন বুঝতে দিত না। আমার ছেলেকেও নিজের
ছেলের মতোই মেহ করত। কোনো ম্বারি ছিল না।’

‘আপনার ছেলে কী করে ?’

‘কে, অধীর ? অধীর ইঞ্জিনিয়ার। বোকারোয় আছে। খড়গপুরে পাশ করে

ডুসেলডর্ফে চাকরি নিয়ে চলে গেসল। বিদেশেই ছিল 'বছর দশেক, তারপর—'

একটা বিস্ফোরণের শব্দ অখিলবাবুর কথা থামিয়ে দিল। 'বন্দুক!'-চেঁচিয়ে
উঠল বিবি-'জেঠু পাখি মেরেছে! আমরা রাত্তিরে তিতিরের মাংস খাব!'

'দেখি মহেশ আবার কোথায় গেল?' অখিলবাবু যেন কিছুটা চিন্তিত ভাবেই
উঠে পড়লেন। 'পাথর খুঁজতে গিয়ে পা হড়কে পড়ে টড়ে গেলে জাম্বিনটাই...'

'পিকনিক বলে মনেই হচ্ছে না!' প্রাতীনবাবুর স্ত্রী হাতের বইটা বন্ধ করে
শতরঞ্জির উপর রেখে উঠে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। 'সবাই এমন ছড়িয়ে
আছে কেন বলুন তো?'

'বিদে পেলেই সুড়সুড় করে এসে হাজির হবে,' বলল ফেলুদা।

'কিছু খেললে হত না?'

'তাস?' বললেন লালমোহনবাবু, 'আমি কিন্তু ক্রু ছাড়া আর কিছু জানি না।'

'তাও আবার ঢিলে,' বলল ফেলুদা।

'তাসতো আনিনি সঙ্গে,' বললেন নীলিমা দেবী। 'এমনি মুখে মুখে কিছু খেলা
যেতে পারে!'

'জল-মাটি-আকাশ হলে লালমোহনবাবু যোগ দিতে পারেন,' বলল ফেলুদা।

'সেটা আবার কী মশাই?'

'খুব সহজ,' বললেন নীলিমা দেবী, 'ধরুন, আপনার দিকে তাকিয়ে আমি জল,
মাটি, আকাশ এই তিনটের যে কোনো একটা বলে দশ শুনতে শুরু করব। জল
বললে জলের, মাটি বললে মাটির, আর আকাশ বললে আকাশের একটা প্রাণীর
নাম করতে হবে আপনাকে ওই দশ গোনার মধ্যে।'

'এটা খুব কঠিন খেলা বুঝি?'

'খেলে দেখন একবার। আমি আপনাকেই প্রশ্ন করছি।'

'বেশ। রেডি।' লালমোহনবাবু দম নিয়ে সোজা হয়ে যোগাসনে বসলেন।
নীলিমা দেবী ভদ্রলোকের চোখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে হঠাৎ চেঁচিয়ে
উঠলেন—

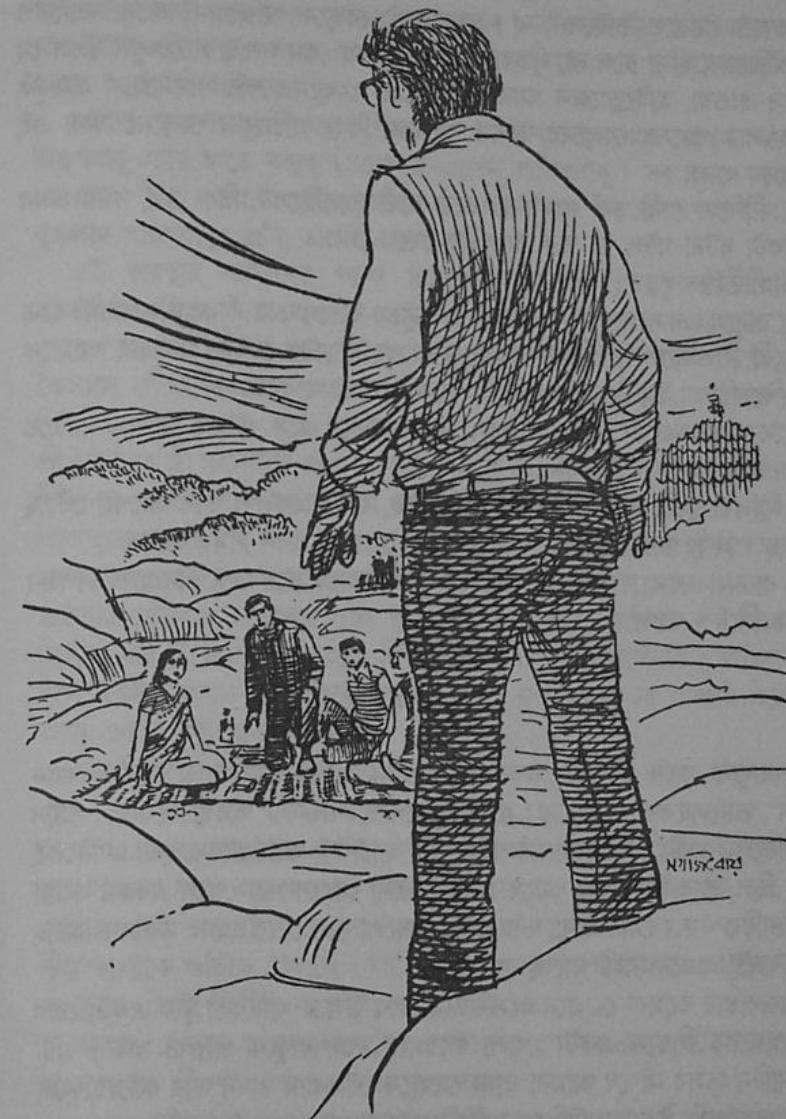
'আকাশ! এক দুই তিন চার পাঁচ—'

'ঁ-ঁ-ঁ—'

'ছয় সাত আট নয়—'

'বেঙুর!'

ফেলুদা অবিশ্বিত জানতে চাইল বেঙুরটা কোন গ্রহের আকাশে চরে বেড়ায়।
তাতে লালমোহনবাবু বললেন যে ব্যাও, হাওর আর বেলুন—এই তিনটে তিনি
ভেবে রেখেছিলেন, বলার সময় তালগোল পাকিয়ে গেছে। তাতে ফেলুদা বলল
যে বেলুনকে প্রাণী বলা যায় কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে; কিন্তু লালমোহনবাবু



কথটা মানতে চাইলেন না। বললেন, ‘বেলুনে অঙ্গিজেন লাগে, প্রাণীরও অঙ্গিজেন ছাড়া চলে না, সুতরাং প্রাণী বলব না কেন মশাই?’ ফেলুদা বলল যে সে হাওয়া, হাইড্রোজেন আর হিলিয়ামের বেলুনের কথা শুনেছে, এমনকি কয়লার গ্যাসের বেলুনের কথাও শুনেছে, কিন্তু অঙ্গিজেন বেলুনের কথা এই প্রথম শুনল।

নীলিমা দেবী তর্ক থামানোর জন্য হাত তুলেছিলেন, ঠিক সেই সময় এমন একটা ঘটনা ঘটল যে তর্ক আপনিই থেমে গেল।

প্রীতিনিবাবু।

মানুষে একসঙ্গে দুঃখ আর আতঙ্ক অনুভব করলে তার কীরকম ভাবভঙ্গী হতে পারে, লিওনার্দো দা ভিঞ্চির করা তার একটা ড্রইং ফেলুদা একবার আমাকে দেখিয়েছিল। প্রীতিনিবাবুর চেহারা অবিকল সেই ছবির মতো।

ভদ্রলোক একটা ঝোপের পিছন থেকে বেরিয়ে এসে কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে বসে পড়লেন।

নীলিমা দেবী ছুটে গেলেন স্বামীর দিকে, যদিও ফেলুদা তার আগেই পৌঁছে গেছে। কিন্তু ভদ্রলোকের মুখ দিয়ে কথা বেরোতে বেশ সময় লাগল।

‘বা....বা....বাৰা!’ বললেন প্রীতিনিবাবু, আর সঙ্গে সঙ্গে তার ডান হাতটা পিছন দিকে নির্দেশ করল।

॥ ৫ ॥

মহেশবাবুকে যখন বাড়িতে আনা হয় তখন প্রায় আড়াইটা। তখনও জ্ঞান হয়নি ভদ্রলোকের। মাথায় চোট লেগেছে, দাঁড়ানো অবস্থা থেকে স্টান পড়েছিলেন মাটিতে। ডাক্তার বলছেন হার্ট অ্যাটাক। ভদ্রলোকের হার্ট এমনিতেই দুর্বল ছিল, তার উপর এই বয়সে হঠাতে কোনো কারণে শক পেলে এরকম হওয়া অস্বাভাবিক নয়। মোট কথা, তাঁর অবস্থা ভালো নয়, সেরে ওঠার সম্ভাবনা আছে কিনা সেটা এখনো বলা যাচ্ছে না।

রাজরাঙ্গায় আমরা খে ধানে বসেছিলাম, তার উত্তরে খানিকটা দূরে একটা বেশ বড় পাথরের পিছনে একটা খোলা জায়গায় মহেশবাবুকে পাওয়া যায়। এটা কোনোদিন ভুলব না যে আমরা যখন সেখানে পৌঁছলাম তখন তাঁর কাছেই দুটো হলদে প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছিল। প্রীতিনিবাবু পাহাড় বেয়ে উপর দিকের জঙ্গলে গিয়েছিলেন, ফেরার পথে কিছুদূর নেমে এসে একটা ঝোপ পেরিয়ে নিচের দিকে চেয়ে দেখেন মহেশবাবু পড়ে আছেন মাটিতে। তিনি ভেবেছিলেন ভদ্রলোক মারাই গেছেন, তাই ওরকম চেহারা করে এসেছিলেন খবর দিতে। ফেলুদা গিয়েই

মহেশবাবুর নাড়ী ধরে বলল তিনি বেঁচে আছেন। তাঁর মাথাটা পড়েছিল একটা থান ইটের সাইজের পাথরের উপর, তার ফলে খানিকটা রক্ত বেরিয়ে পড়েছিল পাথর আর বালির উপর।

আমরা মহেশবাবুর কাছে পৌঁছানোর মিনিটখানেক পরে প্রথম এলেন অরূপবাবু, তাঁর হাতে বন্দুক। তারপর এলেন অখিলবাবু। সব শেষে এলেন শক্রলাল মিশ্র। শেষের ভদ্রলোকটিকে যেরকম ভেঙে পড়তে দেখলাম, তাতে বুকলাম মহেশবাবুর প্রতি তাঁর টান কর গভীর।

এই অবস্থায় আমাদের পক্ষে মহেশবাবুকে তুলে ভেড়া নদী পেরিয়ে হাজারিবাগ নিয়ে আসা অসম্ভব, তাই ভদ্রলোকের দুই ছেলে তৎক্ষণাৎ চলে গেলেন শহরে। ডাক্তার আর অ্যাম্বুল্যান্স নিয়ে আসতে লাগল প্রায় আড়াই ঘণ্টা, কৈলাসে পৌঁছতে আরো এক ঘণ্টা। আমরা কিছুক্ষণ কৈলাসেই রয়ে গেলাম। পিকনিক আর হয়নি, তাই কারুর খাওয়া হয়নি। কিন্তু এই অবস্থার মধ্যেই প্রীতিনিবাবুর স্ত্রী আমাদের জন্য পরোটা, আলুরদম, মাংসের কাবাব ইত্যাদি এনে দিলেন। আশ্চর্য শক্ত বলতে হবে ভদ্রমহিলা। বিবি অবিশ্যি ব্যাপারটা বুঝতেই পারছে না, বলছে দাদু মাথা ঘুরে পড়ে গেছে। আমরা বেঠকখানাতেই বসেছিলাম, অরূপবাবু ডাক্তারের সঙ্গে ছিলেন বাপের ঘরে, প্রীতিনিবাবু মাঝে মাঝে এসে ভদ্রতার খাতিরে আমাদের সঙ্গে দু একটা কথা বলে যাচ্ছিলেন। শক্রলাল নির্বাক, এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তিনি একবারও মুখ খোলেননি। অখিলবাবুর মুখে একটাই কথা—‘এত করে বললাম, তাও কথা শুনল না। আমি জানতাম আজ একটা কিছু অঘটন ঘটবে।’

চারটে নাগাদ আমরা উঠে পড়লাম। প্রীতিনিবাবু ছিলেন, তাঁকে বললাম কাল এসে খবর নিয়ে যাব কেমন থাকেন মহেশবাবু।

বাড়ি ফিরে এসে হাত মুখ ধুয়ে বারান্দায় এসে বসলাম তিনজন। একদিনে অল্প সময়ের মধ্যে অনেকগুলো ঘটনা ঘটলে মাথাটা কেমন যেন ভোঁ ভোঁ করে, আমার সেই অবস্থা। ফেলুদা কথা বলছে না, তার মানে তার ভাবনা চিন্তাগুলোকে গুছিয়ে ফেলছে। আমি জানি ও এখন বেশি কথা বলা পছন্দ করে না, তাও একটা জিনিস না বলে পারলাম না।

‘আচ্ছা ফেলুদা, ডাক্তার বলেছেন একটা শক পেলে এরকম হতে পারে, কিন্তু রাজরাঙ্গাতে কী শক পেতে পারেন মহেশবাবু?’

‘গুড় কোয়েশেন,’ বলল ফেলুদা, ‘আজকের ঘটনার ওই একটা ব্যাপারই আমার কাছে অর্থপূর্ণ। অবিশ্যি শক পেয়েছেন কিনা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না এখনো।’

‘সেটা ভদ্রলোক সুস্থ হয়ে উঠলেই ক্লিয়ার হয়ে যাবে,’ বললেন

লালমোহনবাবু।

‘উঠবেন কি সুষ্ঠু হয়ে?’

মহেশবাবু সম্বন্ধে ফেলুদার মনে যে কৌতুহলের ভাব জেগে উঠেছে, সেটা আজ কৈলাসের বৈঠকখানায় বসেই বুঝতে পারছিলাম। বেশির ভাগ সময়টাই ও ঘরের জিনিসপত্র, আলমারির বই, এই সব দেখে কাটিয়েছে। ভাবটা যে তদন্ত করছে তা নয়, বেশ ঢিলেচালা, কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম যে ও সব কিছু মনে করছে তা নয়, সেই ফ্যামিলি গুপ্টা ও হাতে তুলে নিয়ে দেখল প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে।

আদিবাসী গ্রাম থেকে মাদলের শব্দ ভেসে আসছে। হঠাৎ খেয়াল হল যে আজ ম্যাজেস্টিক সার্কাসের বায়টার কোনো খবর পাওয়া যায়নি। অবিশ্য ধরা পড়লে নিশ্চয়ই জানা যেত। অন্তত বুলাকিপ্রসাদ নিশ্চয়ই জানাত।

ঠাণ্ডাটা পড়েছে, লালমোহনবাবু তাই মাঝিক্যাপটা আরো টেনে নামিয়ে নিয়ে বললেন, ‘সিগনিফিক্যান্ট ব্যাপার।’

ভদ্রলোক বোধহয় ভেবেছিলেন আমরা দুজনেই জিগেস করব ব্যাপারটা কী; সেটা না করাতে শেষে নিজেই বললেন, ‘যে সময়টা ঘটেনাটা ঘটল, তখন কিন্তু মিসেস প্রীতীন আর খুকী ছাড়া আর কে কী করছিল তা আমরা কেউই জানি না।’

‘কেন জানব না,’ বলল ফেলুদা। ‘অরূপবাবু পাখি মারার চেষ্টা করছিলেন, প্রীতীনবাবু পাখির ডাক রেকর্ড করছিলেন, অখিলবাবু মহেশবাবুকে খুঁজছিলেন, শক্রলাল তাঁর সম্যাসী বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছিলেন, আর বেয়ারা দু’জন আমাদের বিশ হাত দ্বারে শিমুল গাছের তলায় বসে বিড়ি খাচ্ছিল।’

‘বেয়ারাদের তো আমিও দেখেছি মশাই, কিন্তু আর সবাই সত্যি কথা বলছে কিনা সেটা জানচেন কী করে?’

‘যাঁদের সঙ্গে মাত্র কয়েক ঘণ্টার আলাপ তাঁদের আচরণ সম্বন্ধে এত চট করে সন্দেহ প্রকাশ করতে আমি রাজি নই।’

‘তা বটে, তা বটে।’

ডিনারের মাঝখানে লালমোহনবাবু হঠাৎ একটা নতুন কথা ব্যবহার করলেন—‘সুপার-কেলেক্ষারি।’ এটাও বলা দরকার যে কথাটা বলার সময় তিনি চেয়ার ছেড়ে প্রায় ছ’ইঞ্চি লাফিয়ে উঠেছিলেন। ফেলুদা স্বভাবতই জিগেস করল ব্যাপারটা কী।

‘আরে মশাই, একটা জরুরী কথাই বলা হয়নি। সাংঘাতিক ক্লু। যেখানে ডেডবেডি—থুড়ি, মহেশবাবু পড়েছিলেন, তার একপাশে পায়ে কী জানি ঠেকতে চেয়ে দেখি প্রীতীনবাবুর টেপ রেকর্ডার।’

‘সেটা এনেছেন সঙ্গে?’

‘ভাবলুম পরে তুলব, তুলে ভদ্রলোককে দেব, তা তখন যা অবস্থা....ফেরার সময় দেখি সেটা আর নেই।’

‘প্রীতীনবাবু তুলে নিয়েছিলেন বোধহয়।’

‘দুর মশাই, প্রীতীনবাবু ওই দিকটাতেই ঘেসেননি। তাহাড়া জিনিসটা পড়েছিল একটা ঝোপড়ার মধ্যে; পায়ে না ঠেকলে চোখেই পড়ত না।’

ফেলুদা ব্যাপারটা নিয়ে কী যেন মন্তব্য করতে যাচ্ছিল, এমন সময় একটা টেলিফোন এল।

অরূপবাবু।

ফেলুদা দু’ একটা কথা বলেই ফোনটা রেখে বলল, ‘কৈলাস চল। মহেশবাবুর জ্ঞান হয়েছে। আমার নাম করছেন।’

গাড়িতে কৈলাস যেতে লাগল এক মিনিট।

মহেশবাবুর ঘরে সকলেই রয়েছেন, এক বিবি ছাড়া। ভদ্রলোকের মাথায় বাণ্ডেজ, চোখ আধবোজা, হাত দুটো বুকের উপর জড়ো করা। ফেলুদাকে দেখে মুখে যে হাসিটা দেখা দিল সেটা প্রায় চোখে ধরাই পড়ে না। তারপর তাঁর ডান হাতটা উঠে তর্জনীটা সোজা হল।

‘কা কা...’

‘একটা কাজের কথা বলছেন কি?’ ফেলুদা জিগেস করল।

ভদ্রলোকের মাথাটা সামান্য নড়ে উঠল হাঁ-য়ের ভঙ্গিতে। তারপর তর্জনীর পাশে মাঝের আঙুলটাও উঠে দাঁড়াল। একের জায়গায় দুই।

‘উই....উই....’

এইটুকু বলে দুটো আঙুল আবার ভাঁজ হয়ে গিয়ে সেই জায়গায় বুড়ো আঙুলটা সোজা হয়ে উঠে এদিক ওদিক নড়ল।

তারপর ভদ্রলোক বেশ কষ্ট করে ঘাড়টা ডানদিকে ঘোরালেন। ওদিকে বেডসাইড টেবিল। তার উপর মুক্তানদের ছবি।

ছবির দিকে হাতটা বাড়ানোর চেষ্টা করতে অরূপবাবু ছবিটা বাপের দিকে এগিয়ে দিলেন। মহেশবাবু সেটা নিজে না নিয়ে ফেলুদার দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। অরূপবাবু ছবিটা ফেলুদাকে দেবার পর মহেশবাবু আবার দু’আঙুল দেখালেন। কী যেন একটা বলতেও চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পারলেন না।

এর পরে আর কোনো কথা বলতে পারেননি মহেশ চৌধুরী।

তিনি মহাদেশের শক্তি যাঁর পিছনে, সেই মুক্তানন্দের ক্রমে বাঁধানো পাসপোর্ট সাইজের ছবি এখন আমাদের ঘরে। আমরা চলে আসার ঘন্টা দূয়োকের মধ্যেই মহেশবাবু মারা যান। যাবার আগে ফেলুদার উপর যে তিনি কী দায়িত্ব দিয়ে গেছেন সেটা ফেলুদা বুবালেও, আমি বুবিনি। আর লালমোহনবাবুও নিশ্চয়ই বোঝেননি, কারণ উনি বললেন মহেশবাবু নাকি ফেলুদাকে মুক্তানন্দের শিষ্য হতে বলে গেছেন। ফেলুদা যখন জিগ্যেস করল যে ছবিটা দেবার পরে দুটো আঙুল দেখানোর মানে কী, তখন লালমোহনবাবু বললেন মুক্তানন্দের শিষ্য হলে ফেলুদার শক্তি ডবল হয়ে যাবে এটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন ভদ্রলোক। ‘অবিশ্য কাঁচকলা দেখালেন কেন সেটা বোঝা গেল না?’ স্থীকার করলেন লালমোহনবাবু।

পরদিন সকালে অথিলবাবুর টেলিফোনে আমরা মৃত্যুসংবাদটা পেলাম।

এগারোটা নাগাদ শুশান থেকে ফেরার পথে লালমোহনবাবু জিগ্যেস করলেন, ‘কৈলাসে যাবেন, না বাড়ি যাবেন?’ ফেলুদা বলল, ‘এবেলা ওদিকটা না মাড়ানোই ভালো; অনেকে সমবেদনা জানাতে আসবে, কাজ হবে না কিছুই।’

‘কী কাজের কথা বলছেন?’

‘তথ্য সংগ্রহ।’

দুপুরে খাবার পর বারান্দায় বসে ফেলুদা ওর সবুজ খাতায় কিছু নোট লিখল। সেটা শেষ হলে পর এইরকম দাঁড়াল—

- ১। মহেশ চৌধুরী—জন্ম ২৩শে নভেম্বর ১৯০৭, মৃত্যু ২৪শে নভেম্বর ১৯৭৭ (স্বাভাবিক হার্ট অ্যাটাক ? শক ?)। হেঁয়ালিপ্রিয়। ডাকটিকিট, প্রজাপতি, পাথর। দোরাবজীর দেওয়া মূল্যবান স্ট্যাম্প আলবাম লোপাট (how?) মেজো ছেলের প্রতি টান। অন্য দুটির প্রতি মনোভাব কেমন? শক্রলালের প্রতি অপত্য মেহ। স্বাবরি ছিল না। অতীতে মেজাজী, মদ্যপ। শেষ বয়সে সান্ত্বিক, সদাশয়। অভিশাপ কেন?
- ২। ঐ স্ত্রী—মৃতা। কবে?
- ৩। ঐ বড় ছেলে অরঞ্জেন্দ্র—জন্ম (আন্দাজ) ১৯৩৬। অভ্যবসায়ী। কলকাতা-হাজারিবাগ যাতায়াত। মৃগয়াপ্রিয়। স্বল্পভাষী।
- ৪। ঐ মেজো ছেলে বীরেন্দ্র—জন্ম (আন্দাজ) ১৯৩৯। ‘অগ্নিশুলিঙ্গ’। ১৯ বছর বয়সে দেশ-ছাড়া। কর্নেল সুরেশ বিশ্বাসের ভক্ত। বাপকে বিদেশ থেকে চিঠি লিখত ‘৬৭ পর্যন্ত। জীবিত? মৃত? বাপের ধারণা সে ফিরে এসেছে?’

৫। ছেট ছেলে প্রীতীন্দ্র—অরঞ্জের সঙ্গে ব্যবধান অন্তত ৯-১০ বছর (ভিত্তি : ফ্যামিলি থ্রুপ)। অর্থাৎ জন্ম (আন্দাজ) ১৯৪৫। ইলেক্ট্রনিকস। পাখির গান। মিশুকে নয়। কথা বললে বেশি বলে, নিজের বিষয়। টেপ রেকর্ডার ফেলে এসেছিল রাজাগ্নায়।

৬। প্রীতীনের স্ত্রী নীলিমা—বয়স ২৫/২৬। সহজ, সপ্রতিভি।
৭। অথিল চক্রবর্তী—বয়স আন্দাজ ৭০। এক্স-স্কুলমাস্টার। মহেশের বক্তু।
ভাগ্য গণনা, আয়ুর্বেদ।

৮। শক্রলাল মিশ্র—জন্ম (আন্দাজ) ১৯৩৯। বীরেন্দ্রের সমবয়সী। মহেশের দারোয়ান দীনদিয়ালের ছেলে। দীনদিয়ালের মৃত্যু ১৯৪৩। প্রশ্ন—জঙ্গলে গিয়েছিল কেন? শক্রকে মানুষ করেন মহেশ। বর্তমানে বইয়ের দোকানের মালিক। মহেশের মৃত্যুতে মৃহুমান।

৯। নূর মহম্মদ—বয়স ৭০-৮০। চলিশ বছরের উপর মহেশের বেয়ারা।
ফেলুদা ঠিকই আন্দাজ করেছিল। দুপুরে খাওয়ার পর কৈলাসে গিয়ে শুনলাম
সকালে অনেকেই এসেছিলেন, কিন্তু একটা নাগাদ সবাই চলে গেছেন।
বৈঠকখানায় মহেশবাবুর দুই ছেলে আর অথিলবাবু ছিলেন, আমরা সেখানেই
বসলাম। প্রীতীনবাবুর অস্থির ভাবটা যেন আরো বেড়ে গেছে; একটা আলাদা
সোফার এক কোণে বসে খালি হাত কচলাচ্ছেন। অথিলবাবু মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস
ফেলছেন আর মাথা নাড়ছেন। অরূপবাবু যথারীতি গাঁজীর ও শাস্তি। ফেলুদা
তাঁকেই প্রশ্নটা করল।

‘আপনারা কি কিছুদিন আছেন?’

‘কেন বলুন তো?’

‘আপনাদের একটু সাহায্যের দরকার। মহেশবাবু একটা কাজের ভার দিয়ে
গেছেন আমাকে, কী কাজ সেটা অবিশ্য স্পষ্ট করে বলার ক্ষমতা ছিল না তাঁর।
আমি প্রথমে জানতে চাই—উনি কী বলতে চেয়েছিলেন সেটা আপনারা কেউ
বুঝেছেন কিনা।’

অরূপবাবু একটু হেসে বললেন, ‘বাবার সুস্থ অবস্থাতেই তাঁর অনেক সংকেত
আমাদের বুঝতে বেশ অসুবিধা হত। রাশভারী লোক হলেও ওঁর মধ্যে একটা
হেলেমানুষী দিক ছিল সেটার কিছুটা আভাস হয়ত আপনিও পেয়েছেন। আমার
মনে হয় বাবা শেষ অবস্থায় যে কথাগুলো বললেন সেটার উপর বেশি গুরুত্ব না
দেওয়াই ভালো।’

ফেলুদা বলল, ‘আমার কাছে নির্দেশগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ অর্থহীন বলে মনে
হয়নি।’

‘তাই বুঝি?’

‘হ্যাঁ। তবে সব সংকেত ধরতে পেরেছি এটা বলতে পারব না। যেমন ধরুন, মুক্তানন্দের ছবি।’ ফেলুদা অখিলবাবুর দিকে ফিরল। ‘আপনি ওটা সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কিছু বলতে পারেন। ছবিটা তো বোধহয় আপনারই দেওয়া।’

অখিলবাবু বিষণ্ণ হাসি হেসে বললেন, ‘হ্যাঁ, আমারই দেওয়া। মুক্তানন্দ রাঁচিতে এসেছিলেন একবার। আমার তো এসবের দিকে একটু ঝৌক আছেই চিরকাল। বেশ জেনুইন লোক বলে মনে হয়েছিল। আমি মহেশকে ঠাট্টা করে বলেছিলাম—তুমি তো কোনোদিন সাধু-সম্ম্যাসীতে বিশ্বাস-টিশ্বাস করলে না, শেষ বয়সে একটু এদিকে মন দাও না। তোমাকে একটা ছবি এনে দেব। ঘরে রেখে দিও। মুক্তানন্দের প্রভাব খারাপ হবে না। তিনটি মহাদেশে এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে, না হয় তোমার উপরেও একটু পড়ল। —তা সে ছবি যে সে তার খাটের পাশে রেখে দিয়েছে সেটা কালই প্রথম দেখলাম। অসুখের আগেতোওর শোবার ঘরে যাইনি কখনো।’

‘আপনি ওটা সম্বন্ধে জানেন কিছু?’ ফেলুদা অরূপবাবুকে প্রশ্ন করল।

অরূপবাবু মাথা নাড়লেন। ‘ও জিনিসটা যে বাবার কাছে ছিল সেটাই জানতাম না। বাবার শোবার ঘরে আমিও কালই প্রথম গেলাম।’

‘আমিও জানতাম না।’—প্রীতীনবাবুকে কিছু জিগ্যেস করার আগেই তিনি বলে উঠলেন।

ফেলুদা বলল, ‘দুটো জিনিস পেলে আমার কাজের একটু সুবিধা হতে পারে।’
‘কী জিনিস?’ অরূপবাবু জিগ্যেস করলেন।

‘প্রথমটা হল—মহেশবাবুকে লেখা তাঁর দ্বিতীয় পুত্রের চিঠি।’

‘বীরেনের চিঠি?’ অরূপবাবু অবাক। ‘বীরেনের চিঠি দিয়ে ‘কী হবে?’

‘আমার বিশ্বাস ওই ছবিটা মহেশবাবু বীরেনকে দেবার জন্য দিয়েছিলেন আমাকে।’

‘হাউ স্ট্রেঞ্জ! এ ধারণা কী করে হল আপনার?’

ফেলুদা বলল, ‘ছবিটা আমাকে দিয়ে মহেশবাবু দুটো আঙুল দেখিয়েছিলেন সেটা আপনারাও দেখেছিলেন; একটা সন্তানা আছে যে দুই আঙুল মানে দুরি। আমার ভুল হতে পারে, কিন্তু আপাতত এই বিশ্বাসেই আমাকে কাজ চালিয়ে যেতে হবে।’

‘কিন্তু বীরেনকে আপনি পাচ্ছেন কোথায়?’

‘ধরুন মহেশবাবু যদি ঠিকই দেখে থাকেন; যদি সে এখানে এসে থাকে।’

অরূপবাবু তাঁর বাপের মৃত্যুর কথা ভুলে গিয়ে হো হো করে হেসে উঠলেন।

‘বাবা গত পাঁচ বছরে কতবার বীরেনকে দেখেছেন তা আপনি জানেন? বিশ বছর যে ছেলে বিদেশে, বাবা তাঁর দুর্বল দৃষ্টি দিয়ে তাকে এক বলক দেখেই চিনে

ফেলবেন এটা আপনি ভাবছেন কী করে?’

‘আপনি ভুল করছেন অরূপবাবু, আমি নিজে একবারও ভাবছি না যে বীরেনবাবু ফিরে এসেছেন। কিন্তু তিনি যদি দেশের বাইরেও কোথাও থেকে থাকেন, তাহলেও আমার দায়িত্ব দায়িত্বই থেকে যায়। তিনি কোথায় আছেন জেনে জিনিসটা তাঁর হাতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে আমাকে।’

অরূপবাবু একটু নরম হয়ে বললেন, ‘বেশ। আপনি দেখবেন বীরেনের চিঠি। বাবা সব চিঠি এক জায়গায় রাখতেন। বীরেনের চিঠিগুলো আলাদা করে বেছে রাখব।’

‘ধন্যবাদ’, বলল ফেলুদা, ‘আর দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে—মহেশবাবুর ডায়রি। সম্ভব হলে সেগুলোও একবার দেখব।’

আমি ভেবেছিলাম অরূপবাবু এতে আপত্তি করবেন, কিন্তু করলেন না। বললেন, ‘দেখতে চান দেখতে পারেন। বাবা তাঁর ডায়রির ব্যাপারে কোনো গোপনতা অবলম্বন করতেন না। তবে আপনি হতাশ হবেন, মিঃ মিস্টার।’

‘কেন?’

‘বাবার মতো ওরকম নীরস ডায়রি আর কেউ লিখেছে কিনা জানি না। অত্যন্ত মাঝুলি তথ্য ছাড়া আর কিছু নেই।’

‘হতাশ হবার বুঁকি নিতে আমার আপত্তি নেই।’

চিঠির ব্যাপারে ঠিক হল অরূপবাবু আর প্রীতীনবাবু ভাইয়ের গুলো বেছে আলাদা করে রাখেন, সেগুলো কাল সকালে ফেলুদাকে দেওয়া হবে। ডায়ারিগুলো আজই নিয়ে যাব আমরা, আর কালই ফেরত দিয়ে দেব। বুঝলাম ফেলুদাকে আজ রাত জাগতে হবে, কারণ ডায়রির সংখ্যা চালিশ।

তিনজনে ভাগভাগি করে খবরের কাগজে মোড়া মহেশ চৌধুরীর ডায়রির সাতটা প্যাকেট নিয়ে কেলাসের কাঁকরবিছানো পথ দিয়ে যখন ফটকের দিকে যাচ্ছি, তখন দেখলাম জোড়া-মৌমাছি তার বিলিতি ডল হাতে নিয়ে বাগানে যোরাফেরা করছে। পায়ের শব্দে সে হাঁটা থামিয়ে আমাদের দিকে ঘুরে দেখল। তারপর বলল, ‘দাদু আমাকে বলেনি।’

হঠাৎ এমন একটা কথায় আমরা তিনজনেই থেমে গেলাম।

‘কী বলেনি দাদু?’ ফেলুদা জিগ্যেস করল।

‘কী খুঁজছিল বলেনি।’

‘কৈবে?’

‘পরশু তরশু নরশু।’

‘তিনদিন ?’

‘একদিন !’

‘কী হয়েছিল বল তো ।’

বিবি দূরে দাঁড়িয়েই চেঁচিয়ে কথা বলছে, যদিও তার মন পুতুলের দিকে। সে পুতুলের মাথায় গৌঁজার জন্য বাগান থেকে ফুল নিতে এসেছে। ফেলুদার প্রশ্নের উত্তরে বলল, ‘দাদুর যে ঘর আছে দোতলায়, যেখানে টেবিল আছে, বই আছে, আর সব জিনিস-টিনিস আছে, সেইখানে খুজছিল দাদু।’

‘কী খুজছিলেন ?’

‘আমি তো জিগ্যেস কৰলাম। দাদু বলল, কী পাছি না, কী খুজছি।’

‘আবোল তাবোল বকছে, মশাই,’ চাপা গলায় বললেন লালমোহনবাবু।

‘আর কিছু বলেননি দাদু ?’ ফেলুদা জিগ্যেস কৰল।

‘দাদু বলল এটা হেঁয়ালি, পৰে মানে বলে দেব, এখন খুজতে দাও। তারপৰ আর বলল না দাদু। দাদু মৰে গেল।’

ইতিমধ্যে ডলের মাথায় ফুল গৌঁজা হয়ে গেছে, বিবি বাড়ির দিকে চলে গেল, আর আমরাও হলাম বাড়িমুখো।

॥ ৭ ॥

ফেলুদা এখন মহেশ চৌধুরীর ডায়ারি নিয়ে বসবে, তাকে ডিস্টার্ব না করাই ভালো, তাই আমরা দুজনে চারটে নাগাদ চা খেয়ে একটু ঘুৰব বলে গাড়িতে করে বেরিয়ে পড়লাম। লালমোহনবাবুর ধারণা শহরের দিকে গেলে হয়ত সুলতানের লেটেস্ট খবর পাওয়া যেতে পারে।—‘মহেশ চৌধুরীর মৃত্যুর ব্যাপারে তোমার দাদা যতই রহস্যের গুৰু পেয়ে থাকুন না কেন, আমার কাছে বাঘ পালানোর ঘটনাটা অনেক বেশি রোমাঞ্চকর।’

বাঘের খবর পেতে বেশি দূর যেতে হল না। পেট্রোল নেবার দরকার ছিল, মেন রোডে বজ্জুষণ তেওয়ারীর পেট্রোল পাস্পের সামনে ভিড় দেখেই বুঝলাম বাঘের আলোচনা হচ্ছে, কারণ একজন ভদ্রলোক থাবা মারার ভঙ্গ করলেন কথা বলতে বলতে।

লালমোহনবাবু গাড়ি থেকে নেমে স্টান এগিয়ে গেলেন জটলার দিকে। ভদ্রলোক এককালে রাজস্থান যাবেন বলে বই পড়ে কিছুটা হিন্দী শিখেছিলেন, কিন্তু এখন সেটা ফেলুদার ভাষায় আবার শেয়ালের স্ট্যান্ডার্ডে নেমে গেছে। তার মানে কেয়া হৃয়া-রবেশি এগোনো মুশকিল হয়। তবু ভালো, ভিড়ের মধ্যে একজন বাঙালী বেরিয়ে গেল। তার কাছেই জানলাম যে হাজারিবাগের পুরে বিঝুগড়ের

দিকে একটা বনের মধ্যে নাকি সুলতানকে পাওয়া গিয়েছিল। ট্রেনার চন্দনের সঙ্গে বনবিভাগের শিকারী নাকি বাঘটা দিকে এগিয়ে যায়। একটা সময় মনে হয়েছিল যে বাঘটা ধৰা দেবে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সেটা চন্দনকে একটা থাবা মেরে পালিয়ে যায়। গুলিও চলেছিল, কিন্তু বাঘটা জখম হয়েছে কিনা জানা যায়নি। চন্দন অবিশ্বিত জখম হয়েছে, তবে তেমন গুরুতরভাবে নয়। সে এখন হাসপাতালে।

লালমোহনবাবু বললেন, ‘কাণ্ডারিকারের কোনো খবর জানেন ?’

‘এটা শুধৰাতেই হল। বললাম, ‘কাণ্ডারিকার নয়, কারাণ্ডিকার—যিনি বাঘের আসল ট্রেনার।’

ভদ্রলোক বললেন তার খবর জানেন না, তবে এটা জানেন যে বাঘের অভাবে নাকি সার্কসের বিক্রি কিছুটা কমেছে।

বাঘের দিকে গুলি চলেছে জেনে কারাণ্ডিকারের মনোভাব কী হল সেটা জানার জন্য ভীষণ কোতুল হচ্ছিল আমাদের দুজনেরই, তাই পেট্রোল নিয়ে সোজা চলে গেলাম গ্রেট ম্যাজেন্টিকে।

ফেলুদা সঙ্গে থাকলে দেখেছি লালমোহনবাবু নিজে থেকে আগ বাড়িয়ে কিছু করতে সাহস পান না; আজ দেখলাম সোজা গেটে গিয়ে বললেন, ‘পুট মি থু টু মিস্টার কুটি প্লীজ।’ গেটের লোকটা কী বুঝল জানি না। হয়ত সেদিন আমাদের চিনে রেখেছিল, তাই আর কিছু জিগ্যেস না করে আমাদের চুক্তে দিল, আর আমরাও সোজা গিয়ে হাজির হলাম মিঃ কুটির ক্যারাভ্যানে।

কুটির কাছে যে খবরটা পেলাম সেটাকেও একটা হেঁয়ালি বলা চলে।

কারাণ্ডিকার নাকি কাল রাত থেকে হাওয়া।

‘দুদিন থেকেই পাবলিক আবার বাঘের খেলা ডিমান্ড করতে শুরু করেছে,’ বললেন মিঃ কুটি। ‘আমি নিজে কারাণ্ডিকারের কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়েছি। বলেছি সে ছাড়া আর কেউ বাঘ ট্রেন করবে না। কিন্তু তাও সে না বলে চলে গেল। এর মধ্যেও দু-একদিন বেরিয়েছে, কিন্তু ঘন্টাখানেকের মধ্যেই আবার ফিরে এসেছে। কিন্তু আজ সে এখনও ফিরল না।’

খবরটা শুনে সার্কসের বাইরে বেরিয়ে এসে লালমোহনবাবু বললেন, ‘সুলতান-ক্যাপচারের দৃশ্য আর দেখা হল না, তপেশ। এমন সুযোগ আর আসবে না।’

আমারও মনটা থারাপ লাগছিল, তাই ঠিক করলাম গাড়িতে করে কোথাও একটু বেড়িয়ে আসব। উত্তরে যাব না দক্ষিণে যাব—অর্থাৎ কানারি হিলের দিকে যাব না রামগড়ের দিকে যাব—সেটা ঠিক করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত টস্ করলাম। দক্ষিণ পড়ল। লালমোহনবাবু বললেন, ‘ওদিকটাতেও একটা পাহাড়

আছে, সেদিন যাবার পথে দেখেছি। খাসা দৃশ্য।'

দৃশ্য ভালো ঠিকই, কিন্তু এগোৱা কিলোমিটাৰের পোস্টটা পেরিয়ে কিছু দূৰ
গিয়েই একটা কালভার্টের ধারে যে ঘটনাটা ঘটল, সেটাকে মোটেই ভালো বলা
চলে না।

মাত্র ছ'মাস আগে কেনা লালমোহনবাবুৰ আয়োসাদৰ বাব তিনেক হেঁচকি
তুলে মিনিটখানেক গো ঝো কৰে অবশেষে বেমালুম ধৰ্মঘটেৰ দিকে চলে গেল।
'বোধহয় তেল টানচে না', বললেন হরিপদবাবু।

ঘড়িতে পাঁচটা কুড়ি। সূৰ্য আকাশেৰ নিচেৰ দিকে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে না, কাৰণ
পশ্চিমে দূৰে শালবনেৰ মাথাৰ উপৰ মেঘ জমে আছে।

আমৰা গাড়ি থেকে নেমে কালভার্টেৰ উপৰ গিয়ে বসলাম, হরিপদবাবু গাড়ি
নিয়ে পড়লেন। লালমোহনবাবুকে এ ব্যাপারে পুৱোপুৱি ড্ৰাইভারেৰ উপৰ নিৰ্ভৰ
কৰতে হয়, কাৰণ উনি গাড়ি সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। উনি বলেন, 'আমাৰ
নিজেৰ পায়েৰ ভেতৰ কটা হাড় আছে কটা মাসল আছে না জেনে যখন দিবি
চলে ফিরে বেড়াচ্ছি, তখন গাড়িৰ ভেতৰ কী কলকজা আছে সেটা জানাৰ কী
নেমেসিটি ভাই ?'

মেঘেৰ গায়ে নিচেৰ দিকে একটা খড়খড়িৰ মধ্যে দিয়ে একটিবাৰ উঁকি দিয়ে
সূৰ্যদেৱ যখন আজকেৰ মতো ছুটি নিলেন, হরিপদবাবু সেই সময় জানালেন যে
তিনি রেডি—'চলে আসুন, স্যার।'

কালভার্ট থেকে উঠে আৱেকবাৰ ঘড়িৰ দিকে চেয়ে দেখি পাঁচটা তেক্রিশ।
সময়টা জৱাৰী, কাৰণ ঠিক তখনই আমৰা দেখলাম সুলতানকে।

খবৱটা আৱো অনেক নাটকীয়ভাৱে দিতে পাৰতাম, কিন্তু ফেলুদা বলে এটাই
ঠিক।—'গাদাগুচ্ছেৰ মৰ্টে-ধৰা বিশেষণ আৱ তথাকথিত লোম-খাড়া-কৰা শব্দ
ব্যবহাৰ না কৰে চোখে যা দেখলি সেইটে ঠিক ঠিক সোজাসুজি বলে গেলে কাজ
দেৱে চেৱ বেশি।' আমিও সেটাই কৱাৰ চেষ্টা কৰছি।

খাচাৰ বাইৱে বাঘ এৱ আগেও একবাৰ দেখেছি, যেটাৰ কথা রয়েল বেঙ্গল
ৱহস্যে আছে। কিন্তু সেখানে আমাদেৱ সঙ্গে আৱো অনেক লোক ছিল। শিকাৰী
আৱ বন্দুকতোছিলই, সবচেয়ে বড় কথা—ফেলুদা ছিল। তাৰ উপৰে আমি আৱ
লালমোহনবাবু ছিলাম গাছেৰ উপৰ, বাধেৰ নাগালেৰ বাইৱে। এখানে আমৰা
তিনজন দাঁড়িয়ে আছি খোলা রাস্তায়, যাৱ দুদিকে বন, অদূৱে একটা পাহাড়, যাতে
ভল্লুক আছেই, আৱ সময়টা সক্ষে। এই সময় এই অবস্থায় আমাদেৱ থেকে হাত
পঞ্চাশক দূৰে পশ্চিম দিকেৰ বন থেকে বেৱিয়ে বাঘটা রাস্তাৰ উপৰ উঠল।
আমৰা তিনজনে ঠিক একসঙ্গে একই সময় বাঘটা দেখেছি, কাৰণ আমাৰ সঙ্গে
সঙ্গে অন্য দুজনও ঠিক সেইভাবেই কাঠ হয়ে গেল। হরিপদবাবুৰ বাঁ হাতটা

গাড়িৰ দৰজাৰ দিকে বাড়িয়েছিলেন, সেই বাড়ানোই রয়ে গেল; লালমোহনবাবু
নাক বাড়বেন বলে ডান হাতেৰ বুঢ়ো আঙুল আৱ তর্জনীটা নাকেৰ দুপাশে ধৰে
শৱীৱটা একটু সামনেৰ দিকে খুকিয়েছিলেন, তিনি সেই ভাবেই রয়ে গেলেন;
আমি ধূলো বাড়বাৰ জন্য আমাৰ ডান হাতটা আমাৰ জীন্সেৰ পিছন দিকে
নিয়েছিলাম, তাৰ ফলে শৱীৱটা একটু বেঁকে গিয়েছিল, বাঘটা দেখাৰ ফলে
শৱীৱটা সেইৱকম বেঁকেই রইল।

ৰাস্তায় উঠে বাঘটা ঠিক চার পা গিয়ে থেমে গেল। তাৰপৰ মাথাটা ঘোৱালো
আমাদেৱ দিকে।

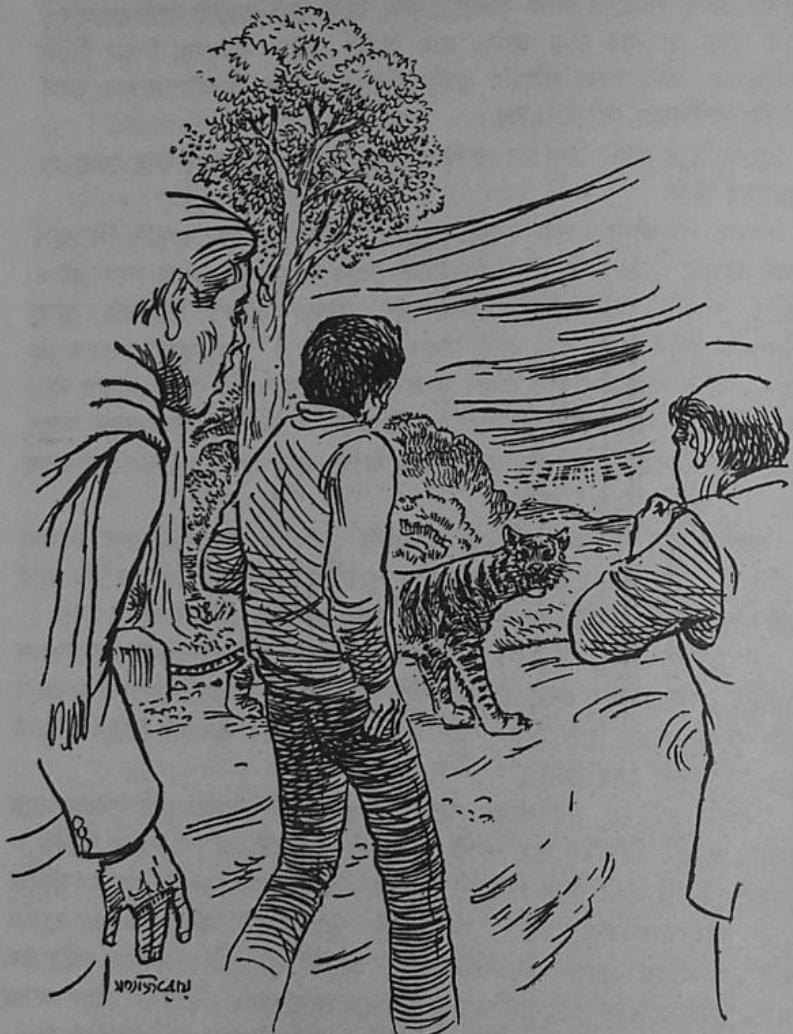
আমাৰ পা কাঁপতে শুৰু কৰেছে, বুকেৰ ভিতৰে কে যেন হাতুড়ি পিটছে।
অৰ্থাৎ আমাৰ চোখ কিছুতেই বামেৰ দিক থেকে সৰছে না। সঙ্গে সঙ্গে এটাও
বুৰাতে পাৰছি যে আমাৰ ডান পাশে আবছা কালো জিনিসটা হচ্ছে
লালমোহনবাবুৰ মাথা, আৱ সেটা ক্ৰমশ নিচেৰ দিকে নেমে যাচ্ছে। আন্দাজে
বুৰালাম তাঁৰ পা অবশ হয়ে যাবাৰ ফলে শৱীৱেৰ ভাৰ আৱ বইতে পাৰছে না।
এটাও বুৰাতে পাৰছিলাম যে আমাৰ দৃষ্টিতে কী জানি গণগোল হচ্ছে, কাৰণ
বাধেৰ আউটলাইনটা বাব বাৰ বাপসা হয়ে যাচ্ছে, আৱ গায়েৰ কালো ডোৱাগুলো
স্থিৰ না থেকে ভাইৱেট কৰছে।

সুলতান যে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আমাদেৱ দেখল সেটাৰ আন্দাজ দেওয়া
মুশকিল। মনে হচ্ছিল সময়টা অফুৱস্ত। লালমোহনবাবু পৱে বললেন কম কৰে
আট-দশ মিনিট; আমাৰ মতে আট-দশ সেকেন্ড, কিন্তু সেটাৰ যথেষ্ট বেশি।

দেখা শেষ হলে পৱ মাথা ঘুৱিয়ে নিয়ে আৱো চার পা ফেলে বাঘ রাস্তা
পেৱিয়ে গেল। সাহস একটু বাড়তে ধীৱে ধীৱে ডান দিকে মাথা ঘুৱিয়ে দেখলাম
শাল সেগুন সৱল শিশু শিমুল আৱ আৱো অনেক সব শুকনো গাছেৰ জঙ্গলে
সুলতান অদৃশ্য হয়ে গেল।

আশ্চৰ্য এই যে, এৱ পৱেও আমৰা অস্তত মিনিটখানেক (লালমোহনবাবুৰ
বৰ্ণনায় পনেৱো মিনিট) প্ৰায় একই ভাৱে দাঁড়িয়ে রইলাম। তাৰপৰ তিনজনে
কেবল তিনটে কথা বলে গাড়িতে উঠলাম—হৱিপদবাবু 'চলুন', আমি 'আসুন'
আৱ লালমোহনবাবু 'ছঃ'। খুব বেশি ভয় নিয়ে কথা বলতে গেলে
লালমোহনবাবুৰ এৱকম হয় এটা আমি আগেই দেখেছি। দুয়াৰ্মে মহীতোষ
সিংহৱায়েৰ বাড়িতে আমৰা তিনজন একথনে শুয়েছিলাম। একদিন রাত্ৰে ঘৰেৱ
বন্ধ দৰজাটা হাওয়াতে খট খট কৱায় উনি 'কে' না বলে 'খে' বলেছিলেন।

হৱিপদবাবুৰ নাৰ্ভটা দেখলাম মোটাঘুটি ভালো। ফেৱাৰ পথে স্টিয়ারিং ছইলে
হাতটাত কাঁপেনি। উনি নাকি এৱ আগেও রাস্তায় বাঘ দেখেছেন, জামসেদপুৱে
ড্ৰাইভাৰি কৱাৰ সময়।



বাড়ি ফিরে দেখি ফেলুদা তখনো মহেশবাবুর ডায়রিতে ডুবে আছে। আমার মনে হচ্ছিল সুলতানের খবরটা লালমোহনবাবু দিতে পারলে খুশি হবেন, তাই আমি আর কিছু বললাম না। ভদ্রলোক লেখেন-টেখেন বলেই বোধহয় সরাসরি খবরটা না দিয়ে একটু পাঁয়তারা কথে নিলেন। বার দু-তিন হাঁ হাঁ করে কী একটা গানের সুর ভেঁজে নিয়ে বললেন, ‘আচ্ছা, তপেশ, বাঘের পায়ের তলায় বোধহয় প্যাডিং থাকে, তাই না?’

আমি মজা দেখছি; বললাম, ‘তাইতো শুনেছি।’

‘নিশ্চয়ই তাই; নইলে এত কাছ দিয়ে গেল আর কোনো শব্দ হল না?’

লালমোহনবাবুর পাঁয়তারা কিন্তু মাঠে মারা গেল। ফেলুদা আমাদের দিকে চাইলও না, কেবল একটা ডায়রি সরিয়ে রেখে আরেকটা হাতে নিয়ে বলল, ‘আপনারা যদি বাঘটাকে দেখে থাকেন, তাহলে কটোর সময় কোনখনে দেখেছেন সেটা বন বিভাগে ফোন করে জানিয়ে দেওয়া উচিত ইমিডিয়েটলি।’

লালমোহনবাবু বললেন, ‘টাইম পাঁচটা তে ত্রিশ, লোকেশন রামগড়ের রাস্তায় এগারো কিলোমিটারের পোষ্টের পরের কালভার্টের কাছে।’

‘বেশ তো পাশের ঘরে ডি঱েকটরি রয়েছে, আপিসে এখন কেউ নেই, আপনি একেবারে ডি-এফ-ওর বাড়িতে ফোন করে জানিয়ে দিন। ওদের উপকার হবে।’

‘আচ্ছা, হাঁ, তাহলে....’ লালমোহনবাবু দেখলাম মাস্লগুলোকে টান করে নিচেন।—‘কীভাবে পুট করা যায় ব্যাপারটা? ইংরিজিতেই বলব তো।’

‘হিন্দি ইংরিজি যেটায় বেশি দখল তাতেই বলবেন।’

‘দি টাইগার হাঁচ এস্কেপ্ট ফ্রম দি....এস্কেপ্টই বলব তো?’

‘সহজ করে নিয়ে র্যান আওয়ে বলতে পারেন।’

‘এস্কেপ্টা বোধহয় ম্যানেজ করতে পারব।’

‘তাহলে তাই বলুন।’

নম্বর বার করে দিলাম আমি।। ফোনটাও বোধহয় আমি করলেই ভালো হত, কারণ লালমোহনবাবু ‘দি সার্কস হাঁচ এস্কেপ্ট ফ্রম দি গ্রেট ম্যাজেন্টিক টাইগার—থুড়ি’, বলে থেমে গেলেন। ভাগিস ভদ্রলোক কথাটা খুব চঁচিয়ে বলেছিলেন। ফেলুদা পাশের ঘর থেকে শুনতে পেয়ে দৌড়ে এসে টেলিফোনটা ওঁর হাত থেকে ছিনিয়ে খবরটা নিজেই দিয়ে দিল।

ফেলুদার ঘরেই চা এনে দিল বুলাকিপ্রসাদ। আমরা আসার আগেই বাঘের হাতে চন্দ্রনের জখম হবার খবরটা ফেলুদা বুলাকিপ্রসাদের কাছে পেয়ে

গিয়েছিল। ফেলুদার ধারণা কারাণিকার ছাড়া এই বাঘ জ্যান্ত ধৰার সাধ্য কাৰুৰ
নেই।

লালমোহনবাবু গৱম চায়ে একটা সশব্দ চুমুক দিয়ে বললেন, ‘কিছু পেলেন ও
ডায়ারিতে? নাকি অৱশ্যবাবুৰ কথাই ঠিক?’

‘আপনিই বলুন না।’

ফেলুদা একটা ডায়ারি খুলে লালমোহনবাবুৰ দিকে এগিয়ে দিল।

লালমোহনবাবু পড়লেন ‘Self elected President of club—meeting on 8.4.46’—তাৰপৰ আৱেকটা পাতা খুলে
পড়লেন—Tea Party at Brig. Sudarshan’s আৱ তাৰ পৱেৱ
পাতায়—‘Trial for new suit at Shakur’s—4 P.M.....কী মশাই,
এসব খুব তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বুঝি?’

‘তোপসে, তোৱ কী মনে হয়?’

আমি লালমোহনবাবুৰ পিছন দিয়ে ঝুকে পড়ে দেখছিলাম, এবাৱ ডায়ারিটা
হাতে নিয়ে নিলাম। ‘আলোৱ কাছে আন’, বলল ফেলুদা।

টেবিল ল্যাস্পেৱ নিচে ডায়ারিটা ধৰে ঢোখটা কাছে নিতেই একটা শিহৱন
খেলে গেল আমাৱ শিৱদাঁড়ায়।

বেশ বড় সাইজেৱ ডায়ারি, তাৱ পাতাৱ মাঝখানে ফাউন্টেন পেনে ইংৰিজিতে
লেখা ছাড়াও অন্য লেখা রয়েছে যেটা প্ৰায় ঢোখে দেখা যায় না। পাতাৱ
একেবাৱে উপৱ দিকে ছাপা তাৰিখেৱও উপৱে, খুব সকৰ কৱে কাটা হার্ড পেনসিল
দিয়ে খুদে খুদে অক্ষৱে হাল্কা লেখা।

‘কী দেখলি?’

‘বাংলা লেখা।’

‘কী লেখা?’

‘এই পাতাটায় লেখা—“পাঁচেৱ বশে বাহন ধৰণ্স”।’

‘সৰ্বনাশ’, বললেন লালমোহনবাবু, ‘এ যে আবাৱ হেঁয়ালি দেখছি মশাই।’

‘তাতো বটেই’, বলল ফেলুদা, ‘এবাৱ এটা দেখুন। এটা ১৯৩৮ অৰ্থাৎ প্ৰথম
বছৱেৱ ডায়াৱ, আৱ এটাই পেনসিলে প্ৰথম সাংকেতিক লেখা।’

১৯৩৮-এৱ ডায়াৱৰ প্ৰথম পাতাতেই লিখেছেন ভদ্ৰলোক “শত্রু দুই-পাঁচেৱ
বশ।”

‘শত্রুটি কে?’ লালমোহনবাবু প্ৰশ্ন কৱলেন।

ফেলুদা বলল, ‘ভদ্ৰলোক নিজেৱ বিষয় বলতে গেলে সব সময়ই শিবেৱ
কোনো না কোনো একটা নাম ব্যবহাৱ কৱেছেন।’

‘শিবেৱ নামতোহল, কিন্তু দুই-পাঁচেৱ বশ তো বোঝা গেল না।’

‘রিপু বোৱেন?’ জিগ্যেস কৱল ফেলুদা।

‘মানে ছেঁড়া কাপড় সেলাই-টেলাই কৱা বলছেন?’

‘আপনি ফারসী-সংস্কৃত গুলিয়ে ফেলছেন, লালমোহনবাবু! আপনি যেটা
বলছেন সেটা হল রিফু। আমি বলছি রিপু।’

‘ওহো—ষড়াৰিপু? মানে শত্ৰু?’

‘শত্ৰু। এবাৱ মানুষেৱ এই ছাঁচি শত্ৰুৰ নাম কৱন তো?’

‘ভেৱি ইজি। কাম ক্ৰোধ লোভ মদ মোহ মাঃসৰ্য়।’

‘হল না। অৰ্ডাৰে ভুল। কাম ক্ৰোধ লোভ মোহ মদ মাঃসৰ্য়। অৰ্থাৎ দুই আৱ
পাঁচ হল ক্ৰোধ আৱ মদ।’

‘ওয়ান্ডাৰফুল!’ বললেন লালমোহনবাবু, ‘এ তো মিলে যাচ্ছে মশাই।’

‘এবাৱ তাহলে প্ৰথমটা আৱেকবাৱ দেখুন, এটাও মিলে যাবে।’

এবাৱে আমাৱ কাছেও ব্যাপারটা সহজ হয়ে গেছে। বললাম, ‘বুৰোছি, দুইয়েৱ
বশে বাহন ধৰণ্স হচ্ছে, রাগেৱ মাথায় গাড়ি ভাঙা।’

‘ভেৱি গুড়’, বলল ফেলুদা, ‘তবে দুই-পাঁচ নিয়ে একটা সংকেতেৱ এখনো
সমাধান হয়নি।’

যে ডায়াৱগুলো দেখা হয়ে গেছে, সেগুলোৱ বিশেষ বিশেষ জায়গায় কাগজ
গুঁজে রেখেছে ফেলুদা। তাৰই একটা জায়গা খুলে আমাৱেৱ দেখালো। লেখাটা
হচ্ছে— $2+5=X$ ।

লালমোহনবাবু বললেন, ‘এক্ষেত্ৰে তো মশাই আনন্দোন কোয়ান্টিটি। ওটা বাদ
দিন। আৱ, সব সংকেতেৱই যে একটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মানে থাকবে সেটাই বা ভাবছেন
কেন?’

ফেলুদা বলল, ‘যেখানে একটা লোক বছৱে তিনশ পঁয়াষটি দিনে মাত্ৰ
পনেৱো-বিশ দিন সংকেতেৱ আশ্রয় নিয়েছে, সেখানে কাৱণটা যে জৰুৰী তাতো
বোঝাই যাচ্ছে। কাজেই X-এৱে রহস্য আমাকে উদ্ঘাটন কৱতেই হবে।’

‘ওই তাৰিখেৱ কাছাকাছি কোনো লেখা থেকে কোনো হেল্প পাচ্ছেন না?’

‘ওৱ দশ দিন পৱে আৱেকটা সংকেত আছে। দেখুন—’

এটাও আমাৱ কাছে অসম্ভব কঠিন বলে মনে হল। লেখাটা
হচ্ছে—‘অৰ্গল—ঘৃতকুমাৰী।’

ফেলুদা বলল, ‘লোকটা যে কথা নিয়ে কী না কৱেছে তাই ভাবছি।’

‘আপনি ধৰে ফেলেছেন?’

‘আপনিও পাৱেন—একটু হেল্প কৱলৈ।’

‘ঘৃতকুমাৰীতো কবৱেজীৱ ব্যাপার মশাই,’ বললেন লালমোহনবাবু।

‘হাঁ,’ বলল ফেলুদা, ‘ঘৃতকুমাৰীৰ তেল মাথায় মাথালে মাথা ঠাণ্ডা রাখে।’

অর্থাৎ রাগ কমায়।'

'কিন্তু তেল অনৰ্গন মাখতে হয় এতো জনতুম না মশাই।'

ফেলুদা হেসে বলল, 'আপনি ড্যাশটা অগ্রহ করছেন কেন? ওটারও একটা মানে আছে। আর অগল মানে জানেন তো?'

'কপট। খিল।'

'এবার ওই দ্বিতীয় মানেটার সঙ্গে একটা নেগেটিভ জুড়ে দিন।'

'অখিল! আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। 'তার মানে অখিলবাবু ওঁকে ঘৃতকুমারী ব্যবহার করতে বলেছিলেন।'

'শাবাশ। এবার পরেরটা দ্যাখ।'

তিনি পাতা পরে পড়ে দেখলাম—'আজ থেকে পাঁচ বাদ।' তার মানে মহেশবাবু মদ ছেড়ে দিলেন। কিন্তু তার এক মাস বাদেই মহেশবাবু লিখছেন—'ভোলানাথ ভোলে না। আবার পাঁচ। পাঁচেই বিস্মৃতি।'

ফেলুদা বলল, 'কিছু একটা ভুলে থাকার জন্য মহেশবাবু আবার মদের আশ্রয় নিয়েছেন। প্রশ্ন হচ্ছে—কী ভুলতে চাইছেন?'

লালমোহনবাবু আর আমি মাথা চুলকোলাম। মহেশবাবু বলেছিলেন তাঁর জীবনে অনেক রহস্য। এখন মনে হচ্ছে কথাটা ঠাট্টা করে বলেননি।

ফেলুদা আরেকটা জায়গায় ডায়ারিটা খুলে বলল, 'এটা খুব মন দিয়ে পড়ে দেখুন। কথা নিয়ে খেলার একটা আশ্চর্য উদাহরণ। অনেক তথ্য, অনেক জটিল মনের ভাব এই কয়েকটি কথার মধ্যে পুরে দেওয়া হয়েছে।'

আমরা পড়লাম—'আমি আজ থেকে পালক। পালক = feather = হাল্কা। পালক = পালনকর্তা। আজ থেকে শমির ভাব আমার। শমি আমার মুক্তি।'

শমি যে শক্রলাল মিশ্র সেটা আমি বুঝতে পারলাম। ফেলুদা বলল, 'শক্রলালকে মানুষ করার ভাব বহন করতে পেরে মহেশবাবুর মন থেকে একটা ভাব নেমে গেছে। এই ভারটা কিসের ভাব সেইটে জানা দরকার।'

ফেলুদা খাট থেকে উঠে কিছুক্ষণ চিন্তিত ভাবে পায়চারি করল। আমি ডায়ারিগুলোর দিকে দেখছিলাম। কী অস্তুত লোক ছিলেন এই মহেশ চৌধুরী। বেঁচে থাকলে ফেলুদার সঙ্গে নিশ্চয়ই ভাব জমে যেত, কারণ ফেলুদারও হেঁয়ালির দিকে বৌঁক আর হেঁয়ালির সমাধানও করতে পারে আশ্চর্য চটপট।

লালমোহনবাবু খাটের এক কোনায় ভুরু কুঁকে বসেছিলেন। বললেন, 'অখিলবাবু ভদ্রলোকের এত বন্ধু ছিলেন, ওঁকে কবরেজী ওষুধ দিয়েছেন, ওঁর কুঠী হঁটেছেন, তাঁরতো মহেশবাবুর নাড়ীনক্ষত্র জানা উচিত। আপনি ডায়ারি না ঘঁটে তাঁকেই জেরা করুন না।'

হিমমন্তার অভিশাপ

ফেলুদা পায়চারি থামিয়ে একটা চারমিনার ধরিয়ে বলল, 'এই ডায়ারিগুলোর মধ্যে দিয়ে আমি আসল মানুষটার সঙ্গে যোগ স্থাপন করার চেষ্টা করছি। ওই পেনসিলের লেখাগুলোতে আমার কাছে মহেশ চৌধুরী এখনো বেঁচে আছেন।'

'ওঁর ছেলেদের সম্বন্ধে কিছু পেলেন না ডায়ারিতে?'

'প্রথম পনেরো বছরে বিশেষ কিছু নেই, তবে পরে—'

একটা গাড়ি থামল আমাদের গেটের বাইরে। ফিয়াটের হৰ্ন। চেনা শব্দ।

আমরা তিনজনে বারান্দায় এসে দেখলাম অরূপবাবু হাতে একটা প্যাকেট নিয়ে গাড়ি থেকে নামলেন।

'মিঃ সিং-এর ওখানে যাচ্ছিলাম—এখানকার ফরেস্ট অফিসার,' বললেন অরূপবাবু, 'তাই ভাবলাম বীরেনের চিঠিগুলো দিয়ে যাই। চিঠি অবিশ্য নামেই। তাও আপনি যখন চেয়েছেন...'

'আপনাকে এই অবস্থায় এত ঝামেলার মধ্যে ফেললাম বলে আমি অত্যন্ত লজ্জিত।'

'দ্যাটস অল রাইট,' বললেন অরূপবাবু 'বাবা যে কী বলতে চাইছিলেন সেটা আমার কাছে রহস্য। দেখুন যদি আপনি বুদ্ধি খাটিয়ে কিছু বাব করতে পারেন। সত্যি বলতে কী, আমি বাবার সঙ্গ খুব বেশি পাইনি। হাজারিবাগে আসি মাঝে মাঝে আমার কাজের ব্যাপারে। এককালে প্রায়ই আসতাম শিকারের জন্য। তা, বড় শিকার তো এরা বন্ধই করে দিয়েছে। কাল একটা সুযোগ পাওয়া গেছে—দেখি!....'

'কী সুযোগ?'

'যে কারণে সিং-এর কাছে যাচ্ছি। খবর এসেছে রামগড়ের রাস্তায় আজ বিকেলেই নাকি বাঘটা দেখা গেছে। এদিকে একটি ট্রেনার তো হাসপাতালে, অন্যটি মালিকের সঙ্গে ঝাগড়টাগড়া করে নিয়েছে। আমি সিংকে বলেছি যে বাঘটাকে যদি মারতেই হয়, তো আমাকে মারতে দাও। অলরেডিতো তার দিকে গুলি চলেছে; যদি জখম হয়ে থাকে তাহলে তোহি ইজ এ ডেঞ্জারাস বীস্ট।'

আমার বলার ইচ্ছে ছিল বাঘটাকে দেখে তো জখম বলে মনে হয়নি, কিন্তু ফেলুদার ইশারাতে সেটা আর বললাম না।

'আমি তো সঙ্গে থি ওয়ান ফাইভটা নিছি,' বললেন অরূপবাবু, 'কারণ এমনিতেই চারিদিকে প্যানিক। গুরু ছাগলও গেছে এক-আধটা। সার্কাসের খাঁচায় বন্দী অবস্থায় বুড়ো হয়ে মরার চেয়ে জঙ্গলে গুলি খেয়ে মরাটা খারাপ কিসে?....যাই হোক, আপনার ইন্টারেস্ট থাকলে আপনিও আসতে পারেন। কাল সকালে বেরোব আমরা।'

'দেখি....' বললো ফেলুদা। 'আমার এই কাজটা কতদূর এগোয় তার উপর

নির্ভর করছে। ভালো কথা—'

অকৃণবাবু যাবার জন্য পা বাড়িয়েছিলেন, ফেলুদার কথায় থামলেন। ফেলুদা
বলল, 'সেদিন পিকনিকে আপনিই তো বন্দুক ছুঁড়েছিলেন, তাই না ?'

ভদ্রলোক হেসে উঠলেন। 'আপনি বোধহয় ভাবছিলেন—বন্দুক চলল, অথচ
শিকার নেই কেন ? গোয়েন্দার মন তো ! ওয়েল, আই মিসড ইট ! একটা বটের।
সেরা শিকারীরও লক্ষ্য কি সব সময় অব্যর্থ হয়, মিঃ মিস্টির ?'

॥ ৯ ॥

বিলেত থেকে লেখা মহেশবাবুর দ্বিতীয় ছেলের চিঠিগুলো থেকে সত্তিই
বিশেষ কিছু জানা গেল না। চিঠি বলতে সবই পোস্টকার্ড, তার একদিকে ছবি,
অন্যদিকে ঠিকানা। যেখানে ঠিকানা ছাড়াও কিছু লেখা আছে, সেখানে বীরেন
তার বাবার দেওয়া নাম ব্যবহার করেছে—দুরি।

ন'টায় বুলকিপ্রসাদ দিনার রেডি করে আমাদের ডাক দিল। ফেলুদা ডায়রি
আর খাতা নিয়ে খেতে বসল। যে-সংকেতগুলো তৎক্ষণাত সমাধান হচ্ছে না,
সেগুলো সে নিজের খাতায় লিখে রাখছে। বাঁ হাতে লিখছে, এবং দিব্যি লিখছে।
লালমোহনবাবু একবার বললেন, 'লেখা বন্ধ না করলে আজকের মাসের কারিটার
ঠিক জাসটিস করতে পারবেন না। দুর্ধর্ষ হয়েছে।'

ফেলুদা বলল, 'বাঁদর সমস্যা নিয়ে পড়েছি, এখন মাংস-টাংস বলে ডিস্টাৰ্ব
করবেন না।'

আমি লক্ষ করছিলাম ফেলুদার ভুক্টা সাংঘাতিক কুঁচকে রয়েছে, যদিও
ঠোঁটের কোণে একটা হাসির আভাসও রয়েছে। জিগ্যেস করতেই হল ব্যাপারটা
কী। ফেলুদা ডায়রি থেকে পড়ে শোনাল—'অগ্নির উপাসকের অসীম বদান্যতা।
নবরত্ন বাঁদরের হিসাবে দু হাজার পা।'

লালমোহনবাবু বললেন, 'রাঁচিতে পাগলাগারদ আছে বলে ওখানকার
বাসিন্দারাও নাকি একটু ইয়ে হয় বলে শুনিচি। সেটাও একটু মনে রাখবেন।'

ফেলুদা এ কথায় কোনো মন্তব্য না করে বলল, 'অগ্নির উপাসক পাসীদের বলে
জানি, কিন্তু বাকিটা সম্পূর্ণ ধোঁয়া।'

তাতে লালমোহনবাবু বললেন যে, প্রথমত নবরত্ন বাঁদর বলে কোনোরকম
বাঁদর হয় কিনা সে বিষয়ে ওঁর সন্দেহ আছে; আর দ্বিতীয়ত, নটা রঞ্জের কী করে
দু হাজার পা হয়, আর বাঁদর কী করে সে হিসেবটা করে সেটা কোনোমতেই
বোধগম্য হচ্ছে না—'এইবাবে আপনি খাতা বন্ধ করে একটু বিশ্রাম করুন।'

লালমোহনবাবু বলার জন্য নিশ্চয়ই নয়, হয়ত চোখ আর মাথাটাকে একটু

রেস্ট দেবার জন্য ফেলুদা খাবার পরে হাঁটতে বেরোল। অবিশ্বি একা নয়,
আমাদের দুজনকে সঙ্গে নিয়ে।

পূর্ণিমার চাঁদ এই কিছুক্ষণ হল উঠেছে, তার গায়ের রং থেকে এখনো হলুদের
ছোপটা যায়নি। আকাশে মেঘ জমেছে, তাই দেখে জটায়ু বললেন, 'চন্দ্রলোক
ক্ষণস্থায়ী বলে মনে হচ্ছে।' পঞ্চম দিক থেকে মাঝে মাঝে একটা দমকা বাতাস
দিচ্ছে, আর তার সঙ্গে একটা শব্দ ভেসে আসছে যেটা ভালো করে শুনলে বোঝা
যায় সার্কাসের ব্যান্ড।

দাইনে মোড় নিয়ে দুটো বাড়ি পরেই ক্লেলাস। এক সারি ইউক্যালিপ্টাসের
ফাঁক দিয়ে বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। দেতলায় একটা ঘরের জানলা খোলা, ঘরে
আলো ছালচ্ছে। সেই আলোর সামনে দিয়ে কে যেন দুট পায়চারি করছে।
ফেলুদারও চোখ সেইদিকে। আমরা হাঁটা থামিয়েছি। ওটা কার ঘর ?
প্রীতীনবাবুর। পায়চারি করছেন নীলিমা দেবী। একবার জানালায় এসে থামলেন,
আবার সরে গিয়ে পায়চারি। অস্থির ভাব।

আমরা আবার চলা শুরু করলাম। জানালাটা ক্রমে দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেল।

পরপর আরো বাড়ি। প্রত্যেকটাতেই বেশ বড় কম্পাউন্ড। রেডিওতে খবর
বলছে; কোন বাড়িতে চলছে রেডিও জানি না। লালমোহনবাবু আরেকটা
বেমানান রবীন্দ্রসঙ্গীত ধরতে যাচ্ছিলেন—গুনগুনানি শুনে মনে হল ধানের ক্ষেত্রে
রৌদ্রচায়ায়—এমন সময় দেখলাম দূরে একজন লোক রাস্তা দিয়ে এগিয়ে আসছে
আমাদেরই দিকে। গায়ে নীল রঙের পুলোভার।

আরেকটু কাছে এলেই চিনতে পারলাম।

'আপনাদের ওখানেই যাচ্ছিলাম,' নমস্কার করে বললেন শক্রলাল মিশ্র।
চেহারা দেখে মনে হল অনেকটা সামলে নিয়েছেন, যদিও সেই হাসিখুশি
ছেলেমানুষী ভাবটা এখনো ফিরে আসেনি।

'কী ব্যাপার ?' বলল ফেলুদা।

'আপনাকে একটা অনুরোধ করব।'

'কী অনুরোধ ?'

'আপনি তদন্ত ছেড়ে দিন।'

হঠাৎ এমন একটা অনুরোধে রীতিমত হকচকিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু ফেলুদা
বেশ স্বাভাবিক ভাবেই বলল, 'কেন বলুন তো ?'

'এতে কারুর উপকার হবে না, মিঃ মিস্টির।'

ফেলুদা একটুক্ষণ চুপ থেকে একটা হালকা হেসে বলল, 'যদি বলি আমার
নিজের উপকার হবে ? মনে খট্কা থাকলে আমি বড় উদ্বেগ বোধ করি মিঃ
মিশ্র ; সেটাকে দূর না করা অবধি শান্তি পাই না। তা ছাড়া মৃত্যুশয়্যায় একজন

একটা কাজের ভার আমাদের দিয়ে গেছেন, সেটা না করেও আমার শাস্তি নেই। এইসব কারণে আমাকে তদন্ত চালাতেই হবে। উপকার-অপকারের প্রশ্নটা এখানে খুব বড় নয়। ভেবি সবি, আপনার অনুরোধ আমি রাখতে পারলাম না। শুধু তাই নয়—এই তদন্তের ব্যাপারে আমি আপনাকে অনুরোধ করব যে আমাকে একটু সাহায্য করুন। মহেশ্বাবু সম্বন্ধে আর কেউ যাই ভাবুন না কেন, আপনি তাঁকে শুন্দা করতেন এটা তো ঠিক?

‘নিশ্চয়ই ঠিক’ ফেলুদার কথাটা মনে ধরতে কিছুটা সময় নিল বলেই বোধহয় জবাবটা এল একটু পরে। কিন্তু যখন এল তখন বেশ জোরের সঙ্গেই এল। ‘নিশ্চয়ই ঠিক’, আবার বললেন শক্রলাল। তারপর তার গলার সুরটা কেমন যেন বদলে গেল। বললেন, ‘যে শুন্দাটা বহুদিন ধরে ক্রমে ক্রমে গড়ে ওঠে, সেটাকে কি এক ধাক্কায় ভাঙতে দেওয়া উচিত?’

‘আপনি কি সেটাই করছিলেন?’

‘হ্যাঁ, সেটাই করছিলাম। কিন্তু সেটা ভুল। এখন বুঝেছি সেটা মস্ত ভুল, আর বুঝতে পেরে মনে শাস্তি পাচ্ছি।’

‘তাহলে আপনার কাছে সাহায্য আশা করতে পারি?’

‘কী সাহায্য চাইছেন বলুন,’ ফেলুদার দিকে সোজাসুজি চেয়ে বেশ সহজভাবে কথাটা বললেন শক্রলাল।

‘তাঁর দুই ছেলের প্রতি মহেশ্বাবুর মনোভাব কেমন ছিল সেটা জানতে চাই। চৌধুরী পরিবার সম্বন্ধে আপনি যতটা নিরপেক্ষভাবে বলতে পারবেন, তেমন অনেকেই পারবেন না।’

শক্রলাল বললেন, ‘আমি যেটুকু বুঝেছি তা বলছি। আমার বিশ্বাস শেষ বয়সে বীরেন ছাড়া আর কারুর উপর টান ছিল না মহেশ্বাবু। অরূপদা আর প্রীতীন দুজনেই ওঁকে হতাশ করেছিল।’

‘সেটার কারণ বলতে পারেন?’

‘সেটা পারব না, জানেন, কারণ, ওই দু ভাইয়ের সঙ্গে আমার বিশ্বেষ যোগাযোগ ছিল না অনেকদিন থেকেই। তবে অরূপদাকে যে জুয়ার নেশায় পেয়েছে সে কথা আমাকে একদিন মহেশ্বাবু বলেছিলেন। সোজা করে বলেননি, ওঁর নিজস্ব ভাষায় বলেছিলেন। আমি বুঝতে পারিনি; শেষে ওঁকেই বুঝিয়ে দিতে হল। বললে, “অরূপ গুড় হলে আমি খুশি হতুম, বেটার হয়েই আমায় চিন্তায় ফেলেছে। শুনছি নাকি আজকাল মহাজাতি ময়দানে যাতায়াত করছে নিয়মিত।”—বেটার তো বুঝতেই পারছেন, আর জাতি হল রেস; মহাজাতি ময়দান হল মহেশ্বাবুর ভাষায় রেসের মাঠ।’

ফেলুদা বলল, ‘কিন্তু প্রীতীনবাবু তাঁকে হতাশ করবেন কেন? উনি তো

ছিমমস্তার অভিশাপ

ইলেক্ট্রনিকসে বেশ—’

‘ইলেক্ট্রনিকস!—শক্রলাল যেন আকাশ থেকে পড়লেন। ‘ও কি আপনাকে তাই বলেছে নাকি?’

‘ইন্ডেভিশনের সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক নেই?’

শক্রলাল সশব্দে হেসে উঠলেন। ‘হরি, হরি! ইন্ডেভিশন! প্রীতীন একটা সদাগরী আপিসে সাধারণ চাকরি করে। সেটাও ওর শ্বশুরের সুপারিশে পাওয়া। প্রীতীন ছেলে খারাপ নয়, কিন্তু অত্যন্ত ইম্প্র্যাকটিক্যাল আর খামখেয়ালী। এককালে সাহিত্য-টাইতিং করতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু সেও খুব মামুলি। ওর স্ত্রী বড়লোক বাপের একমাত্র মেয়ে। ও যে গাড়িটাতে এসেছে সেটাও ওর শ্বশুরের। আপিস থেকে ছুটি পাচ্ছিল না, তাই আসতে দেরী হয়েছে।’

এবার আমাদের আকাশ থেকে পড়ার পালা।

‘তবে ওর পাখির নেশাটা খাঁটি’ বললেন শক্রলাল, ‘ওতে কোনো ফাঁকি নেই।’

ফেলুদা বলল, ‘আরেকটা প্রশ্ন আছে।’
‘বলুন।’

‘সেদিন বাজরাঞ্জায় যে গেরহাধারীটির সঙ্গে আপনি কথা বলছিলেন, তিনিই কি বীরেন্দ্র?’

হঠাৎ এ রকম একটা প্রশ্ন শুনে শক্রলাল থতমত খেলেও, মনে হল চট্ট করে সামলে নিলেন। কিন্তু উত্তর যেটা দিলেন সেটা সোজা নয়।

‘আপনার যা বুদ্ধি, আমার মনে হয় ক্রমে আপনি সব কিছুই জানতে পারবেন।’

‘এটা জিগ্যেস করার একটা কারণ আছে,’ বলল ফেলুদা। ‘যদি তিনি বীরেন্দ্র হন, তাহলে মহেশ্বাবুর শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁকে আমার একটা জিনিস দিতে হবে। আপনি প্রয়োজনে বীরেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারবেন কি?’

শক্রলাল বললেন, ‘মহেশ্বাবুর শেষ ইচ্ছা যাতে পূরণ হয়, তার চেষ্টা আমি করব। এটা আমি কথা দিচ্ছি। এর বেশি আর কিছু বলতে পারব না। আমায় মাপ করবেন।’

কথাটা বলে শক্রলাল যে পথে এসেছিলেন, আবার সেই পথেই ফিরে গেলেন।

আমরা যে হাঁটতে হাঁটতে বেশ অনেকখানি পথ চলে এসেছিলাম সেটা বুঝতেই পারিনি। ফেলুদা টর্চের আলোয় ঘড়ি দেখে বলল সাড়ে দশটা। আমরা ফিরতি পথ ধরলাম। কৈলাসে সব বাতি নিতে গেছে, চাঁদ দেকে গেছে মেঘে, সার্কাসের বাজনাও আর শোনা যাচ্ছে না। এই থমথমে পরিবেশে ফেলুদার

'বাঁদ' বলে চেঁচিয়ে ওঠাটা এত অপ্রত্যাশিত যে লালমোহনবাবুর সঙ্গে সঙ্গে 'কোথায়' বলাতে কিছুই আশ্রয় হলাম না। আমি অবিশ্যি বুঝেছিলাম যে ফেলুদা মহেশবাবুর ডায়রির বাঁদরের কথা বলছে। 'কী অস্তুত মাথা ভদ্রলোকের!' বলল ফেলুদা। 'বাঁদরেও যে বই লিখেছে সেটা তো খেয়ালই ছিল না।'

'আপনি সিম্পল ফ্র্যাকচারটাকে কম্পাউন্ড ফ্র্যাকচের পরিণত করছেন কেন বলুনতোমশাই? শুধু বাঁদরে শানাছে না, তার উপর আবার বই-লিখিয়ে বাঁদর?'

'গিবন! গিবন! গিবন!' বলে উঠল ফেলুদা।

আরেকবাস্তু! সত্যিইতো। গিবন তো একরকম বাঁদর বটেই।

কিন্তু ফেলুদা হঠাৎ কেন জানি মুখড়ে পড়ল। বাড়ির ফটকের কাছাকাছি যখন পৌঁছেছি তখন চাপা গলায় বলতে শুনলাম, 'সাংঘাতিক দাঁও মেরেছে লোকটা, সাংঘাতিক!'

'কে মশাই?' জিগ্যেস করলেন লালমোহনবাবু।

'স্ট্যাম্প-অ্যালবাম চোর,' বলল ফেলুদা।

রাত বারোটা পর্যন্ত আমাদের ঘরে থেকে লালমোহনবাবু ফেলুদার হেঁয়ালি সমাধান দেখলেন। একটা হেঁয়ালির উন্নরের জন্য এগারোটার সময় কেলাসে ফোন করতে হল। ১৯৫১-র ১৮ই অক্টোবর মহেশবাবু লিখেছেন He passes away। কার মৃত্যু সংবাদ ডায়রিতে লেখা রয়েছে জানবার জন্য অরুণবাবুকে জিগ্যেস করে জানা গেল ওই দিনে অরুণবাবুর মা মারা গিয়েছিলেন। মা-র নাম জিগ্যেস করাতে বললেন হিরগায়ী। তার ফলে বেরিয়ে গেল He হল 'হি'।

১৯৫৮-তে কিছু লেখা পাওয়া গেল যেগুলো পড়লে মনে হয় ইংরিজি 'মটো'। যেমন 'Be foolish', 'Be stubborn', 'Be determined'। তারপর যখন এল 'Be leaves for England' তখন বোঝা গেল Be হচ্ছে বী অর্থাৎ বীরেন।

১৯৭৫-এর পাতায় পাওয়া গেল 'এ তিনের বশ'। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাংসর্য। তিন হল লোভ। 'এ' হচ্ছে A—অরুণবাবু।

শেষ লেখা মহেশবাবুর জন্মদিনের আগের দিন। —'ফিরে আসা। ফিরে আশা'—ব্যস—তারপর আর কিছু নেই।

ডায়রি দেখা যখন শেষ হল তখন রাত একটা। ফেলুদার তখনও ঘুম আসেনি, কারণ আমি যখন লেপটা গায়ের উপর টানছি, তখন দেখলাম ও লালমোহনবাবুর দেওয়া সার্কাসের বইটা খুলল। উনি কথাই দিয়েছিলেন ওর পড়া হলে ফেলুদাকে পড়তে দেবেন, আর ফেলুদার পড়া হলে আমি 'পড়ব'।

ছিমস্তার অভিশাপ

যখন তন্দ্রার ভাব আসছে, তখন শুনলাম ফেলুদা কথা বলছে, আর সেটা আমাকেই বলছে।—

'কোথাও খুন হলে পুলিসে গিয়ে খুনের জায়গার একটা নকশা করে লাশ যেখানে পাওয়া গেছে সেখানে একটা চিহ্ন দেয়। সে চিহ্নটা কী জিনিস?'

'এক্স মার্কস দ্য স্পট?' আমি জিগ্যেস করলাম।

'ঠিক বলেছিস। এক্স মার্কস দ্য স্পট!'

এই এক্সটাই স্বপ্নে হয়ে গেল দু হাত তোলা পা ফাঁক করা কালী মূর্তি, যেটা অরুণবাবুর দিকে চোখ রাঙিয়ে বলছে 'তুই দুইয়ের বশ, তুই দুইয়ের বশ, তুই দুইয়ের বশ,' আর অরুণবাবু চিংকার করে বলছেন 'আমি দেখছিলাম! আমি দেখছিলাম!' তারপরই কালীর মুখটা হয়ে গেল লালমোহনবাবুর মুখ, আর যেই সেই মুখটা বলেছে 'এক মাসে তিন হাজার বিক্রি—ই ই—কালমোহন বেঙ্গলী!'—অমনি স্বপ্নটা ভেঙে গেল একটা শব্দে।

দ্রব্যায় ধাক্কা লাগার শব্দ। আর তার সঙ্গে একটা ধ্বনিধ্বনির শব্দ। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে এটাও বুঝতে পারলাম।

আমার হাতটা আপনা থেকেই টেবিল ল্যাম্পের সুইচটার দিকে চলে গেল। আলো জ্বলল না। বিহারেও যে লোডশেডিং হয় এটা খেয়াল ছিল না।

মেবেতে ধূপ করে কী একটা পড়ার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ফেলুদার গলা—

'টর্চ জ্বাল, তোপসে—আমারটা পড়ে গেছে!'

টেবিলের উপর হাতড়ে জলের গেলাসটাকে মাটিতে ফেলে ভেঙে তবে টর্চটা পেলাম। ফেলুদা ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে। টর্চের আলোতে তার নিষ্কল ক্রোধটা চোখে মুখে ফুটে বেরোচ্ছে।

'কে ছিল ফেলুদা?'

'দেখিনি, তবে অনুমান করতে পারি। লোকটা যঞ্চা!'

'কী মতলবে এসেছিল, বলতো?'

'চুরি!'

'কিছু নেয়ানি তো?'

'নেয়ানি, তবে নির্ধার্ত নিত—যদি আমার ঘুমটা এত পাতলা না হত।'

'কী নিত?'

ফেলুদা এ প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে কেবল বিড়বিড় করে বলল, 'এখন দেখছি ফেলু মিন্টিরই একমাত্র লোক নয় যে মহেশ চৌধুরীর সংকেতের মানে বুঝতে পারে। যদিও এটা একটু লেটে বুঝেছে'....

পরদিন সকালে লালমোহনবাবু সব শুনে-টুনে বললেন, ‘আমি প্রথম দিনই বলেছিলাম দরজা বন্ধ করে শোবেন। এ সব জায়গায় চোর ডাকাতের উপদ্রবতো হবেই।’

‘আপনি তো বাঘের ভয়ে দরজা বন্ধ করেছিলেন।’

‘আর আপনি চোরের জন্য খোলা রেখেছিলেন! বন্ধ রাখলে দুটোর হাত থেকেই সেফ। ওহে বুলাকিপ্রসাদ, চটপট ব্রেকফাস্ট দাও ভাই।’

‘এত তাড়া কিসের?’ বলল ফেলুদা।

‘বাব ধরা দেখতে যাবেন না?’

‘ধরবে কে? কারাণ্ডিকার তো নিখৌজি।’

‘নিখৌজি হলে কী হবে? বাব মারার তাল হচ্ছে সে খবর কি তার কাছে পৌঁছানি?—ওঁ, কী প্রিলিং ব্যাপার মশাই। এ চাঙ ছাড়া যায় না। আপনি ব্যাপারটা কী করে এত কামলি নিছেন জানি না।’

আটটা নাগাদ ব্রেকফাস্ট সেরে ডায়রি আর চিঠির প্যাকেট নিয়ে কৈলাসে যাবার জন্য তৈরি হয়েছি, এমন সময় অখিলবাবু এলেন। বললেন তাঁর এক হোমিওপ্যাথ বন্ধু কাছেই থাকেন, তাঁর কাছেই যাচ্ছিলেন, আমাদের বাড়ি পথে পড়ে বলে টু মেরে যাচ্ছেন।

‘ঘৃতকুমারীতে মহেশবাবুর মাথা ঠাণ্ডা হয়েছিল?’ ফেলুদা প্রশ্ন করল হালকাভাবে।

‘ও বাবা! এত কথাও লিখেছে নাকি মহেশ ডায়রিতে?’

‘আরও অনেক কথাই লিখেছেন।’

অখিলবাবু বললেন, ‘আমার ওষুধের চেয়েও অনেক বেশি কাজ দিয়েছিল ওর মনের জোর। যাকে বলে উইল পাওয়ার। সে যে কীভাবে মদ ছাড়ল সেতো আমি নিজের চোখে দেখেছি। সেতো আর ঘৃতকুমারীতে হয়নি।’

‘উইলের কথাই যখন তুললেন,’ বলল ফেলুদা, ‘তখন বলুন তো মহেশবাবুর উইল সম্বন্ধে কিছু জানেন কিনা। আমি অবিশ্য দলিলের কথা বলছি, মনের জোরের কথা বলছি না।’

‘ডিটেল জানি না, তবে এটুকু জানি যে মহেশ একবার উইল করে পরে সেটা বাতিল করে আরেকটা উইল করে।’

‘আমার ধারণা এই দ্বিতীয় উইলে বীরেনের কোনো অংশ ছিল না।’

অখিলবাবু অবাক হয়ে বললেন, ‘এটা কি ডায়রিতে পেলেন নাকি?’

‘না। এটা উনি মৃত্যুশয্যায় বলে গেছেন। সংকেতটা আপনার মনে আছে কিনা জানি না। প্রথমে দুটো আঙুল দেখালেন, তারপর উই উই বললেন, আর তারপর বুড়ো আঙুলটা নাড়ালেন। দুই আঙুল যদি দুরি হয়, তাহলে ও ছাড়া আর কোনো মানে হয় না।’

‘আশ্চর্য সমাধান করেছেন আপনি,’ বললেন অখিলবাবু। ‘প্রথম উইলে বীরেনের অংশ ছিল। তার কাছ থেকে চিঠি আসা বন্ধ হবার পর পাঁচ বছর অপেক্ষা করে ছেলে আর আসবে না ধরে নিয়ে গভীর অভিমানে বীরেনকে বাদ দিয়ে মহেশ নতুন উইল করে।’

‘বীরেন ফিরে এসেছে জানলে কি আবার নতুন উইল করতেন?’

‘আমার তো তাই বিশ্বাস।’

এবার ফেলুদা একটু ভেবে প্রশ্ন করল—

‘বীরেন সম্মানী হয়ে যেতে পারে এমন কোনো সম্ভাবনা তার মধ্যে কখনো লক্ষ করেছিলেন কি?’

‘দেখুন, বীরেনের কৃষ্ণি আমিই করি। সে যে গৃহত্যাগী হবে সেটা আমি জানতাম। তাই যদি হয় তাহলে সম্মানী হবার সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেওয়া যায় কি?’

‘আরেকটা শেষ প্রশ্ন।—সেদিন আপনি বললেন মহেশবাবুকে খুঁজতে যাচ্ছেন অর্থে আপনি এলেন আমাদের পরে। আপনি কি পথ হারিয়েছিলেন? জায়গাটা তোতেমন গোলকধৰ্ম্মা নয় কিছু?’

‘এ প্রশ্ন আপনি করবেন সে আমি জানতাম;’ মন্দ হেসে বললেন অখিলবাবু। ‘জায়গাটা গোলকধৰ্ম্মা নয় ঠিকই, তবে পথটা দুভাগ হয়ে গেছে সেটা আপনি লক্ষ করেছেন নিশ্চয়ই। মহেশকে খুঁজে পাওয়া আমার পক্ষে সহজই ছিল। কিন্তু ব্যাপার কী জানেন, বুড়ো বয়সে ছেলেবেলার স্মৃতি মাঝে মাঝে জেগে ওঠে মনে; সেই রকম একটা স্মৃতি আমাকে অন্য পথে নিয়ে যায়। সেটা আব কিছুই না; পঞ্চাম বছর আগে ওই দিকেই একটা পাথরে আমি আমার নামের আদ্যক্ষর আর তারিখ খোদাই করে রেখেছিলাম। গিয়ে দেখি সে পাথর এখনো আছে, আর সে খোদাইও আছে—A. B. C.; 15.5.23—বিশ্বাস না হয় আপনি গিয়ে দেখতে পারেন।’

কৈলাসে গিয়ে নূর মহম্মদের কাছে শুনলাম অরুণবাবু আধঘণ্টা আগে বেরিয়ে গেছেন বাঘের সন্ধানে—‘ছোটবাবা’ আছেন।

প্রিতীনবাবু দোতলায় ছিলেন, খবর দিতে নিচে নেমে এলেন। তাঁর হাতে চিঠি আর ডায়রির প্যাকেট তুলে দিয়ে চলে আসছি, এমন সময় বাধা পড়ল।

নীলিমা দেবী। তিনি ঘৰে চুকতেই প্ৰাতীনবাবুৰ মুখ শুকিয়ে গেছে সেটা লক্ষ কৰলাম।

‘আপনাকে একটা কথা বলাৰ ছিল, মিঃ মিত্র। সেটা আমাৰ স্বামীৰই বলা উচিত ছিল, কিন্তু উনি বলতে চাইছেন না।’

প্ৰাতীনবাবু তাৰ স্ত্ৰীৰ দিকে কাতৰভাৱে চেয়ে আছেন, কিন্তু নীলিমা দেবী সেটা গ্ৰাহ্য কৰলেন না। তিনি বলে চললেন, ‘সেদিন বাবাকে ওই অবস্থায় দেখে আমাৰ স্বামীৰ হাত থেকে টেপ রেকড়ারটা পড়ে যায়। আমি সেটা তুলে আমাৰ ব্যাগে রেখে দিই। আমাৰ মনে হয় এটা আপনাৰ কাছে লাগবে। এই নিন।’

প্ৰাতীনবাবু আবাৰ বাধা দেবাৰ চেষ্টা কৰলেন, কিন্তু পাৱলেন না। ফেলুদা ধন্যবাদ দিয়ে চ্যাপটা ক্যাসেট-রেকড়ারটা কোটেৰ পকেটে পুৱে নিল।

প্ৰাতীনবাবুকে দেখে মনে হল তিনি একেবাৰে ভেঙে পড়েছেন।

আমাৰ মন বলছিল যে বাঘ ধৰাৰ ব্যাপাৰে ফেলুদাৰও যথেষ্ট কৌতুহল আছে। গাড়িতে উঠে ও হৱিপদবাবুকে যা নিৰ্দেশ দিল, তাতে বুঝলাম আমাৰ অনুমান ঠিক।

লালমোহনবাবু যতটা সাহস নিয়ে বেৰিয়েছিলেন, তাৰ কিছুটা বোধহয় কমেছে, কাৰণ যাবাৰ পথে একবাৰ ফেলুদাকে বললেন, ‘তদ্বলোকেৰতো অনেক বন্দুক ছিল মশাই—একটা চেয়ে নিলেন না কেন? আপনাৰ কোণ্ট বত্ৰিশ এ ব্যাপাৰে কোনো কাজে লাগবে কি?’

তাতে ফেলুদা বলল, ‘বাঘেৰ গায়ে মাছি বসলে সেটা মাৰা চলবে।’

সাৱা পথ ফেলুদা টেপ রেকড়ারটা চালিয়ে ভল্যুম কমিয়ে কাছে ধৰে রইল। কী শুনল ওই জানে।

কাল রাত্ৰে বৃষ্টি হওয়াতে রাস্তায় অনেকে জায়গাই ভিজে ছিল। বড় রাস্তা থেকে একটা মোড়েৰ কাছে এসে কাঁচা মাটিতে টায়াৱেৰ দাগ দেখে বুঝলাম কিছু গাড়ি মেন ৱোড় থেকে বেঁকে ওই দিকেই গেছে। আমাৰও বাঁয়েৰ রাস্তা নিলাম, আৱ মাইল খালেক গিয়েই দেখলাম রাস্তার বাঁ ধাৰে একটা বটগাছেৰ পাশে তিনটে তিনৰকম গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে—একটা বন বিভাগেৰ জীপ, একটা অৱণবাবুৰ ফিয়াট আৱ একটা বাঘেৰ খাঁচাসমেত সাৰ্কসেৰ ট্ৰাক। পাঁচজন লোক গাছটাৰ তলায় বসে ছিল, তাৰা বলল আধৰটা হল বাঘ খৌজাৰ দল বনেৰ ভিতৰ চলে গেছে। কোনদিকে গেছে সেটাও দেখিয়ে দিল। লোকগুলোৰ মধ্যে একটাকে সেদিন সাৰ্কসেৰ তাৰুতে দেখেছি; ফেলুদা তাকেই জিগ্যেস কৰল ট্ৰেনাৰও এসেছে কিনা। লোকটা বলল যে দ্বিতীয় ট্ৰেনাৰ চন্দন এসেছে।

আমাৰ রওনা দিলাম। সামনে কী অভিজ্ঞতা আছে জানি না, তবে এইটুকু

ছিমমন্তৰ অভিশাপ

জানি যে অৱণবাবুৰ হাতে বন্দুক আছে, হয়ত বন বিভাগেৰ শিকারীৰ হাতেও আছে, কাজেই ভয়েৰ কোনো কাৰণ নেই। লালমোহনবাবু মনে হল একটু মুঘড়ে পড়েছেন তাৰ কাৰণ নিশ্চয়ই কাৰাণ্ডিকাৱেৰ বদলে চন্দনেৰ আসা।

ভিজে মাটিতে মাৰে মাৰে অস্পষ্ট পায়েৰ ছাপ গাইড হিসেবে কাজ কৰছে। বন ঘন নয়, শীতকালে আগাছাও কম, তাই এগোতে কোনো অসুবিধে হচ্ছিল না। এৱ মধ্যে দু একবাৰ ময়ৰ ডেকে উঠেছে; সেটা যে বাঘেৰ সংকেত হতে পাৰে সেটা আমাৰা সবাই জানি।

মিনিট দশক চলাৰ পৰ শব্দটা পেলাম।

বাঘেৰ ডাক, তবে গৰ্জন বলব না। ইংৰিজিতে এটাকে গ্রাউল বলে, বাঙলায় হয়ত গোঙানি, কিংবা গৱগৱানি বা গজগজানি। ঘন ঘন ডাক, আৱ বিৱৰণিৰ ডাক, বিক্ৰমেৰ নয়।

আৱো কয়েক পা এগিয়ে যেতেই দুটো গাছেৰ ফাঁক দিয়ে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেলাম। অদ্ভুত কেননা এ জিনিস সাৰ্কসেৰ বাইৱে কখনো যে দেখতে পাৰে এটা স্বপ্নেও ভাবিনি।

আমাদেৱ সামনে বাঁয়ে তিনজন লোক দাঁড়িয়ে আছে, তাদেৱ দুজনেৰ হাতে বন্দুক। একটা বন্দুক অৱণবাবুৰ হাতে, সেটা উঁচিয়ে তাগ কৰা আছে সামনেৰ দিকে।

এই তিনজনেৰ পিছনে একটা খোলা জায়গা, যেটাকে বলা যেতে পাৰে সাৰ্কসেৰ রিং। এই রিং-এৰ মাৰখানে দাঁড়িয়ে আছে ডান হাতে চাৰুক আৱ বাঁ হাতে একটা গাছেৰ ডাল নিয়ে একটা লোক। বাঁ কাঁধে ব্যান্ডেজ দেখে বুঝলাম ইনিই হলেন ট্ৰেনাৰ চন্দন। আমাৰ দিকে পিছন ফিৰে হাতেৰ চাৰুকটা মাৰে মাৰে সপাং কৰে মাটিতে মেৰে চন্দন ধীৱে ধীৱে এগিয়ে যাচ্ছে যাব দিকে সে হল আমাদেৱ কালকেৰ দেখো গ্ৰেট ম্যাজেস্টিক সাৰ্কস থেকে পালানো বাধ সুলতান।

এ ছাড়া আৱো চারজন লোক দাঁড়িয়ে আছে বাঁয়ে একটু দূৱে, তাদেৱ দুজনেৰ হাতে যে শিকলটা রয়েছে সেটাই নিশ্চয়ই বাঘকে পৰাণো হবে, যদি সে ধৰা দেয়।

সবচেয়ে অদ্ভুত লাগল সুলতানেৰ হাবভাব। সে পালানোৰ কোনো চেষ্টা কৰছে না, অথচ ধৰা দেবাৰও যেন বিন্দুমাত্ৰ ইচ্ছা নেই। শুধু তাই নয়, তাৰ চোখে মুখে যে রাগ আৱ অবজ্ঞাৰ ভাবটা ফুটে উঠেছে সেটা সে বাব বুঝিয়ে দিচ্ছে চাপা গৰ্জনে।

চন্দন যদিও এক পা এক পা কৰে এগোচ্ছে বাঘটাৰ দিকে, তাকে দেখে মনে হয় না যে তাৰ নিজেৰ উপৰ সম্পূৰ্ণ আস্থা আছে। সে যে একবাৰ জখম হয়েছে এই বাঘেৰই হাতে সেটা সে নিশ্চয়ই ভুলতে পাৰছে না।



ম্যানিপুলেশন

আমি আড়চোখে মাঝে মাঝে দেখছি অরূপবাবুর দিকে। তিনি যেভাবে বন্দুক উঁচিয়ে স্থির লক্ষ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, বেশ বুঝতে পারছি সুলতান বেসামাল কিছু করলেই বন্দুক গর্জিয়ে উঠে তাকে ধরাশায়ী করে দেবে। আমার বাঁ পাশে দু পা সামনে ফেলুন পাথরের মতো দাঁড়ানো ডাইনে লালমোহনবাবু, তাঁর মুখ এমনভাবে হাঁ হয়ে রয়েছে যে মনে হয় না চোয়াল আর কোনোদিনও উঠবে। (ভদ্রলোক পরে বলেছিলেন যে তাঁর ছেলেবয়সে তিনি যত সার্কাসে যত বাঘের খেলা দেখেছিলেন, তাঁর সমস্ত শ্বেত নাকি মুছে গেছে আজকের হাজারিবাগের বনের মধ্যে দেখা এই সার্কাসে)।

চন্দন যখন পাঁচ হাতের মধ্যে, তখন সুলতান হঠাত তার সমস্ত মাংসপেশী টান করে শরীরটা একটু নিচু করল, আর ঠিক সেই মুহূর্তে ফেলুন একটা নিঃশব্দ লাফে অরূপবাবুর ধারে পৌঁছে গিয়ে তাঁর বন্দুকের নলের উপর হাত রেখে মন্দু চাপে সেটাকে নামিয়ে দিল।

‘সুলতান !’

গুরুগঙ্গীর ডাকটা এসেছে আমাদের ডান দিক থেকে। যিনি ডাকটা দিয়েছেন, তাঁকে আগে থেকে দেখতে পেয়েই যে ফেলুন এই কাজটা করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

‘সুলতান ! সুলতান !’

গঙ্গীর স্বরটা নরম হয়ে এল। অবাক হয়ে দেখলাম রঞ্জমপেও অবর্তীণ হলেন রিং-মাস্টার কারাণ্ডিকার ; এরও হাতে চাবুক, পরনে সাধারণ প্যান্ট আর শার্ট। গলা অনেকখানি নামিয়ে নিয়ে পোষা কুকুর বা বেড়ালকে যেমন ভাবে ডাকে, সেই ভাবে ডাকতে ডাকতে কারাণ্ডিকার এগিয়ে গেলেন সুলতানের দিকে।

চন্দন হতভুব হয়ে পিছিয়ে গেল। অরূপবাবুর বন্দুক ধীরে ধীরে নেমে গেল। বন বিভাগের কর্তার মুখ লালমোহনবাবুর মুখের মতোই হাঁ হয়ে গেল। বনের মধ্যে এগারো জন হতবাক দর্শক দেখল গ্রেট ম্যাজেস্টিক সার্কাসের রিংমাস্টার কী আশ্চর্য কৌশলে পালানো বাঘকে বশ করে তার গলায় চেন পরিয়ে দিল, আর তারপর সেই চেন ধরে সুলতানকে জঙ্গলের মধ্যে থেকে বার করে নিয়ে এল একেবারে সার্কাসের খাঁচার কাছে। তারপর খাঁচার দরজা খুলে তার বাইরে টুল রেখে দিল সার্কাসের লোক, আর কারাণ্ডিকার চাবুকের এক আছাড়ের সঙ্গে সঙ্গে ‘আপ !’ বলতেই সেই বাঘ তীরবেগে ছুটে গিয়ে টুলে পা দিয়ে আবার সার্কাসের খাঁচায় বন্দী হয়ে গেল।

আমরা একটু দূরে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখছিলাম ; বাঘ খাঁচায় বন্দী হওয়া মাত্র কারাণ্ডিকার আমাদের দিকে ফিরে একটা সেলাম টুকল। তারপর সে একটা গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। এটা একটা প্রাইভেট ট্যাক্সি, আগে ছিল না।

গাড়িটা চলে যাবার পর অরুণবাবুকে বলতে শুনলাম, 'ব্রিলিয়ান্ট'। তারপর ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন, 'থ্যাক্স'।

॥ ১১ ॥

কেলাসে ফিরে এসে ফেলুদা প্রথমে অরুণবাবুর অনুমতি নিয়ে একটা টেলিফোন করল, কাকে জানি না। তারপর বৈঠকখানায় এল, যেখানে আমরা সবাই বসেছি। নীলিমা দেবী চা পাঠিয়ে দিয়েছেন। ওঁরা তিনজনে কালই কলকাতা ফিরে যাচ্ছেন। মহেশবাবুর শ্রাদ্ধ কলকাতাতেই হবে। অধিলবাবুকে বাবের খবরটা দেওয়াতে তিনি ঘটনাটা দেখতে পেলেন না বলে খুব আপসোস করলেন।

'আমিও ভাবছি কালই বেরিয়ে পড়ব,' বললেন অরুণবাবু, 'অবিশ্য যদি আপনার তদন্ত শেষ হয়ে থাকে।'

ফেলুদা জানাল সব শেষ।—'আপনার পিতৃদেবের শেষ ইচ্ছা পালনেও কোনো বাধা নেই। সে ব্যবস্থাও হয়ে গেছে।'

অরুণবাবু চায়ের কাপ থেকে দৃষ্টি তুললেন।

'সে কি, বীরেনের খৌজ পেয়ে গেছেন ?'

'আজ্ঞে হাঁ। আপনার বাবা ঠিকই অনুমান করেছিলেন।'

'মানে ?'

'তিনি এখানেই আছেন।'

'হাজারিবাগে ?'

'হাজারিবাগে।'

'খুবই আশ্চর্য লাগছে আপনার কথাটা শুনে।'

আশ্চর্য লাগার সঙ্গে যে একটা অবিশ্যসের ভাবও মিশে আছে সেটা অরুণবাবুর কথার সুরেই বোঝা গেল। ফেলুদা বলল 'আশ্চর্য তো হবারই কথা, কিন্তু আপনারও এ রকম একটা সন্দেহ হয়েছিল, তাই নয় কি ?'

অরুণবাবু হাতের কাপটা নামিয়ে সোজা ফেলুদার দিকে চাইলেন।

'শুধু তাই নয়,' ফেলুদা বলে চলল, 'আপনার মনে এমনও ভয় ঢুকেছিল যে মহেশবাবু হয়ত আবার নতুন উইল করে আপনাকে বাদ দিয়ে বীরেনকে তাঁর সম্পত্তির ভাগ দেবেন।'

ঘরের মধ্যে একটা আস্তুত থমথমে ভাব। লালমোহনবাবু আমার পাশে বসে সোফার একটা কুশন খামচে ধরেছেন। প্রীতীনবাবুর মাথায় হাত। অরুণবাবু উঠে দাঁড়িয়েছেন—তাঁর চোখ লাল, তাঁর কপালের রং ফুলে উঠেছে।

'শুনুন মিঃ মিত্র,' গর্জিয়ে উঠলেন অরুণবাবু, 'আপনি নিজেকে যত বড়ই গোয়েন্দা ভাবুন না কেন, আপনার কাছ থেকে এমন মিথ্যে, অমূলক, ভিস্তুইন অভিযোগ আমি বরদাস্ত করব না।—জগৎ সিং !'

পিছনের দরজা দিয়ে বেয়ারা এসে দাঁড়াল।

'আর একটি পা এগোবে না তুমি !'—ফেলুদার হাতে রিভলভার, সেটাৰ লক্ষ্য অরুণবাবুর পিছনে জগৎ সিং-এর দিকে।—'ওর মাথার একগাছা চুল কাল রাত্রে আমার হাতে উঠে এসেছিল। আমি জানি ও আপনারই আজ্ঞা পালন করতে এসেছিল আমার ঘরে। ওর মাথার খুলি উড়ে যাবে যদি ও এক পা এগোয় আমার দিকে !'

জগৎ সিং পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

অরুণবাবু কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লেন সোফাতে।

'আ-আপনি কী বলতে চাইছেন ?'

'শুনুন সেটা মন দিয়ে,' বলল ফেলুদা, 'আপনি উইল চেঙ্গ করার রাস্তা বন্ধ করার জন্য আপনার বাবার চাবি লুকিয়ে রেখেছিলেন। বিবি দেখেছিল মহেশবাবুকে চাবি খুজতে। মহেশবাবু হঁয়ালি করে তাঁর নাতনীকে বলেছিলেন তিনি কী হারিয়েছেন, কী খুজছেন। এই কী হল Key—অর্থাৎ চাবি। কিন্তু চাবি সরিয়েও আপনি নিশ্চিন্ত হননি। তাই আপনি সেদিন রাজরাঙ্গায় সুযোগ পেয়ে আপনার মোক্ষম অস্ত্রী প্রয়োগ করেন আপনার বাবার উপর। আপনি জানতেন সেই অস্ত্রে মৃত্যু হতে পারে—এবং সেটা হলেই আগন্তুর কার্যসিদ্ধি হবে—'

'পাগলের প্রলাপ ! পাগলের প্রলাপ বকচেন আপনি !'

'সাক্ষী আছে, অরুণবাবু—একজন নয়, তিনজন—যদিও তাঁরা কেউই সাহস করে সেটা প্রকাশ করেননি। আপনার ভাই সাক্ষী—অধিলবাবু সাক্ষী—শক্রলাল সাক্ষী।'

'সাক্ষী যেখানে নির্বাক, সেখানে আপনার অভিযোগ প্রমাণ করছেন কী করে, মিঃ মিত্র ?'

'উপায় আছে, অরুণবাবু। তিনজন ছাড়াও আরেকজন আছে যে নির্দিধায় সমস্ত সত্য ঘটনা উদ্ঘাটন করবে।'

কেলাসের বৈঠকখানায় পাখির ডাক কেন? জলপ্রপাতের শব্দ কেন?

অবাক হয়ে দেখলাম ফেলুদা তার কোটের পকেট থেকে প্রীতীনবাবুর ক্যাসেট রেকর্ডার বার করেছে।

'সেদিন একটি ঘটনা দেখে এবং কয়েকটি কথা শুনে বিহুল হয়ে প্রীতীনবাবু হাত থেকে এই যন্ত্রটা ফেলে দেন। নীলিমা দেবী এটা কুড়িয়ে নেন। এই যন্ত্রতে পাখির ডাক ছাড়াও আরো অনেক কিছু রেকর্ড হয়ে গেছে, অরুণবাবু।'

এইবাবে দেখলাম অরুণবাবুৰ মুখ ক্ৰমে লাল থেকে ফ্যাকাসেৰ দিকে চলেছে।
ফেলুদাৰ ডান হাতে বিভূতভাৱ, বৌ হাতে টেপ রেকৰ্ডাৰ।

পাখিৰ শব্দ ছাপিয়ে মানুষেৰ গলা শোনা যাচ্ছে। ক্ৰমে এগিয়ে আসছে গলাৰ
স্বৰ, স্পষ্ট হয়ে আসছে। অরুণবাবুৰ গলা—

‘বাবা, বীৰু ফিরে এসেছে এ ধাৰণা তোমাৰ হল কী কৰে?’

তাৰপৰ মহেশবাবুৰ উত্তৰ—

‘বুড়ো বাপেৰ যদি তেমন ধাৰণা হয়েই থাকে, তাতে তোমাৰ কী?’
‘তোমাৰ এ বিশ্বাস মন থেকে দূৰ কৰতে হবে। আমি জানি সে আসেনি,
আসতে পাৰে না। অসম্ভব।’

‘আমাৰ বিশ্বাসেও তুমি হস্তক্ষেপ কৰবে?’
‘হাঁ, কৰব। কাৰণ বিশ্বাসেৰ বশে একটা অন্যায় কিছু ঘটে যায় সেটা আমি
চাই না।’

‘কী অন্যায়?’
‘আমাৰ যা পাওনা তা থেকে বঞ্চিত কৰতে দেব না তোমাকে আমি।’
‘কী বলছ তুমি?’

‘ঠিকই বলছি। একবাৰ উইল বদল কৰেছে তুমি বীৰু আসবে না ভেবে।
তাৰপৰ আবাৰ—’

‘উইল আমি এমনিও চেঙ্গ কৰতাম!—মহেশবাবুৰ গলাৰ স্বৰ চড়ে গেছে;
তাৰ পুৱানো রাগ যেন আবাৰ মাথা ঢাঢ়া দিয়ে উঠেছে। তিনি বলে চলেছেন—

‘তুমি আমাৰ সম্পত্তিৰ ভাগ পাৰাৰ আশা কৰ কী কৰে? তুমি অসৎ, তুমি
জুয়াড়ী, তুমি চোৱ!—লজ্জা কৰে না? আমাৰ আলমাৰি থেকে দোৱাৰজীৰ
দেওয়া স্ট্যাম্প আলবাম—’

মহেশবাবুৰ বাকি কথা অরুণবাবুৰ কথায় ঢাকা পড়ে গেল। তিনি উন্মাদেৰ
মতো চেঁচিয়ে উঠেছেন—

‘আৱ তুমি? আমি যদি চোৱ হই তবে তুমি কী? তুমি কি ভেবেছ আমি জানি
না? দীনদয়ালেৰ কী হয়েছিল আমি জানি না? তোমাৰ চিৎকাৰে আমাৰ ঘূৰ
ভেংগে গিয়েছিল। সব দেখেছিলাম আমি পদৰিৰ ফৌক দিয়ে। পঁয়ত্ৰিশ বছৰ আমি
মুখ বন্ধ রেখেছি। তুমি দীনদয়ালেৰ মাথায় বাড়ি মেৰেছিলে পিতলেৰ বুদ্ধমূৰ্তি
দিয়ে। দীনদয়াল মৰে যায়। তাৰপৰ নূৰ মহম্মদ আৱ ড্ৰাইভাৰকে দিয়ে গাড়িতে
কৰে তাৰ লাশ—’

এৱ পৱেই একটা ঝুপ শব্দ, আৱ কথা বন্ধ। তাৰপৰ শুধু পাখিৰ ডাক আৱ
জলেৰ শব্দ।

টেপ রেকৰ্ডাৰ বন্ধ কৰে সেটা প্ৰীতীনবাবুকে ফেৰত দিয়ে দিল ফেলুদা।

মিনিটখানেক সকলেই চুপ, আৱ সকলেই কাঠ, এক ফেলুদা ছাড়া।
ফেলুদা রিভলভাৰ চালান দিল পকেটে। তাৱপৰ বলল, ‘আপনাৰ বাবা গৰ্হিত

কাজ কৰেছিলেন, সাংঘাতিক অন্যায় কৰেছিলেন, সেটা ঠিক, কিন্তু তাৰ জন্য
তিনি পঁয়ত্ৰিশ বছৰ যন্ত্ৰণা ভোগ কৰেছেন, যত রকমে পেৱেছেন প্ৰায়শিত্ব
কৰেছেন। তবুও তিনি শাস্তি পাননি। যেদিন সেই ঘটনা ঘটে, সেইদিন থেকেই
তাঁৰ ধাৰণা হয়েছে যে, তাঁৰ জীৱনটা অভিশপ্ত, তাঁৰ অন্যায়েৰ শাস্তি তাঁকে
একদিন না একদিন পেতেই হবে। অবিশ্বাস সেই শাস্তি এভাৱে তাঁৰ নিজেৰ
ছেলেৰ হাত থেকে আসবে, সেটা তিনি ভেবেছিলেন কিনা জানি না।’

অরুণবাবু পাথৰেৰ মতো বসে আছেন মেৰেৰ বাঘচালটাৰ দিকে একদৃষ্টি
চেয়ে। যখন কথা বললেন, তখন মনে হল তাঁৰ গলাৰ স্বৰটা আসছে অনেক দূৰ
থেকে।

‘একটা কুকুৰ ছিল। আইরিশ টেরিয়াৰ। বাবাৰ খুব প্ৰিয়। দীনদয়ালকে
দেখতে পাৰত না কুকুৰটা। একদিন কামড়াতে যায়। দীনদয়াল লাঠিৰ বাড়ি
মাৰে। কুকুৰটা জখম হয়। বাবা ফেৱেন রাস্তিৱে—পাটি থেকে। কুকুৰটা ওৱা
ঘৱেই অপেক্ষা কৰত। সেদিন ছিল না। নূৰ মহম্মদ ঘটনাটা বলে। বাবা
দীনদয়ালকে ডেকে পাঠান। বাগলে বাবা আৱ মানুষ থাকতেন না....’

ফেলুদাৰ সঙ্গে আমৱাও উঠে পড়লাম। অখিলবাবুও উঠেছেন দেখে ফেলুদা
বলল, ‘আপনি একটু আমাদেৰ সঙ্গে আসতে পাৰেন কি? কাজ ছিল।’

‘চলুন’, বললেন ভদ্ৰলোক, ‘মহেশ চলে গিয়ে আমাৰ তো এখন অখণ্ড
অবসৰ।’

গাড়িতে অখিলবাবু বললেন— ‘আমাৰ নাম লেখা পাথৰটাৰ পাশে দাঁড়িয়েই আমি
ওদেৱ কথা শুনতে পাই। তাকে অনেক সময় জিগোস কৰেছি সে হঠাৎ হঠাৎ
এত অন্যান্য হয়ে পড়ে কেন। সে ঠাণ্ডা কৰে বলত—“তুমি গুনে বাৱ কৰ,
আমি বলব না।” আশৰ্য—তাৰ জীৱনেৰ এত বড় একটা ঘটনা—সেটা কুষ্টীতে
ধৰা পড়ল না কেন বুঝতে পাৰছি না! হ্যত আমাৰই অক্ষমতা।’

বাড়িৰ কাছাকাছি যখন পৌঁছেছি তখন বুঝতে পাৱলাম ফেলুদা কাকে ফোন
কৰেছিল।

ফটকেৰ বাইৱে দাঁড়িয়ে আছেন শক্রলাল মিশ্র।
‘আপনাৰ মিশ্র সাকসেসফুল?’ গাড়ি থেকে নেমে জিগোস কৰল ফেলুদা।
‘হাঁ’, বললেন শক্রলাল, ‘বীৱেন এসেছে।’

আমরা বৈঠকখানায় ঢুকতে সেই গেরুয়াধরী সম্মাসী সোফা ছেড়ে দাঁড়িয়ে
উঠে নমস্কার করলেন। লম্বা চুল, রুক্ষ লম্বা দাঢ়ি, লম্বা বলিষ্ঠ চেহারা।
'বাপের শেষ ইচ্ছার কথা শুনে বীরেন আসতে রাজি হল,' বললেন শক্রলাল,

'মহেশবাবুর উপর কোনো আক্রোশ নেই ওর।'

'যেমন আক্রোশ নেই, তেমনি আকর্ষণও নেই,' বললেন বীরেন-সম্মাসী।
'শক্র এবার অনেকে চেষ্টা করেছিল আমাকে ফিরিয়ে আনতে। বলেছিল—ওদের
দেখলে তোমার টানটা হ্যাত ফিরে আসবে। ওর কথাতেই আমি রাজীগ্রামায়
গিয়েছিলাম সেদিন। কিন্তু দূর থেকে দেখেই আমি বুঝেছিলাম আমার আস্তীয়দের
উপর আমার কোনো টান নেই। বাবা তবু আমাকে কিছুটা বুঝেছিলেন, তাই প্রথম
প্রথম ওঁকে চিঠিও লিখেছি। কিন্তু তারপর....'

'কিন্তু সে চিঠি তো আপনি বিদেশ থেকে লেখেননি,' বলল ফেলুদা, 'আমার
বিশ্বাস আপনি দেশের বাইরে কোথাও যাননি কোনোদিন।'

বীরেনবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাতে হ্যাতে ফেললেন। আমি হতভম্ব, কী
যে হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি না।

'শক্র আমাকে বলেছিল আপনার বুদ্ধির কথা,' বললেন বীরেনবাবু, 'তাই
আপনাকে একটু পরীক্ষা করছিলাম।'

'তাহলে আর কী। খুলে ফেলুন আপনার অতিরিক্ত সাজ পোশাক।
হাজারিবাগের রাস্তার লোকের পক্ষে ওটা যথেষ্ট হলেও আমার পক্ষে নয়।'

বীরেনবাবু হাসতে তাঁর দাঢ়ি আর পরচুলা খুলে ফেললেন।
লালমোহনবাবু আমার পাশ থেকে চাপা গলায় 'কান...কান...কান' বলে থেমে
গেলেন। আমি জানি তিনি আবার ভুল নামটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু এবার
বললেও আর শুধরোতে পারতাম না, কারণ আমার মুখ দিয়েও কথা বেরোচ্ছে
না। কথা বললেন অখিলবাবু, 'বীরেন বাইরে যায়নি মানে? ওর চিঠিগুলো
তাহলে....?'

'বাইরে না গিয়েও বিদেশ থেকে চিঠি লেখা যায় অখিলবাবু, যদি আপনার
ছেলের মতো একজন কেউ বন্ধু থাকে বিদেশে, সাহায্য করার জন্য।'

'আমার ছেলে!'
'ঠিকই বলেছেন মিস্টার মিস্টার,' বললেন বীরেন কারাণ্ডিকার, 'অধীর যখন
ডুসেলডর্ফে, তখন ওকে চিঠি লিখে আমি বেশ কিছু ইউরোপীয় পোস্টকার্ড
আনিয়ে নিই। সেগুলোতে ঠিকানা আর যা কিছু লিখবার লিখে থামের মধ্যে ভরে
ওর কাছেই পাঠাতাম, আর ও টিকিট লাগিয়ে ডাকে ফেলে দিত। অবিশ্বিয় অধীর
দেশে ফিরে আসার পর সে সুযোগটা বন্ধ হয়ে যায়।'

'কিন্তু এই লুকোচুরির প্রয়োজনটা হল কেন?' জিগ্যেস করলেন অখিলবাবু।

'কারণ আছে' বলল ফেলুদা। 'আমি বীরেনবাবুকে জিগ্যেস করতে চাই আমার
অনুমান ঠিক কিনা।'

'বলুন।'

'বীরেনবাবু কর্নেল সুরেশ বিশ্বাসের জীবনী পড়ে মুক্ষ হয়েছিলেন, এবং তাঁর
মতো হতে চেয়েছিলেন। সুরেশ বিশ্বাস যে ঘর ছেড়ে খালাসী হয়ে বিদেশে গিয়ে
শেষে ব্রিজিলে যুদ্ধ করে নাম করেছিলেন সেটা আমার মনে ছিল। যেটা মনে
ছিল না সেটা আমি কাল রাত্রে বাঙালীর সার্কাস বলে একটা বই থেকে জেনেছি।
সেটা হল এই যে সুরেশ বিশ্বাস ছিলেন প্রথম বাঙালী যিনি বাঘ সিংহ ট্রেন করে
সার্কাসের খেলা দেখিয়েছিলেন। তাঁর সবচেয়ে আশ্চর্য খেলা ছিল সিংহের মুখ
ফাঁক করে তার মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দেওয়া।'

এখানে লালমোহনবাবু কেন জানি ভীষণ ছটফট করে উঠলেন।

'ও মশাই! ছ্যাঃ ছ্যাঃ ছ্যাঃ এই সেদিন পড়লুম, তাও খেয়াল হল না, ছ্যাঃ ছ্যাঃ
ছ্যাঃ....'

'আপনি ছ্যাছ্যাটা পরে করবেন, আগে আমাকে বলতে দিন।'

ফেলুদার ধর্মকে লালমোহনবাবু ঠাণ্ডা হলেন। ফেলুদা বলে চলল,
'বীরেনবাবুর অ্যাস্ফিশন ছিল আসলে বাঘ সিংহ নিয়ে খেলা দেখানো। কিন্তু
বাঙালী ভদ্রঘরের ছেলে আজকের দিনে ওদিকে যেতে চাইছে শুনলে কেউ কি
সেটা ভালো চোখে দেখত? মহেশবাবুই কি খুশ মনে মত দিতেন? তাই
বীরেনবাবুকে কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়েছিল। তাই নয় কি?'

'সম্পূর্ণ ঠিক,' বললেন বীরেনবাবু।

'কিন্তু আশ্চর্য এই যে, অ্যাদিন পরে ছেলেকে রিং-মাস্টার হিসেবে দেখেও
মহেশবাবু তাকে চিনতে পেরেছিলেন, যদিও অক্ষণবাবু সামনে থেকে দেখেও
চিনতে পারেননি। সেটার কারণ এই যে বীরেনবাবুর নাকে প্লাস্টিক সাজারি
করানো হয়েছিল, যে কারণে ছেলেবেলার ছবির সঙ্গেও নাকের মিল সামান্যই।'

'তাই বলুন।' বলে উঠলেন অখিলবাবু, 'তাই ভাবছি সবাই বীরেন বীরেন
করছে, অথচ আমি সঠিক চিনতে পারছি না কেন!'

'যাক গে,' বলল ফেলুদা, 'এখন আসল কাজে আসি।'

ফেলুদা পকেট থেকে মুক্তানদের ছবিটা বার করল। তারপর বীরেনবাবুর
দিকে ফিরে বলল, 'আপনি বোধহ্য জানেন না যে, আপনি আর ফিরবেন না
ভেবে মহেশবাবু আপনাকে তাঁর উইল থেকে বাদ দিয়েছিলেন। সেই উইল আর
বদল করার উপায় ছিল না। অথচ আপনি একেবারে বঞ্চিত হন সেটাও উনি
চাননি। তাই এই ছবিটা আগন্তকে দিয়েছেন।'

ফেলুদা ছবিটা উলটে পিছনটা খুলে ফেলল। ভিতর থেকে বেরোল একটা

ভাঁজ করা সেলোফেনের খাম, তার মধ্যে ছেট ছেট কতগুলো রঙিন কাগজের টুকরো।

‘তিনটি মহাদেশের ন’টি দুপ্রাপ্য ডাকটিকিট আছে এখানে। অ্যালবাম চুরি যেতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি তাঁর সবচেয়ে মূল্যবান স্ট্যাম্প ক’টি এইভাবে লুকিয়ে রেখেছিলেন। গিবন্স ক্যাটালগের হিসেবে পঁচিশ বছর আগে এই ডাকটিকিটের দাম ছিল দু’ হাজার পাউন্ড। আমার ধারণা আজকের দিনে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা।’

বীরেন্দ্র কারাণ্ডিকার খামটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ দেখলেন সেটার দিকে। তারপর বললেন, ‘সার্কাসের রিং-মাস্টারের হাতে এ জিনিস যে বড় বেমানান, মিঃ মিত্র ! আমি যুব অসহায় বোধ করছি। আমরা যায়াবর, ঘুরে ঘুরে খেলা দেখিয়ে বেড়াই, আমাদের কাছে এ জিনিস....?’

‘বুঝতে পারছি,’ বলল ফেলুদা, ‘এক কাজ করুন। ওটা আমাকেই দিন। কলকাতার কিছু স্ট্যাম্প ব্যবসায়ীর সঙ্গে চেনা আছে আমার। এর জন্য যা মূল্য পাওয়া যায় সেটা আমি আপনাকে পাঠিয়ে দেব। আমার উপর বিশ্বাস আছে তো আপনার ?’

‘সম্পূর্ণ।’

‘কিন্তু আপনার ঠিকানাটা যে আমাকে দিতে হবে !’

‘গ্রেট ম্যাজেস্টিক সার্কাস,’ বললেন বীরেনবাবু, ‘কুটি বুঝেছে যে আমাকে ছাড়া তার চলবে না। আমি এখনো কিছুদিন আছি এই সার্কাসের সঙ্গে। আজ রাত্রে সুলতানকে নিয়ে খেলা দেখাব। আসবেন।’



রাত্রে গ্রেট ম্যাজেস্টিক সার্কাসে সুলতানের সঙ্গে কারাণ্ডিকারের আশচর্য খেলা দেখে বেরোবার আগে আমরা বীরেনবাবুকে থ্যাক ইউ আর গুড বাই জানাতে তাঁর তাঁবুতে গেলাম। আইডিয়াটা লালমোহনবাবুর, আর কারণটা বুঝতে পারলাম তাঁর কথায়।

‘আপনার নামটার মধ্যে একটা আশচর্য কাঙ্কারখানা রয়েছে,’ বললেন জটায়ু, ‘ডু ইউ মাইন্ড যদি আমি নামটা আমার সামনের উপন্যাসে ব্যবহার করি ? সার্কাস নিয়েই গল্প, রিং-মাস্টার একটা প্রধান চরিত্র।’

বীরেনবাবু হেসে বললেন, ‘নামটাতো আমার নিজের নয় ! আপনি স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পারেন।’

ধন্যবাদ জানিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসার পর ফেলুদা বলল, ‘তাহলে ইনজেকশন বাদ ?’

‘বাদ কেন মশাই ? ইনজেকশন দিচ্ছে বাঘকে। ভিলেন হচ্ছে সেকেন্ড ট্রেনার। বাঘকে নিষ্ঠেজ করে কারাণ্ডিকারকে ডাউন করবে দর্শকদের সামনে !’
‘আর ট্র্যাপীজ ?’

‘ট্র্যাপীজ ইজ নাথিং,’ অবজ্ঞা আর বিরক্তি মেশানো সুরে বললেন লালমোহন গাঙ্গুলী।

ডাঃ মুনসীর ডায়রি

আজ চায়ের সঙ্গে চানাচুরের বদলে সিঙ্গাড়া। লালমোহনবাবু কিছুদিন থেকেই বলছেন, ‘খাই-খাই’ বলে একটা দোকান হয়েছে মশাই, আমার বাড়ি থেকে হাফ-এ-মাইল, সেখানে দুর্দান্ত সিঙ্গাড়া করে। একদিন নিয়ে আসব।’

আজ সেই সিঙ্গাড়া এসেছে, আর লালমোহনবাবুর কথা যে সত্যি, সেটা প্রমাণ হয়ে গেছে।

‘সামনের বৈশাখে আপনার যে বইটা বেরোবে তার ছক কাটা হয়ে গেছে?’
জিগ্যেস করল ফেলুদা।

‘ইয়েস স্যার! কাম্পুচিয়ায় কম্পমান। এবার দেখবেন প্রথর কুন্দের হাবভাব কায়দাকানুন অনেকটা ফেলু মিঞ্জিরের মতো হয়ে আসছে।’

‘অর্থাৎ সে আরো প্রথর হয়ে উঠেছে এই তো?’

‘তা তো বটেই।’

‘গোয়েন্দার ইমপ্রুভমেন্টের সঙ্গে সঙ্গে তার সৃষ্টিকর্তাও ইমপ্রুভ করছেন নিশ্চয়ই।’

‘এই ক’বছর সমানে যে আপনার আশেপাশে ঘূর ঘূর করছি, তাতে অনেকটা বেনিফিট যে পাওয়া যাবে সেটাতো আপনি অঙ্গীকার করবেন না?’

‘সেটা মানব যদি আপনি পরীক্ষায় উন্নীর্ণ হতে পারেন।’

‘কী পরীক্ষা?’

‘পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার পরীক্ষা। বলুন তো আমার মধ্যে কোনো পরিবর্তন দেখছেন কিনা। আপনিতোগতকালও সকালে এসেছিলেন; আজকের আমি আর গতকালের আমির মধ্যে কোনো তফাত দেখছেন কি?’

লালমোহনবাবু উঠে দাঁড়িয়ে দু’পা পিছিয়ে গিয়ে মিনিটখানেক ফেলুদাকে আপাদমস্তক স্টাডি করে বললেন, ‘কই, না তো! উঁহ। নো ডিফারেন্স। কোনো

তফাত নেই।'

'হল না। ফেল। অতএব পথৰ কন্দও ফেল। আপনি আসাৰ দশ মিনিট আগে আমি প্ৰায় এক মাস পৱে হাত আৰ পায়েৰ নখ কেটেছি। কিছু দিদেৱ চাঁদেৱ মতো হাতেৰ নখ এখনও মেৰোতে পড়ে আছে। ওই দেখুন।'

'তাও তো!'

লালমোহনবাবু কিছুক্ষণেৱ জন্য খানিকটা নিষ্পত্ত হয়ে হঠাৎ ফেলুদাৰ দিকে চেয়ে বললেন, 'ভেৰি ওয়েল; এবাৰ আপনি বলুনতোদেখি আমাৰ মধ্যে কী চেষ্ট কৰছেন।'

'বলব ?'

'বলুন।'

ফেলুদা চায়েৰ খালি কাপটা টেবিলে রেখে চাৰমিনাৰেৱ প্যাকেটটা তুলে নিয়ে বলল, 'নাহাব ওয়ান, আপনি কাল অবধি লাঙ্গ টয়লেট সোপ ব্যবহাৰ কৰেছেন; আজ সিহুলেৰ গৰ্জ পাছি। খুব সন্তুষ্টত টি. ভি. বিজ্ঞাপনেৰ চটকেৰ ফলে।'

'ঠিক বলেছেন মশাই। এনিথিং এলস ?'

'আপনি পাঞ্জাবিৰ বোতাম সব কটাই লাগিয়ে থাকেন; আজ অনেকদিন পৰ দেখছি ওপৱেরটা খোলা। নতুন পাঞ্জাবিতে বোতাম লাগাতে অনেক সময় বেশ কসৰত কৰতে হয়। ওপৱেরটায় সেই কসৰতে কোনো ফল হয়নি বলে মনে হচ্ছে।'

'মোক্ষম ধৰেছেন।'

'আৱো আছে।'

'কী ?'

'আপনি রোজ সকালে একটি কৰে রসুনেৰ কোয়া চিবিয়ে থান; সেটা আপনি ঘৰে এলেই বুৰুতে পাৰি। আজ পাৰছি না।'

'আৱ বলবেন না। ভৱনাজটা এমন কেয়াৱলেস। দিয়েছি কড়া কৰে ধৰক। এইটিসিল্ল থেকে রসুন ধৰিচি মশাই, সকালে ডেইলি এক কোয়া। আমাৰ সিস্টেমটাই—'

জটায়ুৰ রসুনেৰ শুণকীৰ্তন কমাতে হল, কাৱণ কলিং বেল বেজে উঠেছে। দৱজা খুলে দেখি ফেলুদাৰই বয়সী এক ভদ্ৰলোক।

ফেলুদা উঠে দাঁড়াল।

'আসুন—'

'আপনিই তো ?'

'আমাৰ নাম প্ৰদোষ মিত্ৰ।'

ভদ্ৰলোক সোফায় বসে বললেন, 'আমাৰ নাম শক্তিৰ মুনসী। আমাৰ বাবাৰ

নাম হয়ত আপনি শুনে থাকবেন, ডাক্তার রাজেন মুনসী।'

'সাইকায়াট্ৰিস্ট ?'

আমি জানতাম যাবা মনেৰ ব্যারামেৰ চিকিৎসা কৰে তাদেৱ বলে সাইকায়াট্ৰিস্ট।

'সেদিনই খবৱেৱ কাগজে ওৱ বিষয় একটা খবৱ পড়লাম না? একটা ছবিও তো বেৱিয়েছিল।'

'হাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন, বললেন শক্তিৰ মুনসী। 'গত চলিশ বছৰ ধৰে উনি একটা ডায়ারি লিখেছেন, সেটা পেঙ্গুইন ছাপছে। আপনি হয়ত জানেন না। বাবাৰ মনোবিজ্ঞানী হিসাবে সুনাম আছে ঠিকই, কিন্তু আৱেকটা ব্যাপারেও তিনি ছিলেন অসাধাৰণ। সেটা হল শিকাৰ। পঁচিশ বছৰ আগে শিকাৰ ছাড়লেও, এই ডায়ারিতে তাঁৰ শিকাৰেৰ অভিজ্ঞতাৰ বৰ্ণনাও আছে। পেঙ্গুইন এখনো লেখাটা পড়েনি; সাইকায়াট্ৰিস্ট শিকাৰীৰ ডায়ারি শুনেই ছাপাৰ প্ৰস্তাৱ দেয়। তবে লেখক হিসেবে যে বাবাৰ সুনাম আছে সেটা তাৰা জানে। মনোবিজ্ঞান সমষ্কে চমৎকাৰ ইংৰিজিতে লেখা বাবাৰ অনেক প্ৰকাশ নানান পত্ৰ পত্ৰিকায় বেৱিয়েছে।'

'খবৱটা কি আপনাৰাই কাগজে দেন ?'

'না, ওটা প্ৰকাশকেৰ তৰফ থেকে বেৱোয়।'

'আই সী !'

'যাই হোক, এবাৰ আসল ব্যাপারটায় আসি। বাবাৰ গৰ্ব হচ্ছে যে এ ডায়ারিতে তিনি একটিও মিথ্যা কথা লেখেননি। তিনজন লোককে নিয়ে তিনটি ঘটনাৰ উল্লেখ আছে ডায়ারিতে। যদেৱ পুৱো নামটা ব্যবহাৰ না কৰে বাবা নামেৰ প্ৰথম অক্ষরটা ব্যবহাৰ কৰেছেন। এই অক্ষৰ তিনটি হল "এ", "জি", আৱ "আৱ"। এৱা তিনজনেই আজ সমাজে সম্মানিত, সাক্ষেসফুল ব্যক্তি। কিন্তু তিনজনেই, বেশ অনেককাল আগে, তিনটি অত্যন্ত গহিত কাজ কৰেন, এবং তিনজনেই নানান ফিকিৱে আইনেৰ হাত থেকে রেহাই পান। যদিও পুৱো নাম ব্যবহাৰ না কৰাৰ দৱলন বাবা আইনেৰ হাত থেকে সম্পূৰ্ণ নিৱাপদ। তবুও প্ৰকাশকেৰ কাছ থেকে অফাৰটা পাবাৰ পৰ বাবা তিনজনকেই ব্যাপারটা বলেন। "এ" আৱ "জি" প্ৰথমে আপত্তি তোলে, তাৱপৰ বাবা বুঝিয়ে বলাৰ পৰ খানিকটা অনিচ্ছা সত্ৰেও রাজি হয়। "আৱ" নাকি কোনোৱৰকম আপত্তি তোলেনি।'

'গতকাল দুপুৰে খেতে বসেছি, এমন সময় চাকুৰ এসে বাবাকে একটা চিঠি দেয়। সেটা পড়ে বাবাৰ মুখ গন্তীৰ হয়ে যায়। কাৱণ জিগোস কৰাতে বাবাৰ মুখে প্ৰথম "এ", "জি" আৱ "আৱ"-এৱ বিষয় শুনি, আগে কিছুই জানতাম না।'

'কেন ?'

'বাবা লোকটা একটু পিকিউলিয়াৰ। উনি পেশা আৱ পেশেণ্ট ছাড়া আৱ কিছু

জানেন না। আমি, মা, সংসার—এসব সম্পর্কেই বাবা সম্পূর্ণ উদাসীন। মা মানে আমার বিমাতা, স্টেপমাদার। আমার যখন তিনি বছর বয়স তখন আমার মা মারা যান। তার দু বছর পরে বাবা আবার বিয়ে করেন। এই নতুন মা যে আমাকে খুব কাছে টেনে নিয়েছিলেন তা বলতে পারি না। আমাদের বাড়ির এক অনেক দিনের পুরানো চাকর আমার দেখাশুনা করত। সেই ব্যবধান এখনো রয়ে গেছে। যদিও এটা বলব যে বাবার ম্মেহ যেমন পাইনি, তেমনি তাঁর শাসনও ভোগ করিনি।'

'এবং তাঁর ডায়রিও পড়েননি?'

'না। শুধু আমি না, কেউই পড়েনি।'

'আসল প্রসঙ্গ থেকে আমরা একটু দূরে সরে এসেছি। ওই চিঠি কি এই তিনজনের একজন লিখেছেন?'

'ইয়েস, ইয়েস। এই দেখুন।'

শঙ্করবাবু একটা খাম বার করে ফেলুদাকে দিলেন। তা থেকে যে চিঠিটা বেরোল সেটা ফেলুদার পিছনে দাঁড়িয়ে আমি আর লালমোহনবাবুও পড়লাম। প্রথমেই তলায় দেখলাম 'এ'। তার উপর লেখা 'আই টেক ব্যাক মাই ওয়ার্ড। ডায়রি ছাপতে হলে আমার অংশ বাদ দিয়ে ছাপতে হবে। এটা অনুরোধ নয়, আদেশ। আমান্য করলে তার ফল ভোগ করতে হবে।'

'একটা প্রশ্ন আছে', বলল ফেলুদা। 'এই তিনি ব্যক্তির অপরাধের কথা আপনার বাবা জানলেন কী করেন?'

'সেও খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। কৌশলে আইনের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে "এ", "জি" আর "আর" মনে শাস্তি পায়নি। গভীর অনুশোচনা, শেষটায় ঘটনাচক্রে ধরা পড়ে যাবার ভয় ক্রমে মানসিক ব্যারামে দাঁড়ায়। বাবার তখনই বেশ নাম ডাক, এরা তিনজনেই বাবার কাছে আসে চিকিৎসার জন্য। সাইকায়াট্রিস্টের কাছে তো আর কিছু লুকোনো চলে না; সব প্রশ্নের সঠিক জবাব না দিলে চিকিৎসাই হবে না। এই ভাবে বাবা এদের ঘটনাগুলো জানতে পারেন।'

'হমকি কি শুধু "এ"-ই দিয়েছে?'

'এখন পর্যন্ত তাই, তবে "জি" সম্বন্ধেও বাবার সংশয় আছে!'

'এই তিনজনের অপরাধ কী তা আপনি জানেন?'

'না। শুধু তাই না; এদের আসল নাম, এখন এরা কী করছে, এসব কিছুই বলেননি বাবা। তবে আপনাকে নিশ্চয়ই বলবেন।'

'উনি কি আমার খৌজ করছেন?'

'সেই জন্যেই তো এলাম। বাবা ওঁর এক পেশেন্টের কাছ থেকে আপনার নাম শুনেছেন। আমাকে জিগ্যেস করাতে আমি বললাম গোয়েন্দা হিসেবে আপনার যথেষ্ট খ্যাতি আছে। তাতে বাবা বললেন "মানুষের মনের চাবিকাঠি হাতে না



থাকলে ভালো গোয়েন্দা হওয়া যায় না। ওকে একটা কল দিতে পারলে ভালো হত। এইসব হমকি-টুমকিতে শাস্তিভঙ্গ হয়। ফলে কাজের ব্যাঘাত হয়। সেটা আমি একেবারেই চাই না।' আমি তখনই বাবাকে জিগ্যেস করি মিত্রিকে কখন আসতে বলব। বাবা বললেন, রবিবার সকাল দশটা। এখন আপনি যদি...'

'বেশ তো; আমার দিক থেকে আপত্তি করার তোকোনো কারণই নেই।'

'তাহলে এই কথা রইল। রবিবার সকাল দশটা, নাম্বার সেভ্ন সুইনহো স্ট্রীট।'

সাত নম্বর সুইনহো স্ট্রিট ডাক্তারের বাড়ি বলে মনেই হয় না ; তার সদর দরজা দিয়ে ঢুকে প্রথমেই চোখে পড়ে একটা দাঁড়ানো রয়েল বেঙ্গল টাইগার, আর তার পিছনের দেয়ালে উপর দিকে একটা বাইসনের মাথা ।

শঙ্করবাবু নিচেই অপেক্ষা করছিলেন, আমরা তাঁর সঙ্গে দোতলায় গিয়ে বেঠকখানায় বসলাম । এবরেও চতুর্দিকে শিকারের চিহ্ন । ভদ্রলোক ডাক্তারি করে এত জানোয়ার মারার সময় কী করে পেলেন তাই ভাবছিলাম ।

মিনিট খানেকের মধ্যেই ডাঃ মুনসী এসে পড়লেন । মাথার চুল সব সাদা হয়ে গেছে, তবে এখনো যে বেশ শক্ত সমর্থ সেটা দেখলেই বোঝা যায় । ভদ্রলোক ফেলুদার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বললেন, ‘আপনার তো বায়াম করা শরীর বলে মনে হচ্ছে । ভেরি শুড় । আপনার কাজ প্রধানত মাথার হলেও আপনি যে শরীরের প্রতি দৃষ্টি রেখেছেন সেটা দেখে ভালো লাগল ।’

এবার ভদ্রলোক জটায় ও আমার দিকে চাইতে ফেলুদা আমাদের পরিচয় করিয়ে দিল ।

‘ঞ্চারা ট্রাস্টওয়ার্ডি কি ?’ ডাঃ মুনসী প্রশ্ন করলেন ।

‘সম্পূর্ণ, বলল ফেলুদা, ‘তপেশ আমার খুড়তুতো ভাই এবং আমার সহকারী, আর মিঃ গান্দুলী আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ।’

‘এই জন্যে জিগোস করছি কারণ আজ সেই তিন ব্যক্তির আসল পরিচয় আমাকে দিতে হবে, না হলে আপনি কাজ করতে পারবেন না । এই পরিচয় শুধু আপনারা তিনজনই জানবেন, আর কেউ জানে না, আর কাউকে বলিনি ।’

‘আপনি নির্ভয়ে বলতে পারেন, ডাঃ মুনসী’, বললেন জটায়ু । ‘আমি অন্তত আর কাউকে বলব না ।’

‘ভেরি ওয়েল !’

‘তাহলে বলুন কী করতে পারি । হ্যাম্প্রি চিঠির কথা আপনার ছেলে বলেছেন ।’

‘শুধু হ্যাম্প্রি চিঠি নয়’, বললেন ডাঃ মুনসী, ‘হ্যাম্প্রি টেলিফোনও বটে । এটা কাল রাত্রের ঘটনা । তখন সাড়ে এগারোটা বোঝাই যায় মন্ত অবস্থায় ফোন করছে । হিগিনস । জর্জ হিগিনস ।’

‘আপনার ডায়ারির “জি” ?’

‘ইয়েস । বলে কী—“সেদিন টেলিফোনে আমি অত্যন্ত বোকার মতো কথা বলেছি । যখন তোমার কাছে ট্রাইটমেন্টের জন্য যাই, তখন আমার যে ব্যবসা ছিল, এখনও সেই ব্যবসাই রয়েছে । একচেটিয়া ব্যবসা আমার, সুতরাং ‘জি’ থেকে অনেকেই আমার আসল পরিচয় অনুমান করতে পারবে । সো কাট মি আউট ।”

মাতালকে তো আর যুক্তি দিয়ে কিছু বোঝানো যায় না । ফলে ফোন রেখে দিতে হল । বুঝতেই পারছেন, আমি রঁগী নিয়ে এত ব্যস্ত থাকি যে এদের বাড়ি গিয়ে সামনাসামনি কথা বলে যে কিছু বোঝাবো তার সময় বা সামর্থ্য আমার নেই । এ কাজের ভারটা আমি আপনাকে দিতে চাই । “এ” এবং “জি” । “আর”-কে নিয়ে চিন্তার কারণ নেই । কারণ তার সঙ্গে কথা বলে জেনেছি যে নামের আদ্যক্ষর থেকে তাকে কেউ চিনে ফেলবে এ আশঙ্কা তার নেই ।’

‘কিন্তু এই তিনজনের আসল পরিচয়টা— ?’

‘কাগজ পেনসিল আছে ?’

ফেলুদা পকেট থেকে নোটবুক আর ডট পেন বার করল ।

‘লিখুন, “এ” হল অরুণ সেনগুপ্ত । ম্যাকনীল কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার, রোটারি ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট । বাসস্থান এগারো নম্বর রোল্যান্ড রোড । ফোন নম্বর ডি঱েক্টরিতে দেখে নেবেন ।’

ফেলুদা চটপট ব্যাপারটা লিখে নিল ।

‘এবার লিখুন’, বলে চললেন ডাঃ মুনসী, “জি” হল জর্জ হিগিনস । টেলিভিশনের জন্য বিদেশে জানোয়ার চালান দেবার ব্যবসা এর । বাড়ির নম্বর নকুল রিপন স্ট্রিট । রাস্তার নাম থেকে বুঝতে পারবেন উনি পুরো সাহেব নন, অ্যাঙ্গলো ইন্ডিয়ান । তৃতীয় ব্যক্তির আসল পরিচয় প্রয়োজন হলে দেব, নচেৎ নয় ।’

‘এদের অপরাধগুলো ?’

‘শুনুন, আমার পাণ্ডুলিপি আজ আপনি নিয়ে যাবেন । মন দিয়ে পড়ে আপনার বুদ্ধি বিবেচনা প্রয়োগ করে আমাকে বলবেন এতে আপনিকের কিছু আছে কিনা যার ফলে বইটা বাজারে বেরোলে আমার ক্ষতি হতে পারে ।’

‘ঠিক আছে । তাহলে— ?’

ফেলুদাকে থামতে হল, কারণ ঘরে তিনজন লোকের প্রবেশ ঘটেছে । ডাঃ মুনসী তাদের দিকে দেখিয়ে বললেন, ‘আপনি আসছেন শুনে এরা সকলেই আপনাকে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন । আমার স্ত্রী ছাড়া এই কজন এবং আমার ছেলেই এখন আমার বাড়ির বাসিন্দা । আলাপ করিয়ে দিই, এ হচ্ছে সুখময় আমার সেক্রেটারি ।’

একজন চশমা-পরা বছর চলিশেকের ভদ্রলোকের দিকে দেখালেন ডাঃ মুনসী ।

‘আর ইনি হচ্ছেন আমার শ্যালক চন্দ্রনাথ ।’

ঁঁর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি । দেখে কেন জানি মনে হয় ইনি বিশেষ কিছু করেন-টরেন না, এ বাড়িতে আশ্রিত হয়ে রয়েছেন ।

‘আর ইনি আমার পেশেণ্ট রাধাকান্ত মল্লিক । ঁঁর চিকিৎসা শেষ না হওয়া

পর্যন্ত এখনেই আছেন।'

ঁকে দেখে মনে হয় এৰ অসুখ এখনো সারেনি। হাত কচলাচ্ছেন, চোখ পিট পিট কৰছেন, আৰ একটানা সুষ্ঠিৰ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পাৰছেন না। বয়স আন্দাজ চলিশ-পঁয়তালিশ।

পৰিচয়েৰ পৱে একমাত্ৰ সুখময়বাৰু ছাড়া আৰ সকলেই চলে গেলেন। ডাঃ মুনসী সেক্রেটৱিৰ দিকে ফিরে বললেন, 'সুখময়, যাও, আমাৰ লেখাটা এনে প্ৰদোষবাৰুকে দাও।'

ভদ্ৰলোক দু মিনিটোৱে মধ্যে একটা বড়, মোটা খাম এনে ফেলুদাকে দিলেন।

'ওৱ কিন্তু আৰ কপি নেই', বললেন ডাঃ মুনসী। 'পাবলিশাৱকে দেবাৰ আগে ওটা সুখময় টাইপ কৰে দেবে।'

'আপনি কোনো চিন্তা কৰবেন না', বলল ফেলুদা, 'আমি এটাৰ মূল্য খুব ভালোভাবেই জানি।'

আমৱা উঠে পড়লাম। শঙ্কৰবাৰু পাশেৰ ঘৱেই অপেক্ষা কৰছিলেন। এবাৰ এসে আমাদেৱ সদৰ দৰজা অবধি পৌছে দিলেন। তাৰপৰ লালমোহনবাৰুৰ সবুজ আ্যাসাডৱে চড়ে আমৱা বাড়িমুখো রওনা দিলাম।

'একটা রিকুয়েন্ট আছে মশাই', লালমোহনবাৰু হঠাৎ বললেন।

'কী?'

'আপনাৰ পড়া হলে পৱ আমি একবাৰ দু দিনেৰ জন্য পাণ্ডুলিপিটা নেৰো। এটা রিফিউজ কৰবেন না, মীজ !'

'আপনাৰ না পড়লেই নয় ?'

'না-পড়লেই নয়। বিশেষ কৰে শিকাৱ কাহিনী পড়তে আমাৰ দুৰ্দান্ত লাগে।'

'বেশ, দেবো। তবে দু দিন নয়; আপনি যে সকালে নেবেন, তাৰ পৱেৱ দিন সকালেই ফেৰত দিতে হবে। তাৰ মধ্যে শিকাৱেৰ অংশ আপনাৰ নিশ্চয়ই পড়া হয়ে যাবে। কাৰণ ১৯৬৫-এৱ পৱতো আৰ ভদ্ৰলোক শিকাৱ কৱেননি।'

'তাই সই।'

॥ ৩ ॥

ডাঃ মুনসীৰ হাতেৰ লেখা বেশ পৰিকাৱ হলেও, তিনশো পঁচাত্তৰ পাতাৱ পাণ্ডুলিপিটা পড়তে ফেলুদাৰ লাগল তিন দিন। এত সময় লাগাৱ একটা কাৰণ অবিশ্য এই যে ফেলুদা পড়াৰ ফাঁকে ফাঁকে অনেক কিছু নিজেৰ খাতায় নোট কৱে নিছিল।

তিন দিনেৰ পৱেৱ দিন রাবিবাৱ সকালে যথাৱীতি জটায়ু এসে হাজিৱ। প্ৰথম প্ৰশ্নই হল, 'কী স্যার, হল ?'

'হয়েছে।'

'আপনি কী সিদ্ধান্তে এলেন শুনি। এ ডায়াৰি নিৰ্ভয়ে ছাপাৰ মোগ্য ?'

'সম্পূৰ্ণ। তবে তাতে তোহমকি বক্ষ কৰা যায় না। এই তিনজনেৰ একজনও যদি ধৰে বসে থাকে যে নামেৰ আদ্যক্ষৰ থেকেই লোকে বুৰো ফেলবে কাৰ কথা বলা হচ্ছে তাহলে সে এ বই ছাপা বক্ষ কৰাৰ জন্য কী যে না কৰতে পাৱে তাৰ ঠিক নেই।'

'ইন্ন মাৰ্ডাৰ ?'

'তা তো বটেই। একজনেৰ কথাই ধৰা যাক। "এ"। অৱৰণ সেনগুপ্ত। পূৰ্ববঙ্গেৰ এক জমিদাৰ বংশেৰ ছেলে। যুবা বয়সে ছিলেন এক ব্যাক্ষেৰ মধ্যে পদচৰ কৰ্মচাৰী। কিন্তু রক্তেৰ মধ্যে ছিল চূড়ান্ত সৌখিনতা। ফলে প্ৰতি মাসেই আয়েৱ চেয়ে ব্যয় বেশি। শেষে কাৰুলিওয়ালাৰ শৱণাপন্ন হওয়া।'

এই ফাঁকে বলে রাখি, ফেলুদা একবাৰ বলেছিল যে আজকাল আৰ দেখা যায় না বটে কিন্তু বছৰ কুড়ি আগেও রাস্তাৰ মোড়ে মোড়ে দেখা যেত লাগিছতে কাৰুলিওয়ালা দাঁড়িয়ে আছে। এদেৱ ব্যবসা ছিল মোটা সুদে টাকা ধাৰ দেওয়া।

ফেলুদা বলে চলল, 'একটা সময় আসে যখন দেনাৰ অঞ্চল এমন ফুলে ফৈলে ওঠে যে মৰিয়া হয়ে অৱৰণ সেনগুপ্তকে ব্যাক্ষেৰ তহবিল থেকে চলিশ হাজাৰ টাকা চুৱি কৰতে হয়। কিন্তু সেটা সে এমন কৌশলে কৰে যে দোষটা গিয়ে পড়ে একজন নিৰ্দেশ কৰ্মচাৰীৰ উপৰ। ফলে সে বেচাৱিকে জেল খাটতে হয়।'

'বুৰোছি,' বিজ্ঞেৱ মতো মাথা নেড়ে বললেন জটায়ু। 'তাৰপৰ অনুশোচনা, তাৰপৰ মাথাৰ ব্যারাম, তাৰপৰ মনোবিজ্ঞানি। ...কিন্তু ভদ্ৰলোক যে এখন একেবাৰে সমাজেৰ উপৰ তলায় বাস কৰছেন। তাৰ মানে মুনসীৰ চিকিৎসায় কাজ দিয়েছিল ?'

'তা তো বটেই। সে কথা মুনসী তাঁৰ ডায়াৰিতে লিখেওছেন—যদিও তাৰপৰে আৱ কিছু লেখেননি। কিন্তু আমৱা বেশ অনুমান কৰতে পাৰি যে এই ঘটনাৰ পৱ সেনগুপ্ত নিশ্চয়ই তাৰ জীবনেৰ ধাৰা পালটে ফেলে ত্ৰিশ বছৰ ধৰে ধীৱে ধীৱে ধাপে ধাপে উপৱে উঠে আজকেৰ অবস্থায় পৌছেছেন। বুৰাতেই পাৱেন সেখান থেকে আবাৱ পিছলে পড়াৰ আশক্ষা যদি দেখা দেয়, যতই অমূলক হোক, তাহলে সেনগুপ্ত সাহেব মাথা ঠিক রাখেন কী কৰে ?'

'বুৰালাম,' বললেন জটায়ু, 'আৱ অন্য দুজন ?'

"আৱ" ব্যক্তি সম্বন্ধে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নেই সে তো সেদিন মুনসীৰ মুখেই শুনলেন। এৰ আসল নামটা উনি বলেননি, তাই আমিও বলতে পাৰছি না। ইনি এককালে একটি লোককে গাড়ি চাপা দিয়ে মাৱেন, তাৰপৰ এদিকে ওদিকে মোটা ঘৃষ দিয়ে আইনেৰ হাত থেকে নিজেকে বাঁচান। ইনিও ডাঃ মুনসীৰ হাতে

নিজেকে সমর্পণ কৰে বিবেকযন্ত্ৰণা থেকে রেহাই পান।...ইন্টাৱেস্টিং হল “জি”-ৰ
ঘটনা।’

‘কী রকম?’

‘ইনি হে ফিরিঙ্গি সে তো জানেন। আৱ এৰ ব্যবসাৰ কথাও জানেন। নবুই
নম্বৰ রিপন স্ট্ৰাইটে একটি বড় দোতলা বাড়িতে থাকতেন জর্জ হিগিন্স। ১৯৬০-এ
এক সুইডিশ ফিল্ম পৰিচালক কলকাতায় আসেন ভাৱতৰবৰ্মেৰ ব্যাকগাউণ্ডে একটা
ছবি কৰবেন বলে। তাৰ গল্পেৰ জন্য একটি লেপার্টেৰ প্ৰয়োজন ছিল। ইনি
ছিল কৰবেন বলে। তাৰ গল্পেৰ জন্য একটা লেপার্টেৰ হিগিন্সেৰ একটা লেপার্ট
হিগিন্সেৰ খবৰ পেয়ে তাৰ সঙ্গে গিয়ে দেখা কৰেন। হিগিন্সেৰ একটা লেপার্ট
সুইডিশ পৰিচালক একমাসেৰ জন্য লেপার্টটাকে ভাড়া কৰেন। কথা ছিল
একমাস পৰে তিনি অক্ষত অবস্থায় ফেরত দেবেন। আসলে ফিল্ম পৰিচালক
মিথ্যা কথা বলেন, কাৰণ তাৰ গল্পে ছিল গ্ৰামবাসীৱাৰ সবাই মিলে লেপার্টটাকে
মেৰে ফেলে। এক মাস পৰে পৰিচালক এসে হিগিন্সকে আসল ঘটনাটা বলে।
মেৰে ফেলে। পৰমুহূৰ্তে রাগ চলে গিয়ে তাৰ জ্যায়গায় আসে আতঙ্ক। কিন্তু সেই
মেৰে ফেলে। পৰমুহূৰ্তে রাগ চলে গিয়ে তাৰ জ্যায়গায় আসে আতঙ্ক। কিন্তু সেই
অবস্থাতেও পুলিশৰ চোখে ধুলো দেৰার ফন্দি হিগিন্স বাব কৰে। সে প্ৰথমে
ছুৱি দিয়ে মৃত পৰিচালকেৰ সবাপি ক্ষতিচৰ্হে ভাৰিয়ে দেয়। তাৱপৰ তাৰ
কালেকশনেৰ একটা হিংস্র বন্বেড়ালকে খাঁচাৰ দৱজা খুলে বাইৱে বাব কৰে
সেটাকে গুলি কৰে মারে। ফলে ব্যাপারটা দাঁড়ায়, খাঁচা ছাড়া বন্বেড়াল
পৰিচালককে হত্যা কৰে এবং বন্বেড়ালকে হত্যা কৰে হিগিন্স। ফিকিৰটা কাজে
দেয়, হিগিন্স আইনেৰ হাত থেকে বাঁচে। কিন্তু তাৱপৰ একমাস ধৰে ক্ৰমাগত
স্বপ্নে নিজেকে ফঁসিকাটে ঝুলতে দেখে অগত্যা মুনসীৰ চেম্বাৱে গিয়ে হাজিৱ
হয়।’

‘হঁ...’ বললেন জটায়ু। ‘তাহলে এখন কি কৰ্তব্য?’

‘দুটো কৰ্তব্য,’ বলল ফেলুদা। ‘এক হল পাণ্ডুলিপিটা আপনাকে দেওয়া, আৱ
দুই—“এ”কে একটা টেলিফোন কৰা।’

জটায়ু হাসিমুখে ফেলুদার হাত থেকে পাণ্ডুলিপি ভৱা মোটা খামটা নিয়ে
বললেন, ‘ফোন কৰবেন কি আ্যাপয়েন্টমেন্ট কৰাৰ জন্য?’

‘ন্যাচাৱেলি,’ বলল ফেলুদা। ‘আৱ দেৱি কৰাৰ কোনো মানে হয় না।
তোপসে—এসেন্টগুপ্ত, ১১ রোল্যান্ড রোড, নম্বৰটা বাব কৰতো।’

আমি ডাইৱেষ্টিটিটা হাতে নিতেই ফোনটা বেজে উঠল। আমিই ধৰলাম। ডাঃ
মুনসী। ফেলুদাকে বলতেই ও আমাৰ হাত থেকে ফোনটা ছিনিয়ে নিল।

ডাঃ মুনসীৰ ডায়ারি

ব্যাপার আৱ কিছুই নয়—সেনগুপ্ত আৱেকটা হৰ্মকি চিঠি দিয়েছেন। তাতে
কী বলা হয়েছে সেটা ফেলুদা তাৰ খাতায় লিখে নিল। তাৱপৰ ফেলুদা তাৰ শেষ
কথাটা বলে ফোনটা রেখে দিল।

সেনগুপ্তৰ দ্বিতীয় হৰ্মকিটা হচ্ছে এই—‘সাতদিন সময়। তাৰ মধ্যে
কলকাতাৰ প্ৰত্যেক বাংলা ও ইংৰিজি কাগজে বিজ্ঞপ্তি দেখতে চাই যে অনিবার্য
কাৰণে ডায়াৰি ছাপা সম্ভব হচ্ছে না। সাতদিন। তাৱপৰে আৱ হৰ্মকি নয়—কাজ,
এবং কাজটা আপনাৰ পক্ষে প্ৰতিকৰণ হবে না বলাই বাছল্য।’

আমি সেনগুপ্তৰ ফোন নম্বৰ বাব কৰে ডায়াল কৰে একবাৰেই লাইন পেয়ে
গোলাম। ফেলুদার হাতে ফোনটা চালান দিয়ে আমি আৱ জটায়ু কেবল ফেলুদার
কথাটাই শুনলুম। সেটা শুনে যা দাঁড়াল তা এই—

‘হালো—মিঃ সেনগুপ্তৰ সঙ্গে একটু কথা বলতে পাৱি কি—অৱল
সেনগুপ্ত?’

‘—’

‘মিঃ সেনগুপ্ত? আমাৰ নাম প্ৰদোষ মিত্র।’

‘—’

‘হাঁ, ঠিকই ধৰেছেন। ইয়ে—আমায় একদিন পাঁচ মিনিট সময় দিতে
পাৱেন?’

‘—’

‘তাই বুঝি? আশৰ্যতো! কী ব্যাপার?’

‘—’

‘তা পাৱি বৈকি। কটায় গেলে আপনাৰ সুবিধে?’

‘—’

‘ঠিক আছে। তাই কথা রইল।’

‘ভাৱতে পাৱিস?’ ফোনটা রেখে বলল ফেলুদা, ‘ভদ্ৰলোক নাকি আৱ পাঁচ
মিনিটেৰ মধ্যেই আমাকে ফোন কৰতেন।’

‘কেন, কেন?’ প্ৰশ্ন কৰলেন জটায়ু।

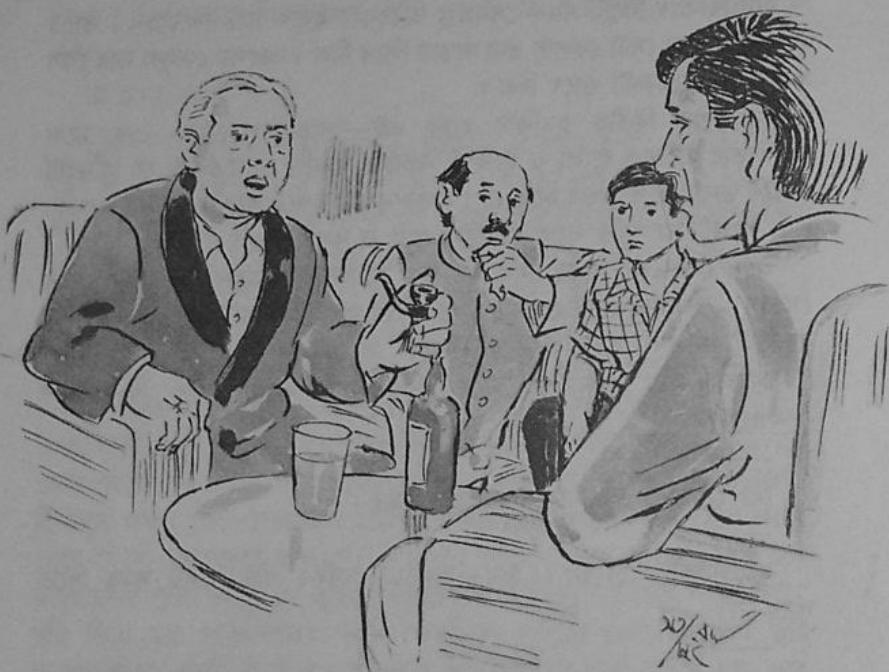
‘সেটা ফোনে বললেন না, সামনা সামনি বলবেন।’

‘কখন অ্যাপয়েন্টমেন্ট?’

‘আধ ঘটা বাদে।’

॥ ৪ ॥

এগাৱো নম্বৰ রোল্যান্ড রোড সাহেবী আমলেৰ দোতলা বাড়ি। দৱজাৰ বেল
টিপতে একজন উৰ্দিপৱা বেয়াৱৰ আবিৰ্ভাৰি হল। সে কাপেটি ঢাকা কাঠে সিড়ি
দিয়ে আমাদেৱ দোতলায় নিয়ে গিয়ে বৈঠকখানায় বসালো। মিনিট দুয়েকেৰ



মধ্যেই মিঃ সেনগুপ্ত প্রবেশ করলেন। বাড়ির সঙ্গে মানানসই সাহেবী মেজাজ ;
পরনে ড্রেসিং গাউন, পায়ে বেডরুম স্লিপার, হাতে চুরুট।

পরিচয় পর্ব শেষ হলে পর ভদ্রলোক জিগোস করলেন, ‘আপনারা ড্রিংক
করেন ?’

‘আজ্ঞে না’, বলল ফেলুদা।

‘আমি যদি বিয়ার খাই আশা করি আপনারা মাইন্ড করবেন না ?’

‘মোটেই না !’

ভদ্রলোক বেয়ারাকে ডেকে নিজের জন্য বিয়ার আর আমাদের তিনজনের
জন্য চায়ের অর্ডার দিয়ে ফেলুদার দিকে দৃষ্টি দিলেন। ফেলুদা বলল, ‘আপনি
আমাকে কেন ফোন করতে যাচ্ছিলেন সেটা আগে বলতে আপনার কোনো
আপত্তি আছে ? তারপর আমি আমার দিকটা বলব।’

‘বেশতো ! জে. পি. চাওলার নাম শুনেছেন ?’

‘ব্যবসাদার ? গুরুপ্রসাদ চাওলা ? যার নামে চাওলা ম্যানসনস ?’

‘হ্যাঁ !’

‘তাঁর এক নাতি তো— ?’

‘হ্যাঁ ! মিসিং। সম্ভবত কিড্ন্যাপড়।’

‘কাগজে দেখছিলাম বটে।’

‘গুরুপ্রসাদ আমার অনেকদিনের বন্ধু। পুলিশ তদন্ত করছে বটে, কিন্তু আমি
ওকে আপনার নাম সাজেস্ট করি। ভুল সেহানবিশের কাছে আপনার খুব সুখ্যাতি
শুনেছি।’

‘হ্যাঁ, একটা ব্যাপারে ওকে আমি হেল্প করি।’

‘তাহলে চাওলাকে কী বলব ?’

‘মিঃ সেনগুপ্ত, দুঃখের বিষয় আমি অলরেডি একটা কেস হাতে নিয়ে
ফেলেছি।’

‘আই সী !’

‘আর সেই ব্যাপারেই আমি আপনার কাছে এসেছি।’

‘কী ব্যাপারে শুনি ?’

‘আমি ডাঃ মুনসীর কাছ থেকে আসছি।’

‘হোয়াট !’

ভদ্রলোক সোফা থেকে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন।—‘মুনসী আপনাকে আমার
পরিচয় দিয়ে দিয়েছে ? তার মানে তো আর কদিনে রাজ্যসুন্দ লোক জেনে যাবে
মুনসীর ডায়ারির “এ” ব্যক্তিটি আসলে কে ?’

‘মিঃ সেনগুপ্ত, আমি অত্যন্ত সাবধানী লোক। গোপন ব্যাপার কী করে গোপন
রাখতে হয় তা আমি জানি। আমার উপর আপনি সম্পূর্ণ ভরসা রাখতে পারেন।
তবে আপনি যদি ঘন ঘন ডাঃ মুনসীকে হৃষ্মকি চিঠি দেন, তার ফল কী হবে সেটা
আমি জানি।’

‘আমি হৃষ্মকি চিঠি দেব না কেন ? আপনি ডায়ারিটা পড়েছেন ?’

‘পড়েছি।’

‘আপনার কী মনে হয়েছে ?’

‘ত্রিশ বছরের পুরানো ঘটনা। এর মধ্যে অস্তত শ’ পাঁচেক ব্যাকে তহবিল
তছরূপ হয়েছে। যারা এ কাজ করেছে হয়ত তাদের অনেকেরই নামের প্রথম
অক্ষর “এ”। সুতরাং আপনার ভয় সম্পূর্ণ অমূলক।’

‘মুনসী কি ব্যাকের নাম করেছে ?’

‘না।’

‘আমার ব্যাকে দুজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিল যারা চুরির ব্যাপারে আমাকে
সন্দেহ করে, কারণ ঠেকায় পড়ে আমি দুজনের কাছে টাকা ধার চেয়েছিলাম।
দুজনেই অবিশ্বি রিফিউজ করে।’

‘মিঃ সেনগুপ্ত, আমি আবার বলছি—আপনার ভয়ের কোনো কারণ নেই।
আর এই ধরনের চিঠি দিয়ে আপনার লাভটা কী হচ্ছে? ডাঃ মুনসী আইনের দিক
দিয়ে সম্পূর্ণ নিরাপদ। অর্থাৎ আপনি কোনো লিগ্যাল স্টেপ নিতে পারছেন না।
তা হলে কি আপনি আইনের বাইরে কোনো রাস্তা ভাবছেন?’

‘আমার বিপদের আশঙ্কা দেখলে আমি আইন-চাইন মানব না। শুঁ মাওর।
আমার অতীতের ইতিহাস থেকেই আপনি বুঝছেন যে প্রয়োজনে বেপরোয়া কাজ
করতে আমি দ্বিধা করি না।’

‘আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, মিঃ সেনগুপ্ত। তখনকার আপান আর এখনকার আপনি কি এক? আজ আপনি সমাজে সম্মানিত ব্যক্তি। এই অবস্থায় আপনি এমন একটা খুঁকি নেবেন?’

মিঃ সেনগুপ্ত মিনিট খানেক কিছু না বলে কেবল চুক্ত করে বিয়ার খেলেন। তারপর তাঁর চাউনির সামান্য পরিবর্তন দেখা গেল। তারপর তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এক চুমুকে বাকি বিয়ারটা শেষ করে গেলাসটা টেবিলে রেখে বললেন, ‘ঠিক আছে—ডাম ইট! লেট হিম গো আহেড়।’

‘আপনি তাহলে হৃষ্কির ব্যাপারে ইতি দিচ্ছেন ?’

ইয়েস ইয়েস ইয়েস !—তবে বিপদের বিনুমাত্র আশকা দেখলেই কিন্তু—
‘আর বলতে হবে না’, বলল ফেলুন্দা, ‘বুঝেছি’

116

ଲାଲମୋହନବାସୁ କଥାମତୋ ପରଦିନ ସକାଳେଇ ପାଞ୍ଚଲିପିଟା ଫେରତ ନିଯେ ଏଲେନ । ଫେଲୁଦା ବଲଲ, ‘ଏଥିନ ଆର ଚା ଖାଓୟା ହବେ ନା । କାରଣ ଆଖ ଘଣ୍ଟାର ମଧ୍ୟେଇ “ଜି”-ର ମସଦେ ଅୟାପରେନ୍ଟମେନ୍ଟ ।’

ନବ୍ୟୁହ ନମ୍ବର ରିପନ ସ୍ଟ୍ରିଟେର ଦରଜାଯ ବେଳ ଟିପତେ ଯାଁର ଆବିର୍ଭବ ହଲ ତାଁର ମାଥାଯ ଟାକ, କାନେର ପାଶେର ଚଲ ସାଦା, ଆର ଏକ ଜୋଡ଼ା ବେଶ ତାଗଡ଼ାଇ ଗୈଫ୍, ତାଓ ସାଦା ।

‘মি: মিটার, আই আম জর্জ ইগিনস’

তিনজনের সঙ্গেই কর্মদলের পর হিগিন্স আমাদের নিয়ে দোতলায় চলল ।
গোট দিয়ে বাড়িতে চুকেই দুটো বেশ বড় খাঁচা দেখেছি, তার একটায় বাঘ,
অন্যটায় দুটো হায়না । দোতলায় উঠে বাঁয়ে একটা ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময়
দেখলাম তাতে গোটা পাঁচেক কোয়ালা ভাল্লুক বসে আছে মেঝেতে ।

বসবার ঘরে পৌঁছে সোফায় বসে হিগিন্স ফেলুদাকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন করল,
‘ইউ আর এ ডিটেকটিভ?’



‘এ প্রাইভেট ওয়ান’, বলল ফেলদা।

বাকি কথাও ইংরিজিতেই হল, যদিও হিগিনস মাঝে মাঝে হিন্দিও বলে ফেলছিলেন, বিশেষ করে কারুর উদ্দেশ্যে গালি দেবার সময়। অনেকের উপরেই ভদ্রলোকের রাগ। যদিও কারণটা বোৰা গেল না। অবশ্যেই বললেন, ‘মানসি তাহলে এখনো প্র্যাকটিস করে? আই মাস্ট সে, সে আমার বিপদের সময় অনেক উপকার করেছিল।’

‘तात्त्वे आर आपनि ताके शासाच्छेन केन ?’ प्रश्न करल फेलुदा

হিগিনস একটুক্ষণ চুপ থেকে বলল, ‘সেটাৱ একটা কাৰণ হচ্ছে সেদিন ৱাতে

নেশার মাত্রাটা একটু বেশি হয়েছিল। তবে মানুষের কি ভয় করে না? আমার বাবা কী ছিলেন জান? স্টেশন মাস্টার। আর আমি নিজের চেষ্টায় আজ কোথায় এসে পৌঁছেছি দেখ। এ আমার একচেটিয়া ব্যবসা। মানসির ডায়রি ছাপা হলে যদি আমাকে কেউ চিনে ফেলে তাহলে আমার আর আমার ব্যবসার কী দশা হবে ভাবতে পার?

ফেলুন্দাকে আবার বোঝাতে হল যে হিগিন্স আইন বাঁচিয়ে কিছুই করতে পারবেন না। তাকে আবার বাঁকা রাস্তায় যেতে হবে। ‘স্টেই কি তুমি চাইছ?’ বেশ জোরের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল ফেলুন্দা। ‘তাতে কি তোমার প্রেসটিজ আরো বেশি বিপন্ন হবে না?’

হিগিন্স কিছুক্ষণ চুপ করে বিড়বিড় করে বললেন, ‘একবার কেন, শতবার খুন করতে পারতাম ও পাজি সুইডিশ্টাকে। বাহাদুর, আমার সাধের লেপার্ড, মাত্র চার বছর বয়স, তাকে কিনা লোকটা মেরে ফেলল!...’

আবার দশ সেকেন্ডের জন্য কথা বন্ধ; তারপর হঠাতে সোফার হাতল চাপড়ে গলা তুলে হিগিন্স বললেন, ‘ঠিক আছে; মানসিকে বলো আমি কোনো পরোয়া করি না। ও যা করছে করকু, বই বেরোলে লোকে আমাকে চিনে ফেললেও আই ডেন্ট কেয়ার। আমার ব্যবসা কেউ টলাতে পারবে না।’

‘থ্যাঙ্ক ইউ, মি. হিগিন্স, থ্যাঙ্ক ইউ।’

অরুণ সেনগুপ্তের খবরটা ফেলুন্দা আগেই ফোনে ডাঃ মুনসীকে জানিয়ে দিয়েছিল। হিগিন্সের খবরটা দিতে আমরা মুনসীর বাড়িতে গেলাম, কারণ পাওলিপিটা ফেরত দেবার একটা ব্যাপার ছিল। ভদ্রলোক ফেলুন্দাকে একটা বড় রকম ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, ‘তাহলে তো আপনার কর্তব্য সারা হয়ে গেল। এবারে আপনার ছুটি।’

‘আপনি ঠিক বলছেন? “আর” সম্বন্ধে কিছু করার নেই তো?’

‘নাথিং।...আপনি আপনার বিল পাঠিয়ে দেবেন, আমি ইমিডিয়েটলি পেমেন্ট করে দেব।’

‘থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার।’

‘এটাকে কি মামলা বলা চলে?’ বাড়ি ফিরে এসে বলল জটায়।

‘মিনি মামলা বলতে পারেন। অথবা মামলাণু।’

‘যা বলেছেন।’

‘আশ্চর্য এই যে এমন গর্হিত কাজ করার পঁচিশ ত্রিশ বছর পরে লোকগুলো শুধু বেঁচে নেই, দিব্য সুখ স্বাচ্ছন্দে চালিয়ে যাচ্ছে।’

‘হক কথা’, বললেন জটায়। ‘কালই বাড়িতে বসে ভাবছিলুম ত্রিশ বছর আগে

যাদের চিনতুম তাদের কারুর সঙ্গে আজও যোগাযোগ আছে কিনা, বা তারা এখন কে কী করছে স্টো জানি কিনা। বিশ্বাস করুন আজই আধ ঘণ্টা ভেবে শুধু একটা নাম মনে পড়ল, অপরেশ চাটুজ্যে, যার সঙ্গে একসঙ্গে বসে বায়ক্ষেপ দেখিচি, ফুটবল খেলা দেখিচি, সাঙ্গভালিতে বসে চা খেইচি।

‘সে এখন কী করে জানেন?’

‘উঁহ। আউট অফ টাচ। কমপ্লাই। করে কীভাবে যে ছাড়াছাড়িটা হল, স্টো অনেক ভেবেও মনে করতে পারলুম না।’

পরদিন সকালে লালমোহনবাবু এসে ফেলুন্দার দিকে চেয়ে বললেন, ‘আপনাকে একটু ডাউন বলে মনে হচ্ছে? বেকারত্ব ভালো লাগছে না বুঝি।’

ফেলুন্দা মাথা নেড়ে বলল, ‘নো স্যার, তা নয়, একটা ব্যাপারে কৌতুহল নিবন্ধিত হল না বলে অসোয়াস্তি লাগছে।’

‘কী ব্যাপার?’

“আর” ব্যক্তিটির আসল পরিচয়। ইনি একটা হ্রম্কি-টুম্কি দিলে মন্দ হত না।

‘রটন, রাবিশ, রিডিকুলাস’, বললেন জটায়। “আর” জাহামমে যাক। আপনি আপনার যা প্রাপ্য তা তো পাচ্ছেনই।

‘তা পাচ্ছি।’

ফোনটা রেজে উঠল। আমিই ধরলাম। ‘হ্যালো’ বলতে ওদিক থেকে কথা এল ‘আমি শক্র বলছি।’ আমি ফোনটা ফেলুন্দার হাতে চালান দিলাম।

‘বলুন স্যার।’

উত্তরটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই ফেলুন্দার কপালে গভীর খীজ পড়ল। তিন-চারটে ‘হ্র’ বলেই ফেলুন্দা ফোনটা রেখে দিয়ে বলল, ‘সাংঘাতিক খবর। ডাঃ মুনসী খুন হয়েছেন, আর সেই সঙ্গে ডায়রিও উধাও।’

‘বলেন কী! চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে বললেন জটায়।

‘ভেবেছিলাম শেষ। আসলে এই সবে শুরু।’

আমরা আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে লালমোহনবাবুর গাড়িতে বেরিয়ে পড়লাম।

সুইনহো স্ট্রীটে পৌঁছে দেখি পুলিশ আগেই হাজির। ইনস্পেক্টর সোম ফেলুন্দার চেনা, বললেন, ‘মাঝ রাস্তারে খুনটা হয়েছে, মাথার পিছন দিকে ভারী কিছু দিয়ে মেরেছে।’

‘কে প্রথম জানল?’

‘ওঁর বেয়ারা। ভদ্রলোক ভোর ছটায় চা খেতেন। সেই সময়ই বেয়ারা

ব্যাপারটা জানতে পারে। ডাঃ মুনসীর ছেলে বাড়ি ছিলেন না। পুলিশে খবর দেন
ডাঃ মুনসীর সেক্রেটারি !

‘আপনাদের জেরা হয়ে গেছে ?’

‘তা হয়েছে ; তবে আপনি নিজের মতো করুন না। আপনি যে আমাদের
কাজে ব্যাঘাত করবেন না সেটা আমি পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে জানি। আর চারটি
তো প্রাণী, ভদ্রলোকের ছেলে, সেক্রেটারি, শ্যালক আৰ পেশেন্ট। অবিশ্য
মিসেস মুনসী আছেন। তাঁকে কিছু জিগেস কৰিনি এখনো।’

আমরা তিনজন শক্রবাবুর সঙ্গে দোতলায় রওনা দিলাম। সিডি ওঠার সময়
ভদ্রলোক একটা দীর্ঘ নিষ্পাস ফেলে বললেন, ‘অনেক কিছুই আশঙ্কা কৰছিলাম,
কিন্তু এটা কৰিনি।’

বাবার ঘরে পৌঁছে ফেলুন বলল, ‘আপনি যখন রয়েছেন তখন আপনাকে
দিয়েই শুরু কৰি।’

‘বেশতো কী জানতে চান বলুন।’

আমরা সকলে বসলাম। চারিদিকে জন্ম জানোয়ারের ছাল, মাথা ইত্যাদি
দেখে মনে হচ্ছিল, এতবড় শিকারী, আৰ এইভাৱে তাঁৰ মৃত্যু হল !

ফেলুন জেরা আৱণ্ড কৰে দিল।

‘আপনার ঘৰ কি দোতলায় ?’

‘হ্যাঁ ! আমারটা উত্তৰ প্রান্তে, বাবারটা দক্ষিণ প্রান্তে।’

‘আপনি আজ সকালে বেরিয়েছিলেন ?’

‘হ্যাঁ।’

‘কোথায় ?’

আমাদের ডাঙুৱের ফোন খারাপ। উনি রোজ ভোৱে লেকেৰ ধাৰে হাঁটেন,
তাই ওঁকে ধৰতে গিয়েছিলাম। কদিন থেকেই মাথাটা ভাৰ-ভাৰ লাগছে। মনে
হচ্ছিল প্ৰেশাৰটা বেড়েছে।

‘প্ৰেশাৰ কি আপনার বাবা দেখে দিতে পাৰতেন না ?’

‘এটা বাবার আৱেকটা পিকিউলাৱিটিৰ উদাহৰণ। উনি বলেই দিয়েছিলেন
আমাদেৱ বাড়িৰ সাধাৱণ ব্যারামেৰ চিকিৎসা উনি কৰবেন না। সেটা কৱেন ডাঃ
প্ৰণব কৰ।’

‘আই সী...একটা কথা আপনাকে বলি শক্রবাবু, আপনি যে বলেছিলেন ডাঃ
মুনসী আপনার সম্বন্ধে উদাসীন, ডায়ারি পড়ে কিন্তু সেৱকম মনে হয় না।
ডায়ারিতে অনেকবাৱ আপনার উল্লেখ আছে।’

‘ভেৱি সারপ্রাইজিং !’

‘আপনার ডায়ারিটা পড়াৰ ইচ্ছে হয় না ?’

‘তাৰ বড় হাতে লেখা ম্যানসক্ৰিপ্ট পড়াৰ ধৈৰ্য আমাৰ নেই।’

‘এটা অবশ্য আশা কৰা যায় যে আপনার বিষয় যেটা সত্যি সেটাই উনি
লিখেছেন।’

‘বাবাৰ দৃষ্টিতে যেটা সত্যি বলে মনে হয়েছে সেটাই উনি লিখেছেন। সে দৃষ্টিৰ
সঙ্গে আৰ পাঁচজনেৰ দৃষ্টি নাও মিলতে পাৱে। আমাৰ বলাৰ ইচ্ছে এই, যে বাবা
আমাকে চিনলেন কী কৰে ? তিনি তো সৰ্বক্ষণ ঝুঁটী নিয়েই পড়ে থাকতেন।’

‘আপনার বাবাৰ মাসিক রোজগার কত ছিল সে সম্বন্ধে আপনার কোনো ধাৱণা
আছে ?’

‘সঠিক নেই, তবে উনি যে ভাবে খৰচ কৰতেন তাতে মনে হয় ত্ৰিশ-পঁয়ত্ৰিশ
হাজাৰ হওয়া কিছুই আশৰ্য নয়।’

‘উনি যে উইল কৰে গিয়েছিলেন সেটা আপনি জানেন ?’

‘না।’

‘গত বছৰ পয়লা ডিসেম্বৰ। ওঁৰ সঞ্চয়েৰ একটা অংশ ব্যবহাৰ হবে
মনোবিজ্ঞানেৰ উন্নতিকল্পে।’

‘আই সী।’

‘আৰ, আপনার প্ৰতি উদাসীন হওয়া সত্বেও আপনিও কিন্তু বাদ পড়েননি।’

শক্রবাবু আবাৰ বললেন, ‘আই সী !’

‘এই খুনেৰ ব্যাপারে আপনি কোনো আলোকপাত কৰতে পাৱেন ?’

‘একেবাৰেই না। এটা সম্পূৰ্ণ অপ্রত্যাশিত।’

‘আৰ ডায়ারিটা যে লোপাট হল ?’

‘সেটা ওই তিনজনেৰ একজন লোক লাগিয়ে কৰাতে পাৱে। বাবাৰ পেশেট
হিসাবে এৱা এ বাড়িতে এসেছে। বাবা যে ঘৰে ঝুঁটী দেখেন, তাৰ পাশেই তো
আপিস ঘৰ। সেখানেই থাকত বাবাৰ লেখাটা।’

‘আপনাদেৱ সদৰ দৱজা রাত্ৰে বন্ধ থাকে নিশ্চয়ই।’

‘হ্যাঁ, তবে বাড়িৰ দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে জমাদার ওঠার জন্য একটা ঘোৱানো
সিডি আছে।’

‘ঠিক আছে। থ্যাক ইউ। আপনি এবাৰ যদি সুখময়বাবুকে একটু পাঠিয়ে
দিতে পাৱেন ?’

মিনিট খানেকেৰ মধ্যেই সেক্রেটারি সুখময় চক্ৰবৰ্তী এসে হাজিৰ হলেন।
ভদ্রলোক আমাদেৱ থেকে একটু দূৰে একটা চেয়াৰে বসতে ফেলুন জেৱা আৱণ্ড
কৰল।

‘আমি প্ৰথমেই জানতে চাই, পাণুলিপিটা যে চুৱি হল, সেটা কি বাইৱে পড়ে

থাকত ?

‘না । দেরাজে ; তবে দেরাজে চাবি থাকত না । তার কারণ আমি বা ডাঃ মুনসী কেউই ভাবতে পারিনি যে সেটা এই ভাবে চুরি হতে পারে ।’

‘এটা যে আর দেরাজে নেই সেটা কখন কীভাবে জানলেন ?’

‘আজ থেকে ওটা টাইপ করা শুরু করব ভেবেছিলাম । সকালে গিয়ে দেরাজ খুলে দেবি সেটা নেই ।’

‘আই সী... আপনি কদিন হল ডাঃ মুনসীর সেক্রেটারির কাজ করছেন ?’

‘দশ বছর ।’

‘কাজটা পেলেন কী করে ?’

‘ডাঃ মুনসী কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন ।’

‘কী ধরনের কাজ করতে হত আপনাকে ?’

‘ওর অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো নেট করে রাখতাম, আর চিঠিগুলোর জবাব টাইপ করতাম ।’

‘চিঠি কি অনেক আসত ?’

‘তা যদি না । বিভিন্ন দেশের মনোবিজ্ঞান সংস্থা, থেকে নিয়মিত চিঠি আসত । বাইরের কনফারেন্সে যোগ দিতে উনি দুবছর অন্তর একবার বিদেশ যেতেন ।’

‘আপনি বিয়ে করেননি ?’

‘না ।’

‘আঞ্চলিক আর কে আছে ?’

ভাইবোন নেই । বাবা মারা গেছেন । আছেন শুধু আমার বিধবা মা আর আমার এক বিধবা খুড়িমা ।’

‘ঁরা এক সঙ্গেই থাকেন ?’

‘হ্যাঁ ।’

‘আপনি ঁরের সঙ্গে থাকেন না ?’

‘আমিতো এ বাড়িতেই থাকি । ডাঃ মুনসী আমাকে একটা ঘর দেন একতলায় । প্রথম থেকেই এখানে আছি । মাঝে মাঝে গিয়ে বাড়ির খবর নিয়ে আসি ।’

‘বাড়ি কোথায় ?’

‘বেলতলা রোড ল্যান্ডডাউনের মোড়ে ।’

‘আপনি এই খুন সম্পর্কে কোনো আলোকপাত করতে পারেন ?’

‘একেবারেই না । ডায়ারি বেহাত হতে পারে হৃষ্মকি চিঠি থেকেই বোৰা যায় ; কিন্তু খুনটা আমার কাছে একেবারে অর্থহীন বলে মনে হচ্ছে ।’

‘ডাঃ মুনসী বস্তি হিসাবে কেমন লোক ছিলেন ?’

‘খুব ভালো । আমাকে তিনি অত্যন্ত মেহ করতেন, আমার কাজে সন্তুষ্ট

ডাঃ মুনসীর ডায়ারি

ছিলেন, এবং ভালো মাইনে দিতেন ।’

‘আপনি কি জানেন ডাঃ মুনসীর বই বেরোলে তাঁর অবর্তমানে বইয়ের স্বত্ত্বাধিকারী হতেন ‘আপনি ?’

‘জানি । ডাঃ মুনসী আমাকে বলেছিলেন ।’

‘বই ছেপে বেরোলে তার কাট্টি কেমন হবে বলে আপনার মনে হয় ?’

‘প্রকাশকদের ধারণা খুব ভালো হবে ।’

‘তার মানে মোটা রয়েলটি, তাই নয় কি ?’

‘আপনি কি ইঙ্গিত করছেন এই রয়েলটির লোভে আমি ডাঃ মুনসীকে খুন করেছি ?’

‘এখানে যে একটা জোরালো মোটিভের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে সেটা কি আপনি অঙ্গীকার করবেন ?’

‘আমার যেখানে টাকার অভাব নেই সেখানে শুধু রয়েলটির লোভে আমি খুন করব, এটা কি খুব বিশ্বাসযোগ্য ?’

‘এর সঠিক উভ্র দিতে যতটা চিন্তার প্রয়োজন, তার সময় এখনো পাইনি । যাই হোক এখন আপনার ছুটি ।’

‘কাউকে পাঠিয়ে দেবো কি ?’

‘আমি ডাঃ মুনসীর শালার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই ।’

সুখময়বাবু চলে যাবার পর জটায় বললেন, ‘আপনার কি মনে হচ্ছে বলুন তো, ডায়ারি লোপট আর খুনটা সেপারেট ইস্যু, না পরম্পরের সঙ্গে জড়িত ?’

‘আগে গাছে কঁঠাল দেখি, তারপর তো গোঁফে তেল দেব ।’

‘বোৰো !’

॥ ৬ ॥

শালা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এসে হাজির হলেন । কপালের ঘাম মুছতে দেখে মনে হল ভদ্রলোক একটু নার্ভস বোধ করছেন ।

‘আপনার নামতো চন্দ্রনাথ ; পদবী কী ?’ ভদ্রলোক বসার পর ফেলুন্দা প্রশ্ন করল ।

‘বোস ।’

‘আপনি এখানে রয়েছেন পনেরো বছর, তাই তো ?’

‘হ্যাঁ, কিন্তু আপনি কী করে... ?’

‘আমি ডাঃ মুনসীর ডায়ারিটা পড়েছি । আপনার বিষয় অনেক কিছু জানি, তবু আপনার মুখ থেকে কলফার্মেশনের জন্য কতকগুলো প্রশ্ন করছি ।’

চন্দ্রনাথ বোস আবার ঘাম মুছলেন।
 ‘ডাঃ মুনসী আপনাকে এ বাড়িতে থাকতে বলেন?’
 ‘না। আমার বোন ডাঃ মুনসীকে অনুরোধ করেন।’
 ‘উনি এক কথায় রাজি হয়ে যান?’
 ‘না।’
 ‘তাহলে?’
 ‘আমার বোন...পীড়াগীড়ি করলে পর...রাজি হন।’
 ‘আপনিতোকোনোচাকরি-টাকরি করেন না।’
 ‘না।’
 ‘হাত খরচা পান মাসে মাসে?’
 ‘হ্যাঁ।’
 ‘কত?’
 ‘পাঁচশো।’
 ‘তাতে চলে যায়?’
 চন্দ্রনাথবাবু উত্তর না দিয়ে মাথা হেঁট করলেন। বুবলাম হাতখরচটা যথেষ্ট
 নয়।
 ‘আপনিতো ইন্টারমিডিয়েট অবধি পড়েছেন?’
 ‘হ্যাঁ।’
 ‘ছাত্র হিসেবে কীরকম ছিলেন?’
 ‘সাধারণ।’
 ‘নাকি তার চেয়েও নিচে?’
 চন্দ্রনাথবাবু চুপ।
 ‘প্রথমবার আই. এ-তে ফেল করেননি? সেই কারণেই তো আপনার কোনো
 চাকরি জোটেনি, তাই নয় কি?’
 দৃষ্টি নত করে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন চন্দ্রনাথবাবু।
 ‘এ বাড়িরকোনো কাজ আপনি করেন কি?’
 ‘হ্যাঁ।’
 ‘কী।’
 ‘বাজার করি। ওষুধপত্র আনি...’
 ‘বুঝেছি।...আপনার শোবার ঘর দোতালায়?’
 ‘হ্যাঁ।’
 ‘কোনখানে? ডাঃ মুনসীর ঘর থেকে কতদূরে?’
 ‘পাশে।’

‘একেবারে পাশে? লাগালাগি?’
 ‘ই-ইয়েস।’
 ‘রাত্রে ঘুমোন কখন?’
 ‘দশটা সাড়ে দশটা।’
 ‘আর ওঠেন?’
 ‘ছ-টা।’
 ‘এই খুন সম্বন্ধে আপনার কিছু বলার আছে।’
 ‘নো-নো স্যার। নথিং।’
 ‘ঠিক আছে। আপনি এবার অনুগ্রহ করে রাধাকান্ত মল্লিককে একটু পাঠিয়ে
 দিন।’
 রাধাকান্ত মল্লিক এসে সোফায় বসেই এক সঙ্গে হাত আর মাথা নেড়ে
 বললেন, ‘আমি খুন সম্বন্ধে কিছু জানি না, কিছু না...’
 ‘আমি কি বলেছি আপনি জানেন?’
 ‘বলেননি, কিন্তু বলবেন। আই নো ইউ ডিটেকটিভস। এসব জেরা-টেরা
 আমার ভালো লাগে না। যা বলার আমি বলে যাচ্ছি। আপনি শুনুন। আমি যে
 ব্যারাম নিয়ে এখানে আসি তার নাম আমি জানতাম না। মুনসী বলেন।
 পাসিকিউশন ম্যানিয়া। তার লক্ষণ হল, চারপাশের সব লোককে হঠাতে শত্রু বলে
 মনে হওয়া। বাবা, দাদা, পড়শী, আপিসের কোলীগ কেউ বাদ নেই। সবাই যেন
 ওৎ পেতে বসে আছে। সুযোগ পেলেই বাঁপিয়ে পড়বে। আগে এটা ছিল না;
 ঠিক কখন যে শুরু হল তাও বলতে পারি না। শুধু এটা বলতে পারি যে শেষ
 দিকে এমন হয়েছিল যে রাত্তিরে ঘুমোতে পারতাম না, পাছে ঘুমোলে কেউ এসে
 বুকে ছুরি মারে।’
 ‘ডাঃ মুনসীর ওষুধে কাজ দেয়?’
 ‘দিচ্ছিল, তবে সময় লাগছিল। কথা ছিল আর দু’হাত্তা পরে ছুটি পাব। কিন্তু
 তার আগেই...ছুটি হয়ে গেল...’
 ‘আপনি কি এখন বাড়ি ফিরে যাবেন?’
 ‘পুলিশ যেতে দিলেই যাব।’
 ‘আপনার চাকরিতো একটা আছে নিশ্চয়ই।’
 ‘পপুলার ইনশিওরেন্স।’
 ‘ঠিক আছে। আপনি এবার আসতে পারেন।’
 রাধাকান্ত মল্লিক চলে যাবার পর ফেলুদা একবার খুনের জায়গা আর লাশটা
 দেখে এল। যে জিনিসটা দিয়ে বাড়ি মেরে খুন করা হয়েছে সেটা এখনো খুঁজে
 পাওয়া যায়নি। ইতিমধ্যে পুলিশের ডাক্তার এসে দেখে বলে গেছে খুনটা হয়েছে



ভোর চারটা থেকে পাঁচটার মধ্যে। পাঞ্জলিপিটা এখনো পাওয়া যায়নি।
ইন্স্পেক্টর সোম বলেছেন সেটা বেরোলেই ফেলুদাকে জানিয়ে দেবেন।

‘মিসেস মুনসীর সঙ্গে কি এখন কথা বলা যাবে?’ ফেলুদা জিগ্যেস করল
সোমকে।

‘তা যাবে। উনি দেখলাম মোটামুটি শক্তই আছেন।’

আমরা তিনজন মিসেস মুনসীর ঘরে গেলাম। ভদ্রমহিলা জানালার দিকে মুখ
করে খাটে বসে আছেন। ফেলুদা দরজায় টোকা মারতে আমাদের দিকে
ফিরলেন।

আমি চমকে উঠলাম। ইনি হবহ এঁর ভাইয়ের মতো দেখতে! যমজ নাকি?

নমস্কারের পর ফেলুদা বলল, ‘আমার নাম প্রদোষ মিত্র। আমি একজন
প্রাইভেট ডিটেকটিভ। আপনার স্বামীর মৃত্যুর ব্যাপারে তদন্ত করতে এসেছি।’

‘আপনি কিছু জিগ্যেস করবেন কি?’

দেখে অবাক হলাম যে ভদ্রমহিলার কথায় বিন্দুমাত্র কামার রেশ নেই।
ফেলুদা বলল, ‘সামান্য দু-একটা প্রশ্ন।’

ভদ্রমহিলা আবার জানালার দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, ‘করুন।’

‘এই হত্যা সম্বন্ধে আপনার কিছু বলার আছে কি?’

‘ওর ডায়রিই হল ওর কাল। আমি ওকে কতবার বলেছি, তুমি লিখছ লেখ,
কিন্তু এ জিনিস ছাপিও না। আমাদের দেশের লোকেরা এত সত্ত্ব কথা গ্রহণ
করতে পারবে না। অনেকে ব্যাথা পাবে, অনেকে অসন্তুষ্ট হবে, আর আজ...’

‘আমি কিন্তু ডায়রিটা পড়েছি। আমার মনে হয় না এটা পড়লে মনে কেউ
ব্যথা পেতো।’

‘শুনে খুশি হলাম।’

‘আপনি আর চন্দ্রনাথবাবু যমজ ভাইবোন?’

‘হ্যাঁ।’

‘আপনি যখন ডাঃ মুনসীকে প্রস্তাব করেন আপনার ভাইকে এ বাড়িতে এনে
রাখা হোক, তখন উনি কী বলেন?’

‘অনিষ্ট সঙ্গেও মত দেন।’

‘অনিষ্ট কেন?’

‘আমার ভাই কোনো চাকরি করে না সেটা উনি মেনে নিতে পারছিলেন না।
উনি নিজে ছিলেন কাজ-পাগলা মানুষ। কাজ ছাড়া আর কিছুই জানতেন না।’

‘অনেক ধন্যবাদ, মিসেস মুনসী। আমার আর কিছু জানার নেই।’

বাড়ি ফিরতে ফিরতে বারোটা হয়ে গেল। লালমোহনবাবু সকালে স্নান সেরে
বেরোন, কাজেই সে সমস্যাটা নেই। তাঁকে বললাম দুপুরের খাওয়াটা আজ
এখানেই সারতে। ভদ্রলোক রাজি হয়ে গেলেন।

‘মহীয়সী মহিলা!’ পাখাটা খুলে ফুল স্পীড করে তাঁর প্রিয় কাউচটায় বসে
বললেন লালমোহনবাবু, ‘এত বড় একটা ট্র্যাঙ্গিডিতে এতটুকু টস্কাননি! অথচ
ভাইটা একেবারে গোবর গণেশে।’

‘সেই জন্যেই মহিলার ভাইয়ের উপর এত টান’, বলল ফেলুদা, ‘এ বড় জটিল
মনোভাব, লালমোহনবাবু। মেহ, অনুকম্পা, এসবতো আছেই; তার মধ্যে কোথায়
যেন একটা মাত্তের রেশ রয়েছে। ভদ্রমহিলার নিজের কোনো ছেলেপিলে নেই,
এবং ডাঃ মুনসীর প্রথম পক্ষের স্ত্রীর ছেলের প্রতিও টান নেই, এসব কথা ভুলবেন

না !

‘তার উপরে যমজ !’

‘তা তো বটেই !’

‘আপনার কি মনে হয় ভদ্রমহিলার ডাঃ মুনসীর সঙ্গে বনিবনা ছিল না ?’

‘সেটা মুনসী পরিবারের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা না থাকলে বলা মুশকিল ।
গোয়েন্দাকে যা বোঝার বুঝতে হয় দুটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে, কান আর চোখ ।’

‘এক্ষেত্রে কান কী বলছে ?’

‘মনে একটা খট্কা জাগাচ্ছে ।’

‘কী সেটা ?’

‘সেটা আপনারা কেন বোবেননি তা জানি না ।’

এবাবে আমি একটা কথা না বলে পারলাম না ।

‘তুমি বলতে চাও ওর কথা শুনে মনে হল উনি ডায়রিটা পড়েছেন ?’

‘সাবাস, তোপসে, সাবাস !’

‘কেন মশাই, ডায়রিতে কী ধরনের জিনিস আছে সেটা তো মুনসী মুখেও
বলতে পারেন ।’

‘একই হল, লালমোহনবাবু একই হল ।’

মুনসীর কথায় মনে হয়েছিল ওই তিনি ব্যক্তির ঘটনা ছাড়া ডায়রিতে কী আছে
তা কেউ জানে না । এখন মনে হচ্ছে কথাটা হয়ত ঠিক না ।’

‘তবে এটা তো বোঝাই যাচ্ছে ডাঃ মুনসীর স্ত্রীর প্রতি মোটেই বিরূপভাব পোষণ
করতেন না । ডায়রিতে প্রথম পাতা খুললেই সেটা প্রমাণ হয় । যে স্ত্রীর সঙ্গে
বনিবনা নেই, তাকে কেউ বই উৎসর্গ করে না ।’

‘আপনি দেখছি ফর্মে আছেন । ভেরি গুড় ।’

‘আরেকটা ব্যাপারে আমি কানকে কাজে লাগিয়েছি মশাই ; আপনি নিশ্চয়ই
অ্যাপ্রিশিয়েট করবেন । ডাঃ মুনসীর নিজের ছেলের প্রতি যে মনোভাব
দেখিয়েছেন তাতে তাকে শুক্রং কাঠং বলে মনে হওয়া আশ্চর্য নয় । কিন্তু
সেইখেনে দেখুন, তাঁর সেক্রেটারির প্রতি তাঁর কত দরদ !’

‘গুড় ! গুড় !’ ফেলুন্দা যে অন্যমনস্ক ভাবে তারিফটা করে সোফা ছেড়ে উঠে
পায়চারি আরস্ত করে দিল ।

‘কী ভাবছেন মশাই ?’ প্রায় এক মিনিট চুপ থেকে প্রশ্ন করলেন জটায়ু ।

ভাবছি যে তিনি উহু নামের মধ্যে একজনই রয়ে গেল যার আসল পরিচয়টা
পাওয়া গেল না । ফলে মাঝলাটার মধ্যে একটা ফাঁক রয়ে গেল যেটা আর পূরণ
হবে না ।’

‘আপনার কি মনে হয় ডাঃ মুনসী কোনো তথ্য—’

ক্রিং-ং-ং !

আমাদের এই নতুন নীল টেলিফোনটার আওয়াজ আগেরটার চেয়ে অনেক
বেশি জোর । ফেলুন্দা রিসিভারটা তুলে ‘হ্যালো’ বলল ।

অবিশ্বাস্য টেলিফোন । যাকে ফেলুন্দা টেলিপ্যাথি বলে এ হল যোল আনা
তাই । কার সঙ্গে কী কথাবার্তা হল সেটা ফেলুন্দা ফোন নামিয়ে রেখেই বর্ণাইল ;
আমি যখন ঘটনাটা লিখতে যাব, তখন ও বলল, ‘যদিও তুই ফোনটার সময় শুধু
আমার কথাগুলোই শুনেছিল, লেখার সময় এমন ভাবে লেখ যেন দুই তরফের
কথাই শুনতে পাচ্ছিস । তাহলে পাঠক মজা পাবে ।’

আমি ওর কথামতোই লিখছি ।

‘হ্যালো ।’

‘মিঃ মিস্ট্রি ?’

‘হ্যাঁ ।’

‘আমি “আর” কথা বলছি ।’

““আর” ?

‘মুনসীর ডায়রির “আর” ।’

‘ও । তা হঠাৎ আমাকে ফোন কেন ? মুনসীর সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা
আপনি জানলেন কী করে ?’

‘আপনি আজ সকালে মুনসীর বাড়ি যাননি ?’

‘তা তো যাবই । মুনসী আজ ভোর রাত্রে খুন হয়েছেন । সেই কারণেই যেতে
হয়েছিল ।’

‘আপনার চেহারা অনেকের কাছেই পরিচিত । সেটা আপনি জানেন বোধহয় ।
মুনসীর বাড়ির সামনে ভিড় এবং পুলিশ দেখে প্রতিবেশীদের অনেকেই বারান্দায়
এসে দাঁড়িয়েছিল । তাদেরই একজন আপনাকে চিনে ফেলে আমার এক
পেশেন্ট । আমিও ডাঙ্কার সেটা জানেন কি ? এই পেশেন্টের বাড়ি গেস্লাম
ঘণ্টাখানেক আগে । তারই কাছে শুনি মুনসীর মৃত্যু ও আপনার উপস্থিতির খবর ।
দুইয়ে দুইয়ে চার করে বুঝি মুনসী আপনাকে এমপ্লায় করেছিল ।’

‘আপনার আসল নামটা জানতে পারি কি ?’

‘না, পারেন না । ওটা উহাই থাকবে । আমি জানতে চাই মুনসী আপনাকে
আমার সম্বন্ধে কী বলে ।’

‘উনি বলেন, আপনাকে উনি যথেষ্ট চেনেন এবং আপনাকে নিয়ে চিন্তা করার
কোনো কারণ নেই । ডায়রিটা বেরুচ্ছে এবং তাতে আপনার অতীতের ঘটনা
থাকছে জেনেও নাকি আপনি কোনো আপত্তি করেননি ?’

‘ননসেঙ ! সম্পূর্ণ মিথ্যা । ও আমাকে জানাবে কী করে ? আমি তো পনেরো দিন

বাইরে থেকে কলকাতায় ফিরেছি সবে পরশু রাব্রে। বাড়িতে এসে পুরানো স্টেটসম্যান ঘাঁটতে ঘাঁটতে মুনসীর ডায়ারি পেঙ্গুইন ছাপছে এ খবরটা দেখি। স্টেটসম্যান ঘাঁটতে ঘাঁটতে মুনসীর ডায়ারি পেঙ্গুইন ছাপছে এ খবরটা দেখি। অনেক খবরটা পড়ে আমার অস্বস্তি লাগে। মুনসী সাইকায়াট্রিস্ট হওয়াতে অনেক মনোবিকারগত ব্যক্তির খবর সে জানে; আমারতো বটেই। সে সব কথা কি সে ডায়ারিতে লিখেছে?

‘আমি মুনসীকে ফোন কৰি। সে স্বীকার করে যে আমার ঘটনা তার ডায়ারিতে স্থান পেয়েছে, তবে আমার নাকি চিন্তার কোনো কারণ নেই এই জন্যে যে আমার নামের শুধু প্রথম অক্ষরটা ব্যবহার করা হয়েছে। ...কিন্তু তাতে আমি আশ্বস্ত হব কেন? আমি চৰিষ বছৰ আগেও ডাঙ্গোর ছিলাম, এখনও আছি। তখনকার অনেক পেশেট এখনও আমার পেশেট। ডায়ারি থেকে তারা আমায় চিনে ফেলবে না তার কী গ্যারাণ্টি?’

‘আমি কিন্তু ডায়ারিটা পড়েছি। আমার মনে হয় আপনার চিন্তার কোনো কারণ নেই।’

‘আপনি যখন পড়েছেন তখন আমিও পড়ব। সে কথাটা আমি মুনসীকে বলি। আমি বলি যে তোমার কথা আমি বিশ্বাস কৰি না। আমি নিজে তোমার লেখা পড়ে বিচার কৰব সেটা ছাপলে আমার কোনো ক্ষতি হবে কিনা। তুমি আমাকে লেখাটা দাও। যদি না দাও তাহলে তোমার অতীতের ঘটনা আমি ফাঁস কৰে দেব।’

‘এ আবার কী বলছেন আপনি?’

‘মিস্টার মিস্টির, আমি আর মুনসী একই বছৰ লগুনে যাই ডাঙ্গোর পড়তে। আমার বিষয় যদিও মনোবিজ্ঞান ছিল না, কিন্তু আমাদের দুজনের যথেষ্ট পরিচয় ছিল। আমি মুনসীর যে চেহারা দেখেছি সে চেহারা কলকাতার কেউ দেখেনি। সে সেখানে উচ্চমে যেতে চলেছিল, আমি তাকে সামলাই, তাকে সোজা পথে নিয়ে আসি। কলকাতায় ফিরে এসে প্র্যাকটিস শুরু কৰার পৰ সে ক্রমে ক্রমে নিজেকে সংস্কাৰ কৰে।’

‘আপনি মুনসীর বাড়ি গিয়ে তাঁৰ কাছ থেকে লেখাটা চেয়ে আনেন?’

‘আজ্জে হাঁ। গতকাল রাত এগারোটায়। বলেছিলাম দুদিন পৰে লেখাটা ফেরত দেব। এখন অবিশ্বাস তার কোনো প্ৰয়োজন নেই।’

‘নেই মানে? আপনি পাণ্ডুলিপি ফেরত দিলেই সেটা ছাপা হবে। লেখকের মৃত্যুৰ পৰ তার বই ছাপা হয়েছে অনেক ক্ষেত্ৰে। একে ইংৰিজিতে পসথুমাস পাৰলিকেশন বলে সেটা আপনি জানেন না?’

‘জানি। কিন্তু এক্ষেত্ৰে সেটা হবে না। লেখাটা আমি পড়েছি। সেটা আমার কাছেই থাকবে। বই হয়ে বেৱোবে না। আসি।’

ফেলুদা রিসিভারটা নামিয়ে রেখে দিল, তাৰ মুখ গাঢ়ীৰ।

‘লোকটা এমন কৰে আমাৰ উপৰ টেকা দিল! খপ কৰে সোফায় বসে বলল ফেলুদা। ‘এ সহ্য কৰা যায় না, সহ্য কৰা যায় না! ...আৱ এমন একটা চমৎকাৰ লেখা—এইভাৱে বেহাত হয়ে গেল।’

‘লেখাটা নিয়ে ভাৰবেন না, ফেলুবাবু।’ একটু যেন রাগত ভাৱেই বললেন জটায়ু। ‘দ্য খুন ইজ মাচ মোৰ ইমপট্যাণ্ট দ্যান দ্য লেখা।’

‘আপনি লেখাটা পড়েও একথা বলছেন?’

‘বলছি। যেখানে মাৰ্ডাৰ হ্যাজ বিন কমিটেড, সেখানে আৱ ওসব কিছু তাৰ কাছে তুচ্ছ।’

শ্ৰীনাথ এসে খবৰ দিল ভাত বাড়া হয়েছে। আমৰা তিনজনে খাবাৰ ঘৰে খেতে বসলাই। লালমোহনবাবু যদিও বেশ তঃপুৰ সঙ্গে খেলেন। এমন কি চিংড়ি মাছের মালাই কাৰিটা খেতে খেতে বললেন, ‘আপনাদেৱ জগজ্ঞাথেৱ রাজাৱ তাৱেৱ তুলনা নেই;’ ফেলুদা শুক্তো থেকে দই পৰ্যন্ত একবাৰও মুখ খুলল না।

খাবাৰ পৰ তিনজনে তিনটে পান মুখে পুৱে বসবাৰ ঘৰে বসতেই ফোনটা বেজে উঠল। আমিই ধৰলাম। ইন্স্পেক্টৰ সোম। আমি ফেলুদাৰ হাতে ফোনটা চালান দিলাম। ‘বলুন স্যার’-এৰ পৰ ফেলুদা কেবল দুটো কথা বলল। প্ৰথমে মিনিট খানেক কথা শুনে বলল, ‘তাহলে তো খুনটা বাড়িৰ লোকে কৰেছে বলেই মনে হচ্ছে’ আৱ ফোনটা রাখবাৰ আগে বলল—‘ভেৱি ইন্টাৱেস্টিং আমি আসছি।’

‘কোথায় যাচ্ছ?’ আমি জিগোস কৰলাম।

‘মুনসী প্যালেস’, টেবিল থেকে চার মিনারে প্যাকেট আৱ লাইটারটা তুলে পকেটে পুৱে বলল ফেলুদা।

‘খুনটা বাড়িৰ লোকে কৰেছে কেন বললেন?’ জটায়ুৰ প্ৰশ্ন।

‘কাৰণ নিস্তাৱণী কি আবিক্ষাৰ কৰেছে যে একটা হামানদিষ্টা মিসিং। এ পাৰফেন্ট মাৰ্ডাৰ ওয়েপন।’

‘আৱ ইন্টাৱেস্টিংটা কী?’

‘মুনসীৰ একটা ডায়ারি পাওয়া গেছে যাতে এ বছৰেৰ প্ৰথম দিন থেকে মাৰা যাবাৰ আগোৱা দিন পৰ্যন্ত এনট্ৰি আছে।...চলুন বেৱিয়ে পড়ি।’

পেঙ্গুইন যে ডায়ারিটা ছাপছিল সেটা ১৯৮৯ ডিসেম্বৰে শেষ হয়েছে। পুলিশ যেটা পাণ্ডুলিপি খুঁজতে খুঁজতে মুনসীৰ শোবাৰ ঘৰে পেয়েছে, সেটাতে দৈনিক

এন্ট্ৰি আছে ১৯৯০ পয়লা জানুয়াৰি থেকে মুনসী মাৰা যবাৰ আগেৰ রাত, অৰ্থাৎ ১৩ই সেপ্টেম্বৰ পৰ্যন্ত। ডায়ারিটা সম্ভবত খাটোৱ পাশেৱ টেবিলে রাখা ছিল। সেখান থেকে মাটিতে পড়ে যায়। পুলিশ সেটাকে মাটিতেই পায়।

ডায়ারিটা সোমেৰ কাছ থেকে নিয়ে প্ৰথম পাতা খুলেই ফেলুদাৰ চোখ কিসে আটকে গেল। কিছুক্ষণ দৃঢ়ুটি কৰে পাতাটিৰ দিকে চেয়ে থেকে আবাৰ যেন সম্ভিত ফিরে পেয়ে পাশে দাঁড়ানো শক্রবাবুকে জিগ্যেস কৰল। ‘আপনি জানতেন যে আপনাৰ বাবা ডায়াৰি রাখাৰ অভ্যেসটা শেষদিন পৰ্যন্ত চালিয়ে গেছেন?’

‘একেবাৰেই না। তবে শুনে যে অবাক হচ্ছি তা নয়, কাৰণ চলিশ বছৰ একটানা লিখে হঠাত বন্ধ কৰাৰ তো কোনো কাৰণ নেই।’

‘সুখময়বাবু জানতেন এই ডায়াৰিৰ কথা?’

‘সেটা ওকেই জিজ্ঞেস কৰন।’

আমৰা সকলে বসবাৰ ঘৰে জমায়েত হয়ে ছিলাম। মিনিট খানেকেৰ মধ্যেই সুখময় চৰ্কুবৰ্তী এলেন। ফেলুদা প্ৰশ্ন কৰাতে সুখময়বাবু বললেন, ‘ডাঃ মুনসী ডায়াৰি লিখিবেন এতে আশ্চৰ্যেৰ কিছু নেই, কিন্তু উনি কাজটা কৰতেন দিনেৰ শেষে শুতে যাবাৰ আগে। ডায়াৰিও শোবাৰ ঘৰেই থাকত নিশ্চয়ই, এই লাল বই আমি কোনোদিনই দেখিনি।’

‘বসুন।’

সুখময়বাবু দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন, ফেলুদা বলতে যেন একটু অবাক হয়েই বসলেন। আমি বুঝলাম ফেলুদা আৱো কিছু জিগ্যেস কৰতে চায়।

‘সুখময়বাবু’, বলল ফেলুদা, ‘আপনি নিশ্চয়ই চান যে ডাঃ মুনসীৰ আততায়ীৰ উপযুক্ত শাস্তি হোক। তাই নয় কি?’

‘আমাৰ দায়িত্ব’, বলে চলল ফেলুদা, ‘হল সেই আততায়ীকে খুঁজে বাৰ কৰা। একটা কাৰণে এখন আমৰা বুঝতে পাৰছি যে আততায়ী এই বাড়িতেই রয়েছেন। সেদিন আমি এই বাড়িতে যাঁৰা থাকেন তাদেৱ প্ৰত্যোককে জেৱা কৰেছি। তাৰ ফলে আমি এখনো কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পাৰিনি। হয়ত আমাৰ তৰফ থেকেই যথেষ্ট প্ৰশ্ন কৰা হয়নি, এবং যাদেৱ প্ৰশ্ন কৰেছি তাৰা আমাৰ সব প্ৰশ্নেৰ জবাৰ দেননি। একটা প্ৰশ্ন আমি সেদিন কৰিনি, আজ কৰতে চাই।’

‘বলুন।’

‘একটা ব্যাপারে আমাদেৱ মনে খটকা জেগেছে।’

‘কী?’

‘শক্রবাবুৰ মতে ডাঃ মুনসী তাৰ লেখা এবং প্ৰেশেন্ট ছাড়া আৱ সবকিছু সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন। কিন্তু আপনিতো তাৰ প্ৰেশেন্টও নন, তাহলে আপনাৰ

ডাঃ মুনসীৰ ডায়াৰি

প্ৰতি তিনি এটা মেহৰবৰ্ণ কৰবেন কেন? ডায়াৰিতে পড়েছি পাঁচ বছৰ আগে আপনাৰ অ্যাপেন্ডিসাইটিস অপাৰেশন হয়; তাৰ সমষ্টি খৰচ মুনসী বহন কৰেন। অপাৰেশনেৰ পৰি আপনি দশ দিনেৰ জন্য পুৱী যান; সে খৰচও তিনি বহন কৰেন। কেন? এৰ কোনো কাৰণ আপনি দেখাতে পাৰেন? এই পক্ষপাতিতৰ কিসেৰ জন্য?’

‘জানি না।’

উত্তৰটা আসতে যে যৎসামান্য দেৱি হল সেটা নিশ্চয়ই ফেলুদা লক্ষ কৰেছে। সেটা তাৰ পৰেৰ কথা থেকেই বুঝতে পাৰলাম।

‘আমি আবাৰ বলছি সুখময়বাবু, আপনি সত্যি কথা বললে, বা গোপন না কৰলে, আমাদেৱ কাজ অনেকটা সহজ হয়ে যায়।’

এবাৰে উত্তৰে দেৱি হল না।

‘আমি সত্যি বলছি।’

লালমোহনবাবু আমাদেৱ নামিয়ে দিয়ে ‘তুমৰো মৰ্নিং’ বলে গড়পাৰ ফিরে গৈলেন। ফেলুদা সোজা তাৰ শোবাৰ ঘৰে চুকে দৱজাটা ভোজিয়ে দিল। বুঝলাম সে ডায়াৰিতে মনোনিবেশ কৰবে। ঘড়িতে এখন তিনটৈ পঁচিশ।

পাখাটা ফুল স্পীড কৰে দিয়ে সোফায় গা ছড়িয়ে শুয়ে আমি একটা ন্যাশনাল জিওগ্ৰাফিক ম্যাগাজিন খুলে অ্যানটকৰ্টিকাৰ বিষয় চমৎকাৰ সব ছবি সমেত একটা লেখা পড়তে লাগলাম।

সাড়ে চারটায় শ্রীনাথ চা আনল। আমাৰটা টেবিলেৰ উপৰ রেখে ফেলুদাৰ ঘৰেৰ দৱজায় টোকা দেৱাৰ সঙ্গে সঙ্গেই ফেলুদা বেৱিয়ে এসে বলল, ‘এ ঘৰেই চা দাও।’

বুঝতেই পাৰছি ডায়াৰিটা পড়া হয়ে গেছে, তাই জিগ্যেস কৰলাম, ‘কিছু পেলো?’

ফেলুদা কাউচে বসে পকেট থেকে ডায়াৰি আৱ চারমিনাৰেৰ প্যাকেটটা বার কৰে টেবিলেৰ উপৰ রেখে গৱম চায়ে একটা ছেট চুমুক দিয়ে বলল, ‘তোকে কয়েকটা আইটেম পড়ে শোনাছি। আমাৰ মনে হয় চিন্তাৰ খোৱাক পাৰিব।’

আমি আগেই লক্ষ কৰেছিলাম। ডায়াৰিৰ মাথাৰ দিকটা দিয়ে কয়েকটা ছেঁড়া কাগজ উঁকি মাৰছে। ফেলুদা কোনোৱকম তাড়াহড়ো না কৰে একটা চারমিনাৰ ধাৰিয়ে প্ৰথম টুকৱো মাৰ্কে ডায়াৰিটা খুলল।

‘শোন, এটা তিনি সপ্তাহ আগেৰ এন্ট্ৰি। আমি ইংৰিজি থেকে বাংলা কৰছি। ‘আজ একটি নতুন প্ৰেশেন্ট। রাধানাথ মল্লিক। আমাৰ ঘৰে চুকে চেয়াৱে বসে প্ৰথমেই পকেট থেকে এক টুকৱো কাগজ বার কৰে হাতেৰ তেলোয় রেখে সেটাৰ দিকে আৱ আমাৰ দিকে বারকয়েক দেখে কাগজটা দলা পাকিয়ে ওয়েস্ট পেপাৰ

বাক্সেটে ফেলে দিল। ওটা কী ফেললেন জিগোস করাতে ভদ্রলোক বললেন, টেলিগ্রাফের খবর আপনার ছবি সমেত। আমি বললাম, আপনি কি যাচাই করে নিলেন ঠিক লোকের কাছে এসেছেন কিনা? এবাবে একটা ছেটখাট বিষ্ফোরণ হল। “আমি কাউকে বিশ্বাস করি না, কাউকে না! যাচাই করে নিতে হবে বৈকি!”
...পাসিকিউশন মেনিয়া।’

চার পাতা পরে দ্বিতীয় এন্ট্রি।

‘শোন—আর, এম-কে, নিয়ে সমস্যা। সে নিজের বাড়িতে একদণ্ড টিকতে পারে না। তার দাদা, তার পড়ালী সকলেই তার মনে আতঙ্কের সংক্ষার করছে। ডিফিকাল্ট কেস। আমি বলেছি কাল থেকে যেন সে আমার এখানে চলে আসে। দুটো ঘর তো খালি পড়ে আছে দোতলায়; তার একটাতেই থাকবে।’

দ্বিতীয় এন্ট্রি, এটাও দিন চারেক পরে।

‘আর, এম-কে নিয়ে সমস্যা মিটছে না। আজ ওকে কাউচে শোয়ানোর আগে ও আমার আপিসে এসে বসেছিল। আমি তখন বিলেত থেকে সদ্য আসা একটা জরুরী চিঠি পড়ছি। পড়া শেষ করে ওর দিকে চেয়ে একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখলাম। আমার ভারী কাঁচের পেপার ওয়েটটা হাতে নিয়ে ও কেমন যেন অস্তুত ভাবে আমার দিকে চেয়ে আছে। ও যদি আমাকেও ওর শত্রুপক্ষ মনে করে তাহলেতো মুশকিল।’

চার নম্বর এন্ট্রি।

‘আমার ওষুধের শিশিটা ভুল করে আপিস ঘরে ফেলে এসেছিলাম; রাতে শোবার আগে সেটা আনতে গিয়ে প্যাসেজ থেকেই বুঝলাম ঘরে বাতি জ্বলছে। ভেবেছিলাম হয়ত সুখময় কোনো কাজ করছে, কিন্তু গিয়ে দেখি শক্র। সে আমার দিকে পিঠ করে খুঁকে পড়ে টেবিলের নীচের দেরাজটা বন্ধ করছে। আমায় দেখে ভারী অপ্রস্তুত হয়ে বলল ওর এয়ার মেল খাম ফুরিয়ে গেছে তাই এখানে আছে কিনা দেখতে এসেছিল। আমি ওকে দুটো খাম দিয়েছিলাম।...ওই দেরাজেই থাকে আমার পাণ্ডুলিপি।’

এরপরে একেবারে শেষ পাতায় শেষ এন্ট্রি। এর সঙ্গে রাধাকান্ত মল্লিকের কোনো যোগ নেই, আর এটা সত্যিই রহস্যজনক।

‘কী ভুলই করেছিলাম!...যাক, তবু যে ভুলটা ভেঙেছে! কিন্তু “আর” এর জের কি তাহলে অনিদিষ্টকাল ধরে চলবে? নাকি ওটা নিয়ে অথবা চিন্তা করছি?’

ফেলুদা ডায়ারিটা বন্ধ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ‘অস্তুত কেস!

‘তার মানে রহস্যের জট এখনো ছাড়াতে পারনি?’

‘না, তবে কীভাবে প্রোসীড করতে হবে তার একটা ইঙ্গিত পেয়েছি। এবাবে

কিছু দৈহিক পরিশ্রম আছে। রুটিন এনকোয়ারি। তুই জটায়ুকে ফোন করে বলে দে কাল যেন সকালে না এসে বিকেলে আসেন। সকালে আমি থাকছি না।’

॥ ৯ ॥

ফেলুদা পরদিন সকাল আটটায় বেরিয়ে আড়াইটেয় ফিরল। ও নাকি বাইরেই লাঞ্ছ সেরে নিয়েছে। কাজ হল কিনা জিজ্ঞেস করতে ঠিক ভরসা পাছিলাম না। কারণ ওর মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা লক্ষ করছিলাম: তার মানে সাক্সেস না ফেইলিওর সেটা বুঝতে পারছিলাম না।

ফেলুদা সোফায় বসার আগে দুটো ফোন করল, একটা শক্র মুনসীকে, অন্যটা ইনস্পেক্টর সোমকে। দুজনকেই একই ইনস্ট্রাকশন, আগামীকাল সকাল দশটায় সুইনহো স্ট্রীটে বৈঠকে সবাই যেন উপস্থিত থাকে।

এবাব একটা চারমিনার ধরিয়ে ফেলুদা সোফায় বসে সামনের টেবিলের উপর পাটা ছাড়িয়ে দিয়ে বলল, ‘আমারও মুনসীর মতো বলতে ইচ্ছা করছে, কী ভুলই করেছিলাম!...রহস্য উদয়াটনের চাবি সবকটা চোখের সামনে পড়ে আছে, অথচ দেখতে পাচ্ছিলাম না।’

আমি একটা কথা না জিগ্যেস করে পারলাম না।

‘অপরাধীকে আমরা চিনি তো?’

‘নিশ্চয়ই’, বলল ফেলুদা। ‘তোর যখন এত কৌতুহল, তখন আমি তোকে কয়েকটা প্রশ্ন করছি যেগুলোর উত্তর ঠিকমতো দিতে পারলে হয়ত তুই নিজেই সমস্যার সমাধান করতে পারবি।’

আমি চূপ, বুক টিপ টিপ।

‘এক, নতুন ডায়ারিটায় লক্ষ করার মতো বিশেষ কিছু দেখলি?’

‘একটা ব্যাপারে খটকা লাগল।’

‘কী?’

‘খুনের আগের রাত পর্যন্ত ডায়ারি লিখে গেছেন ভদ্রলোক, কিন্তু “আর” আসার কোনো উল্লেখ নেই।’

‘এক্সেলেন্ট! দুই, বিসর্জন কথাটা বলতে প্রথমেই কী মনে হয়?’

‘নাটক। রবীন্দ্রনাথ।’

‘হল না।’

‘দাঁড়াও দাঁড়াও! জল...জলে কিছু ফেলে দেওয়া।’

‘ওড়। তিন, নেমেসিস কাকে বলে জানিস?’

‘নেমেসিস?’

‘হাঁ।’

‘ইংরিজি কথা?’

‘উঁহ। শীক।’

‘ওরে বাবা, সে কী করে জানব?’

‘তাহলে শিখে নে। অপরাধ করে যে শাস্তি সাময়িকভাবে এড়িয়ে গেলেও একদিন-না-একদিন ভোগ করতেই হয়, তাকে বলে নেমেসিস। এই নেমেসিস-এরই ভয় পাছিল “এ”, “জি” আর “আর”।’

আমার ব্যাপারটা খুবই ইন্টারেস্টিং লাগছিল, তাই ফেলুদা চুপ করে আছে দেখে বললাম, ‘আরো আছে?’

‘আর একটা বলব। বেশি বললে কালকের নাটকটা জমবে না।’

‘ঠিক আছে।’

‘ফিজিশিয়ান হীল দাইসেলফ, মানে জানিস?’

‘এতো ইংরিজি প্রবাদ, ডাঙ্কার, আগে নিজের ব্যরাম সারাও।’

‘আরেকটা শেষ কথা বলে দিছি তোকে, “সাজা” কথাটার অনেকগুলো মানে পাবি অভিধানে, তার মধ্যে দুটো মানে নিয়ে আমাদের কারবার।’

‘বুঝেছি।’

চা দেবার মিনিট দশকে আগে জটায় এসে হাজির। কাউচে বসেই প্রথম প্রশ্ন হল, ‘আমরা কোন স্টেজে আছি?’

উত্তরে ফেলুদা ‘মিনার্ভা’ বলে লালমোহনবাবুকে অসম্ভব ভুকুটি করতে দেখে বলল, ‘পেনালটিমেট।’

‘পেনালটি, কী বললেন?’

‘আপনার ইংরিজিটা আর রপ্ত হল না কিছুতেই। পেনালটিমেট মানে লাস্ট বাট ওয়ান।’

‘লাস্ট স্টেজে পৌঁছাচ্ছি কবে?’

‘কাল সকাল দশটায় মুনসী প্যালেসে সর্বসমক্ষে যবনিকা উত্তোলন।’

‘আর পতন?’

‘ধরুন, তার আধ ঘণ্টা বাদে।’

‘চারজনের উপর তো সন্দেহ—’

‘হাঁ, ইনি, মিনি, মাইনি, মো।’

‘উঁঁ, কথায় কথায় আপনার এই প্রগল্ভতা অসহ্য। এইটে অন্তত বলুন যে শক্র, সুখময়, রাধাকান্ত—’

ফেলুদা হাত তুলে বাধা দিয়ে বলল, ‘আর স্পিক-টি-নট। এইখানেই দাঁড়ি।’

‘আপনি দিন দাঁড়ি। আমার বলা শেষ হয়নি। নাটকের ক্লাইম্যাক্স আমার

ডাঃ মুনসীর ডায়ারি

হাতে, আপনার হাতে নয়। এটা ওয়ার্নিং দিয়ে দিলুম।’

‘আপনি যে ভয় পাইয়ে দিচ্ছেন।’

‘ভয়ের কিস্য নেই। আপনার সিংহাসন কেউ টলাতে পারবে না। আর তারিফের সিংহাসন আপনিই পাবেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সিংহাসনের পাশে একটি ছেট্ট স্পেশাল আসন, আর তারিফের পাশে একটি মিনি-তারিফ, এ দুটো আমার বরাদ্দ থাকবেই।’

পরদিন ভোরে এক পশলা বৃষ্টি হওয়াতে আমাদের পাড়াতে কিছুটা জল জমেছিল, তাও ঠিক সাড়ে নটার সময় বগলে ছাতা, কাঁধে বোলা আর মুখে হাসি নিয়ে লালমোহনবাবু এসে হাজির। ‘তপেশ ভাই’, কাউচে বসে বললেন ভদ্রলোক, ‘জগন্মাথকে বোলো যেন আজ খিঁড়ি করে। নাটকের পর মধ্যাহ্নে ভোজনটা এখানেই সারব।’

চা খেয়ে দশটার পাঁচ মিনিট আগেই আমরা সুইনহো স্ট্রীটে পৌঁছে গেলাম। আমাদের আগেই পুলিশ হাজির; ইনস্পেক্টর সোম ফেলুদাকে গুড মর্নিং করে বললেন, ‘আমি আপনার মেথডতোজানি। তাই সকলকেই বৈঠকখানায় জমায়েত হতে বলে দিয়েছি, বেয়ারা বসার ব্যবস্থা করে দিয়েছে, কেবল মিসেস মুনসীরও থাকার দরকার কিনা সেটা জানার ছিল।’

ফেলুদা মাথা নেড়ে বলল, ‘উনি না থাকাটাই বাঞ্ছনীয়।’

সবাই যে যার জায়গা নিয়ে বসতে না বসতে এক তলায় বড় ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বাজল। ফেলুদা উঠে দাঁড়িয়ে একবার চারদিকে দেখে নিয়ে ঘড়ির শেষ ঢং-এর রেশটা মিলিয়ে যেতেই কথা আরম্ভ করে দিল।

‘আমি প্রথমেই শক্রবাবুকে একটা প্রশ্ন করতে চাই।’

শক্রবাবু ঘরের উল্টোদিকে বসেছিলেন। তাঁর দৃষ্টি ফেলুদার দিকে ঘুরল। ফেলুদা বলল, ‘আমি সেদিন যখন বললাম যে ডাঃ মুনসী তাঁর ডায়ারিতে অনেকবার আপনার উল্লেখ করেছেন, তা শুনে আপনি বিস্মিত হন। এবং আমি যখন বললাম যে তিনি আপনার সম্বন্ধে নিশ্চয় সত্যি কথাই বলেছেন। তখন আপনি বেশ বিরক্ত হয়েই বললেন, ‘বাবা আমাকে চিনলেন কবে, কীভাবে তিনিতো তাঁর কুণ্ডি নিয়েই পড়ে থাকতেন।’ শক্রবাবু আপনি কেন ধরে নিলেন যে বাবা আপনার সম্বন্ধে অপ্রিয় কথাই বলেছেন? আমিতো কিছুই বলিনি।’

‘কারণ বাবা সামনা-সামনি আমার কখনো প্রশংসা করেননি।’

‘নিন্দে করেছেন কি?’

‘না, তাও করেননি।’

‘তাহলে আপনিই বা আপনার সম্বন্ধে ডাঃ মুনসীর প্রকৃত মনোভাব কী করে

জানলেন ?'

'ছেলে তার বাবার মন জানবে না কেন ? সে তো অনুমান করতে পারে !'

'বেশ, এবার আরেকটা কথায় আসি। আমি গতকাল দুপুরে একবার আপনাদের এখানে এসেছিলাম। এ বাড়িতে ভৃত্যস্থানীয় যারা আছে তাদের ডেকে ডেকে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করি। একটা প্রশ্ন আপনাকে নিয়ে ; সেটার উভয়ের দেয় আপনাদের মালি গিরিধারী। প্রশ্নটা ছিল, আপনার বাবার খুনের দিন সে আপনাকে ভোরে বেরোতে দেখেছিল কিনা। মালি বলে, হ্যাঁ দেখেছিল। তখন আমি জিগ্যেস করি আপনি খালি হাতে বেরোন কিনা। উভয়ের মালি বলে, না। আপনার হাতে একটা কালো চামড়ার ব্যাগ ছিল। বর্ণনায় বুঝি সেটা ব্রীফকেস বা পোর্টফোলিও জাতীয় ব্যাগ। এই ব্যাগে কী ছিল সেটা বলবেন কি ?'

শক্রবাবু চুপ। তাঁর নিশ্চাস জোরে জোরে পড়তে শুরু করেছে।

'আমি বলব কী ছিল ?' বলল ফেলুদা। শক্রবাবু নিরুত্তর। ফেলুদা বলল, 'ব্যাগে ছিল আপনার বাবার ডায়ারির পাণ্ডুলিপি। ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে, বা করার আগে, আপনি সেটা লেকের জলে বিসর্জন দেন তবে তার কারণ', ফেলুদার গলা চড়ে ওঠে, 'আপনি ডায়ারিটা পড়ে দেখেছেন যে আপনার বাবা আপনার সম্মতে একটিও প্রশংসনোচক কথা বলেননি। তিনি—'

ফেলুদার গলা ছাপিয়ে শক্রবাবু বলে উঠলেন, 'ইয়েস, ইয়েস ! এই বই ছাপা হলে আমার রোজগারের রাস্তা চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে যেত। অলস, উদ্যমহীন, ইরেসপন্সিবল, অস্থিরমতি, কী না বলেননি উনি আমাকে !'

'বাইট', বলল ফেলুদা। 'তাহলে এটাও স্বীকার করুন যে সেদিন গলার স্বর পালটিয়ে "আর"-এর ভূমিকা নিয়ে আপনিই আমাকে ফোনটা করে আপনার বাবা সম্মতে বুড়ি বুড়ি মিথ্যে কথা বলেছিলেন, সন্দেহ যাতে আপনার উপর না পড়ে ?'

শক্রবাবু দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন, এবার ধপ করে বসে পড়লেন।

"আর"-এর কথাই যখন উঠল', বলল ফেলুদা, 'তখন ব্যাপারটা আরেকটু তলিয়ে দেখা যাক।'

ফেলুদার দৃষ্টি এবার বাঁয়ে বসা সুখময়বাবুর দিকে ঘূরল।

'আমি এবার আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই।'

'করুন।'

'ইংরিজিতে যাকে হাথও বলা হয়, সেই হাথের উপর নির্ভর করে আমি গতকাল সকালে একবার সাঁহাত্রিশ নম্বর বেলতলা রোডে যাই। সকালের অবগতির জন্য বলছি। এটা হল সুখময়বাবুর বাড়ির নম্বর। আমার মনে হচ্ছিল উনি কিছু তথ্য গোপন করে যাচ্ছেন, এবং হয়ত ওর বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা

বললে কিছুটা আলোর সকান পাওয়া যেতে পারে।'

ফেলুদার দৃষ্টি ঘূরে গিয়েছিল, এখন আবার ফিরে এল সুখময়বাবুর দিকে।

'আপনার মা-র সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি আপনার বাবার মৃত্যু হয় চবিষ্যৎ বছর আগে, গাড়ি চাপা পড়ে।...এই তথ্যটি কি ডাঃ মুনসী জানতেন ?'

দৃষ্টি মেরে থেকে না তুলেই উন্নত দিলেন সুখময়বাবু।

'জানতেন। ইন্টারভিউ-এর সময়, আমার বাবা সাঁহাত্রিশ বছর বয়সে মারা যান জেনে ডাঃ মুনসী জিগ্যেস করেন কিসে তাঁর মৃত্যু হয়।'

'খুব সতর্ক লোকেরও কেমন ভুল হয় তার একটা উদাহরণ দিই। শক্র মুনসী যখন আমার বাড়িতে আসেন তখন তিনি নিজের পরিচয় দিতে বলেন যে তিনি ডাঃ রাজেন মুনসীর ছেলে। এই রাজেন নামটা আমার মাথা থেকে বেমালুম লোপ পেয়ে যায়; যেটা থেকে যায় সেটা হল "ডঃ মুনসী"। কাল ওর লাল ডায়ারি খুলে প্রথম পাতাতেই "আর মুনসী" দেখে আমি চমকে উঠি। তাহলে কি ডাঃ মুনসী নিজেই তাঁর ডায়ারির "আর", এবং তিনিই গাড়ি চাপা দিয়ে লোক মেরে চতুর্দিকে ঘৃষ দিয়ে আইনের কবল থেকে নিজেকে বাঁচান, আর সেই মৃত্যু ব্যক্তিরই ছেলে তাঁরই কাছে আসে চবিষ্যৎ বছর পরে চাকরির ইন্টারভিউ দিতে ?'

'ভুল, ভুল, ভুল !' চেঁচিয়ে উঠলেন সুখময়বাবু। 'আমার বাবাকে যিনি চাপা দেন তাঁর উপযুক্ত শাস্তি হ্যাঁ।'

'সে কথা কি ডাঃ মুনসী জানতেন ?'

'না। তাঁর ধারণা ছিল তিনিই আমার বাবার মৃত্যুর জন্য দায়ী। আসল ঘটনা তিনি জানতে পারেন মৃত্যুর আগের দিন।'

'কীভাবে ?'

'উনি আমাকে ডেকে বলেন যে ওর একটা স্বীকারোভিটি করার আছে যেটা না করলে উনি শাস্তি পাবেন না। স্বীকারোভিটা কী জানতে পেরে আমি বলি, ডাঃ মুনসী, আপনি ভুল করছেন; আমার বাবাকে যিনি চাপা দেন তাঁর শাস্তি হয়েছিল। কথাটা শুনে উনি স্তুতি হয়ে যান। আর আমিও বুঝতে পারি কেন তিনি আমার উপর এত সদয় ছিলেন।'

ঘরের উল্টোদিক থেকে একটা ছোট্ট, শুকনো হাসি শোনা গেল। শক্রবাবু।

'কিছু বলবেন ?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'না বললে আপনি আরো বেশি ভুল পথে গিয়ে পড়বেন।'

'মানে ?'

'আমার বাবা জীবনে কখনো গাড়ি চালাননি।'

'সে তথ্য আমার অজানা নয়, শক্রবাবু। মালির সঙ্গে কথা বলার পর আপনার ড্রাইভারের সঙ্গে আমার কথা হল।'

‘সে কী বলে ?’

‘ত্রিশ বছর সে আপনাদের ড্রাইভারি কৰছে, তার মধ্যে সে মাত্র একটা অ্যাক্সিডেন্ট কৰেছে। তাতে আপনার বাবার তাড়া ছিল বলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও জনবহুল রাস্তায় তাকে জোরে গাড়ি চালাতে হচ্ছিল। তাই থখন দুর্ঘটনাটা ঘটে তখন ডাঃ মুনসী খানিকটা নিজেকেই দয়া কৰেন। ড্রাইভারের যাতে দণ্ড না হয় তার জন্য তিনি যা কৰবার সবই কৰেছিলেন। তা সত্ত্বেও ড্রাইভারের অনুত্তাপ আৱ আতঙ্ক কিছুতেই যাচ্ছিল না। তখন ডাঃ মুনসী তার চিকিৎসা কৰে তাকে ভালো কৰে তোলেন। অৰ্থাৎ আপনার বাবা ডায়ারিতে একটুও মিথ্যে লেখেননি। এবং ‘আৱ’ হচ্ছে নট রাজেন মুনসী, বাট ড্রাইভার রঘুনন্দন তেওয়ারি।’

‘বাট হ কিল্ড মাই ফাদার ?’ অসহিষ্ণুভাবে ঢেঁচিয়ে উঠলেন শক্র মুনসী।

‘এসব ব্যাপারে একটু ধৈর্য ধৰতে হয়, মিঃ মুনসী,’ গভীৰ স্বরে বলল ফেলুদা। তারপৰ মুনসীৰ দিক থেকে তার দৃষ্টি ঘূৰে একটি অন্য ব্যক্তিৰ উপর গিয়ে পড়ল। ‘এ ঘৰে একজন ব্যক্তি আছেন যাঁকে আমৰা অসুস্থ বলে জানি,’ বলল ফেলুদা। ‘এৰ আগে তিনি দুবাৰ আমাদেৱ সামনে উপস্থিত হয়েছেন, এবং দুবাৰই নানান অঙ্গভঙ্গিৰ সাহায্যে নিজেকে অসুস্থ বলে প্ৰতিপন্ন কৰাৰ চেষ্টা কৰেছেন। আজ তাঁকে দেখছি তিনি সম্পূৰ্ণ সুস্থ মানুষেৰ চেহারা নিয়ে আমাৰ ভাষণ শুনছেন। মিঃ মল্লিক—আপনি কি আপনা থেকেই সেৱে গেলেন ?’

ৰাধাকান্ত মল্লিক হঠাৎ যেন শক্র খাওয়া মানুষেৰ মতো চমকে উঠলেন।—‘কী—কী বলছেন বলুন !’

‘বলছি যে আমাৰ জেৱায় সকলেই অঞ্জলিস্তৰ মিথ্যা বলেছেন বা সত্য গোপন কৰে গেছেন, কিন্তু আপনি সবাইকে টেকা দিয়েছেন।’

মল্লিক এখনো এক দৃষ্টি ফেলুদার দিকে ঢেয়ে, তার মনেৰ ভাব বোঝাৰ কোনো উপায় নেই। ফেলুদা বলল, ‘আপনি বলেছিলেন পপুলার ইনশিওৱেন্সে কাজ কৰেন। আমি সেটা ভেৱিফাই কৰতে সেখানে গিয়েছিলাম। গিয়ে শুনলাম আপনি আৱ সেখানে নেই, চার মাস হল ছেড়ে দিয়েছেন। আপনি কি তাহলে বেকাৰ। না অন্য কোথাও কাজ কৰছেন ? ইনশিওৱেন্সি অফিসে এ প্ৰশ্ৰেণীজৰ বাবাৰ কেউ দিতে পাৱল না বলে আপিস থেকেই আপনার বাড়িৰ ঠিকানা জোগাড় কৰে আমি সেখানে গিয়েছিলাম। সতীশ মুখোজ্জি রোড, তাই না ?’

মল্লিক এখনো চুপ, তার দৃষ্টি সামনেৰ দিকে।

‘সত্য, এ মামলায় বিশ্বায়েৰ শেষ নেই?’ বলে চলল ফেলুদা। ‘আপনি ডাঃ মুনসীকে বলেছিলেন আপনার বাবা, আপনার দাদা, সকলেই আপনার মনে আতঙ্কেৰ সংঘাৱ কৰেছে। অথচ আপনার বাড়ি গিয়ে দেখি আপনার বাবা দাদা, কেউই নেই। বাবা মাৰা গেছেন প্ৰায় পঁচিশ বছৰ হল, আৱ দাদা বলে কেউ

কোনোদিন ছিলই না। আপনাৰ বিধবা মাৰ কাছ থেকে জানি যে আপনি একটা যাতা কোম্পানিতে যোগ দিয়েছেন এবং বৰ্তমানে তুৱে আছেন।’

এবাবে রাধাকান্ত মল্লিক মুখ খুললেন।

‘আমি যে সত্যবাদী যুধিষ্ঠিৰ এটা আমি কোনোদিনই ক্ৰেম কৰিনি। কিন্তু আপনি কী বলতে চান ? আমি খুন কৰেছি ?’

‘আমি ধাপে ধাপে এগোই, মল্লিক মশাই, লাফে লাফে নয়। আপনি খুনী কিনা সে ব্যাপারে পৱে আসছি ; প্ৰথমে দেখছি আপনি প্ৰবণক। মনোবিকারেৰ অভিনয় কৰে আপনি মুনসীৰ কাছে এসেছিলেন চিকিৎসাৰ জন্য। আপনি—’

‘কেন এসেছিলাম সেটা জানেন আপনি ?’ ফেলুদাকে বাধা দিয়ে জোৱালো গলায় বললেন মল্লিক।

‘এটা আপনাৰ মা-ব কাছ থেকে জানি যে আপনাৰ বাবা গাড়ি চাপা পড়ে মাৰা যান, যিনি চাপা দেন তাঁৰ কোনো শাস্তি হয়নি, এবং গাড়িৰ মালিক এসে আপনাৰ মা-ব হাতে পাঁচ হাজাৰ টাকা তুলে দেন ক্ষতিপূৰণ হিসেবে।’

‘ইয়েস !’ ঢেঁচিয়ে উঠলেন রাধাকান্ত মল্লিক। ‘তখনই দেখি আমি ভদ্ৰলোককে, আৱ তাৰপৰে ছবি দেখি কাগজে এই সেদিন। সেই একই চেহারা, আৱ দেখেই স্থিৰ কৰি যে একে বাঁচতে দেওয়া চলে না। কল্পনা কৰতে পাৱেন ? একটি বাবো বছৰেৰ ছেলে, বাবাৰ পিছনে পিছনে ট্ৰাম থেকে নামছে। চোখেৰ সামনে বাবা মোটৱেৰ তলায় তলিয়ে গেল ! ওঁ, কী ভয়ংকৰ দৃশ্য ! আজও মনে পড়লে শৰীৰ শিউৱে ওঠে। মাসেৰ পৰ মাস ধৰে মা-কে জিগ্যেস কৰেছি, যে লোকটা বাবাকে চাপা দিল তাৰ শাস্তি হবে না ? ‘বড় লোকদেৱ শাস্তি হয় না ! বাবু, বড় লোকেৱা পাৱ পেয়ে যায়।’...আৱ তাৰপৰ হঠাৎ খবৰেৰ কাগজে ছবি ! এক মুহূৰ্তে মনস্থিৰ কৰে ফেলি। এৱে শাস্তি হবে। আৱ সে শাস্তি দেব আমি !’

‘তাৰপৱেই মনোবিকারেৰ অভিনয় কৰাৰ সিদ্ধান্ত ?’

‘হাঁ, কিন্তু খুন কৰা যে এত কঠিন কে জানত ? বুৰতে পাৱছিলাম এ জিনিস চট কৰে হৰাব নয় ; সময় লাগবে আমাৰ মনকে শক্ত কৰতে। শেষকালে মন শক্ত হল, অন্তৰ জোগাড় হল...মুনসীৰই আপিস ঘৰেৰ একটা পেপাৰ নাইফ। বাবাৰ দেহ থেকে যে রক্ত বেৱোতে দেখেছি। তাঁৰ হত্যাকাৰীৰ দেহ থেকেও রক্তপাত না হলে উপযুক্ত শাস্তি হবে না। তাৰপৰ—’

‘তাৰপৰ কী, মল্লিকমশাই ?’

‘অন্তৰ ব্যাপার, অন্তৰ ব্যাপার ! ছোৱা হাতে নিয়ে ঘৰে চুকেছি। পশ্চিমেৰ জানালা দিয়ে চাঁদেৱ আলো এসে মুনসীৰ উপৰ পড়েছে। মুখ হাঁ, আধ খোলা চোখে নিষ্পাণ চাউনি। নিষ্পাণ-প্ৰশ্বাসেৰ শব্দ নেই ! আমি খুন কৰব কি ? সে

লোক তো অলৱেড়ি, ডেড, ডেড, ডেড !

তৃতীয় ‘ডেড’ কথাটা বলার সঙ্গে ঘরে একটা ধূপ করে শব্দ হল ।

সেটাৰ কাৰণ হচ্ছে ডাঃ মুনসীৰ শালা চন্দ্ৰনাথবাবু । তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে চেয়াৰ থেকে উঠে মেৰেতে পড়েছেন ।

সোম তাঁৰ দিকে দৌড়ে গেলেন । আৱ সেই সঙ্গে ফেলুদা বলে উঠল, ‘দেখে নিন, মিঃ মুনসী । আপনাৰ মামা, আপনাৰ মা-ৰ যমজ ভাই । হি কিল্ড ইওৰ ফাদাৰ !’

‘মানে ?’ হঠাৎ থাকতে না পেৱে চেঁচিয়ে উঠলেন জটায়ু ‘মোটিভ ?’

ফেলুদাৰ দৃষ্টি আবাৰ শক্রবাবুৰ দিকে গেল । ‘আপনি বলতে পাৱেন না, শক্রবাবু ? আপনি তো ডায়ারিটা পড়েছেন ?’

শক্রবাবু ধীৱে ধীৱে মাথা নেড়ে হাঁ বললেন ।

‘মানুষকে চেনা অত সহজ নয়, শক্রবাবু’, বলল ফেলুদা । ‘জানোয়াৱেৰ সঙ্গে মানুষেৰ আসল তফাত, জানোয়াৱ ভাব কৰতে জানে না, অভিনয় জানে না, মনেৰ ভাব লুকোতে জানে না । ...ডাঃ মুনসী আপনাৰ মা সন্ধে মোটেই উদাসীন ছিলেন না । থাকলে ডায়ারিটা তাঁকে কখনই পড়তে দিতেন না । কখনই সে ডায়ারি তাঁকে উৎসর্গ কৰতেন না । ব্যাপারটা আসলে উটো । উদাসীন্য যদি কাৰুৰ তৰফ থেকে হয়ে থাকে তিনি হলেন আপনাৰ বিমাতা, যিনি তাঁৰ সমস্ত মেহ, ভালোবাসা, চিন্তা, ভাবনা, চেলে দিয়েছিলেন তাঁৰ অকৰ্ম্য ভাইয়েৰ উপৰ !’

...এবাৰ খুনেৰ মোটিভটা কী ? সেটা কি একবাৰ সমবেত সকলকে বলবেন ?’
প্রায় যান্ত্ৰিক মানুষেৰ মতো কথা বেৱোল শক্রবাবুৰ মুখ থেকে ।

‘বাবাৰ উইলে চাৰ ভাগ পাৱে মনন্তাৰ্ত্তিক সংহা, চাৰ ভাগ আমি, আৱ আট ভাগ আমাৰ মা ।’

ইতিমধ্যে মিঃ সোমেৰ পৰিচ্যায় চন্দ্ৰনাথবাবুৰ জ্ঞান ফিৰেছে । ফেলুদা তাকে উদ্দেশ্য কৰে প্ৰশ্ন কৰল, ‘খুন কৰাৰ সিদ্ধান্ত কি আপনাৰ ?’

চন্দ্ৰনাথবাবু মাথা নাড়ালেন, তাঁৰ দৃষ্টি মেৰেৰ কাৰ্পেটেৰ দিকে । একটা দীৰ্ঘস্থাসেৰ পৰ কথা বেৱোল, এত ক্ষীণ, যে বেশ কষ্ট কৰে বুৰাতে হয় ।

‘না । সিদ্ধান্ত... ডলিৰ । ডলিই আমাৰ হাতে... হামানদিষ্টা তুলে দেয় !’

‘হঁ, বুৰেছি !’ ফেলুদা যেন বেশ ক্লান্তভাবেই চেয়াৱে বসে পড়ল । ‘শুধু একটা আপসোস, গভীৰ আপসোস... ডায়ারিটা বেৱোলে নিঃসন্দেহে সাহিত্যিক হিসাবে ডাঃ মুনসীৰ সুনাম হত । সেই ডায়ারি এখন সলিলগভৰ্তে !’

‘অ্যাটেনশন ! স্পটলাইট !’

ঘৰ কাঁপিয়ে সবাইকে চমকে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন জটায়ু । সবাই তাঁৰ দিকে



দেখছে দেখে একটা অস্তুত হাসি হেসে কাঁধেৰ ঝোলা থেকে একটানে একটা ফাইল বার কৰে সেটাকে মাথাৰ উপৰ তুলে ঝাণুৰ মতো নাড়াতে নাড়াতে বললেন, ‘জলে যায়নি ! জলে যায়নি ! হিয়াৰ ইট ইজ !’

‘ডাঃ মুনসীৰ পাণ্ডুলিপি ?’ অবাক হয়ে প্ৰশ্ন কৰল ফেলুদা । ‘সেটা কী কৰে হয় ?’

‘ইয়েস স্যাৰ ! থ্যাক্স টু বিজ্ঞানেৰ অগ্ৰগতি । একদিনে পড়া হবে না বলে এটা জিৱকু কৰিয়ে রেখেছিলাম, জিৱকু ! এক্ষ ই আৱ ও এক্ষ !...নিন সুখময়বাবু, টাইপিং শুৰু কৰে দিন, শেষ হলে পৰ সোজা নৰ্থ পোল !’

এখনে অবিশ্যি একটা জটায়ু মাৰ্কা ভুল হল, পেঙ্গুইন নৰ্থ পোলে থাকে না, থাকে সাউথ পোলে ।